বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

পঞ্চদশ অধিবেশনের

কার্য্যবিবরণ।

রাধানগর

(হুগলী)

১৪ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা অভ্যর্থনা-সমিতির

কার্য্যালয় হইতে

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল দ্বারা

প্রকাশিত।

১৩৩১

শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়,
শ্রীপতি প্রেস
৩৮, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা।
এবং পরিশিষ্টের ১—৪৮ পৃঃ স্বধীর প্রেসে মুদ্রিত

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

সূচী

(প্রথমাংশ

চিত্র-সূচী

প্রথমাংশ

ঘণ্টেশ্বর মন্দির— খানাকুল

রামমোহন স্মৃতি-মন্দির, রাধানগর

রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

পঞ্চদশ অধিবেশন

প্রত্যেক বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে—এই পঞ্চদশ বর্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার বহু নগর এবং উপনগর বাঙ্গালার বাণী-সেবকগণের সমাবেশে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সহর হইতে অথবা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে দূরে অবস্থিত বাঙ্গালার কোন ক্ষুদ্রপল্লী এ পর্য্যন্ত এই গৌরব পাইবার সুযোগ পায় নাই। "খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের" সভ্যবৃন্দ বঙ্গসাহিত্যের প্রথম গুরু মহাত্মা রাজা রামমোহন-রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে এইরূপ বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্মিলনের আশা বহুদিন হইতে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই আশা ফলবতী হইবার কোন সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। সহর হইতে অথবা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে যাতায়াতের অসুবিধা, থাকিবার অসুবিধা, আহারের অসুবিধা প্রভৃতি সহস্র প্রকারের অসুবিধার জন্য সাহিত্যিক ও সাহিত্যসেবিগণের যথোচিত অভ্যর্থনা করিবার অশেষ প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পারে বলিয়া, রাধানগর অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার ভার লইতে সাহস করেন নাই; কিন্তু তথাপি তাঁহারা আশা পোষণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহের ভাব লইয়া তাঁহাদেরই প্রতিনিধিস্বরূপ রাধানগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নৈহাটীতে সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন উপলক্ষে রাধানগরে সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আহ্বান সাদরে গৃহীত হইয়াছিল।

ক্ষুদ্র পল্লী রাধানগর খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের অন্তর্ভুক্ত। বন্যার ভীষণ প্লাবনে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সমাজ এখন শ্রীহীন হইলেও তাহার অতীতের স্মৃতির সহিত অনেক বিদ্বান্ ও মহাপুরুষের নাম জড়িত আছে। যুগপ্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান বলিয়াই নয়—এক সময়ে উক্ত সমাজ অভিরামের ন্যায় ভক্ত, নারায়ণ ঠাকুরের ন্যায় স্মার্ত্ত, কণাদের ন্যায় নৈয়ায়িক, আগমবাগীশের ন্যায় সাধক, রমাপ্রসাদ ও প্রসন্নকুমারের ন্যায় কর্ম্মী প্রভৃতি প্রথিত-যশা মহাপুরুষগণের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। কৃষ্ণনগর তখন সংস্কৃত চর্চ্চায় দ্বিতীয় "নবদ্বীপ" বলিয়া আখ্যাত হইত; ভাটপাড়া এবং নবদ্বীপের ন্যায় কৃষ্ণনগরের স্মৃতিশাস্ত্রের বিভিন্ন মত বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা গৃহীত

হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের গৃহে গৃহে তখন টোল ছিল, সুদূরদেশ হইতে শত শত ছাত্র কৃষ্ণনগরে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ধন্য হইয়া যাইত।

গত ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১৩ই মাঘ (ইং ২৭এ জানুয়ারী, ১৯২৩) তারিখে খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের উদ্যোগে কলিকাতা ১৪ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করিবার জন্য হুগলী জেলার অধিবাসিবৃন্দের একটি সভা হইয়াছিল। আধুনিক যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য নানারূপ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারই জন্মপল্লী রাধানগর গ্রামে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবিগণের সম্মিলনের অধিবেশন হইবে বলিয়া সভায় স্থির হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায়ের সুযোগ্য প্রপৌত্র জমিদার শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় মহাশয় দূর হইতে অভ্যাগত প্রতিনিধিবর্গের বসবাসের ও আহারাদির ব্যবস্থা এবং তাঁহাদিগকে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইবার জন্য যথাসম্ভব যানবাহনাদির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদভাজন। তাঁহার উৎসাহ এবং অর্থ-সাহায্য না পাইলে রাধানগরে সাহিত্য-সম্মিলনের সুব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইত না। তাঁহার পিতৃব্য পত্নী ৺হরিমোহন রায় মহোদয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা গোলাপসুন্দরী দেবী মহোদয়াও আহারের প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন। ইঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

তাঁহাদের সুযোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও নায়েব শ্রীযুক্ত সরসীমোহন রায় ও শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিবৃন্দ যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সম্মিলনের সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

খানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলের অধিবাসিগণ ব্যতীত বাঙ্গালার অন্যান্য জেলার অনেক মনীষী জমিদার, ব্যবসায়ী এবং ব্যবহারজীবিগণ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ অর্থে সামর্থ্যে ও উৎসাহদানে অভ্যর্থনা-সমিতিকে সাহায্য করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

রাধানগর সাহিত্য-সম্মিলনে যাইবার জন্য রাণীচক, গড়ের ঘাটের পথ ও চাঁপা-ডাঙ্গার পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কোলাঘাট হইতে গড়ের ঘাট পর্য্যন্ত ষ্টীমার রিজার্ভ করা হইয়াছিল; গড়ের ঘাটে কয়েকখানা পাল্কি ছিল। চাঁপাডাঙ্গায়

গরুর গাড়ী ও পাল্কির বন্দোবস্ত ছিল। চাঁপাডাঙ্গা ষ্টেশনে জলযোগের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল। নন্দনপুর এবং রাজহাটীর অধিবাসিগণ নন্দনপুরের রথতলায় ও রাজহাটীতে জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মিত্র মহাশয় তাঁহার সেনহাটস্থ ভবনে প্রতিনিধিবর্গের সেই রাত্রের আহারের ও বিশ্রামের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গড়ের ঘাট হইতে রাধানগর যাইবার পথে নন্দনপুরনিবাসী ও অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল মহাশয় রাধানগর যাইবার ও ফিরিবার পথে কতিপয় প্রতিনিধির আহারের প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদভাজন।

কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত অরুণপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার মহাশয়দ্বয়, এই দারুণ গ্রীষ্মে পথ ঘাটের নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া প্রতিনিধিগণের যদি কোন পীড়া হয় তজ্জন্য তাঁহাদের শুশ্রূষা করিবার জন্য রাধানগর গিয়াছিলেন। তজ্জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই দারুণ গ্রীষ্মে হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাধানগরে টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা করিয়া পানীয় জল সরবরাহের যে সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। বটকৃষ্ণ পাল কোং স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল মহাশয়কে ও সায়েন্টিফিক্ সাপ্লাই কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী ও সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জানাইবামাত্র তাঁহারা ঔষধ ও সীরাপ প্রদান করিয়া আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট অভ্যর্থনা-সমিতি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

রাধানগর পল্লী-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিবিধ কার্য্যে ও বিশেষভাবে মণ্ডপ নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের এই কার্য্যবিবরণ মুদ্রণের যাবতীয় কার্য্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

রাধানগরে সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন স্থানের শিল্পজাত দ্রব্যের একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র হাজরা

ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেন মহাশয়দ্বয় এই কার্য্যের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যের দেয় চাঁদা অন্যূন ৩৲ এবং সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির নিয়মানুসারে প্রত্যেক প্রতিনিধির দেয় চাঁদা ২৲ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ অন্যূন ৫৲ টাকা চাঁদা দিলে প্রতিনিধি হইতে পারিবেন, ইহাও স্থির হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে রাধানগর যাইবার যান বাহনাদির কোন সুবিধা নাই। প্রতিনিধি, সাহিত্যিক এবং সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে অনেকেই রামমোহন রায়ের জন্মভূমি বাঙ্গালার এক পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে পদব্রজে রাধানগরে পদার্পণ করিয়া রাধানগরকে ধন্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। আমরা আশা করি, তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিবার সহস্র প্রকারের ত্রুটি তাঁহারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত
সম্পাদক।
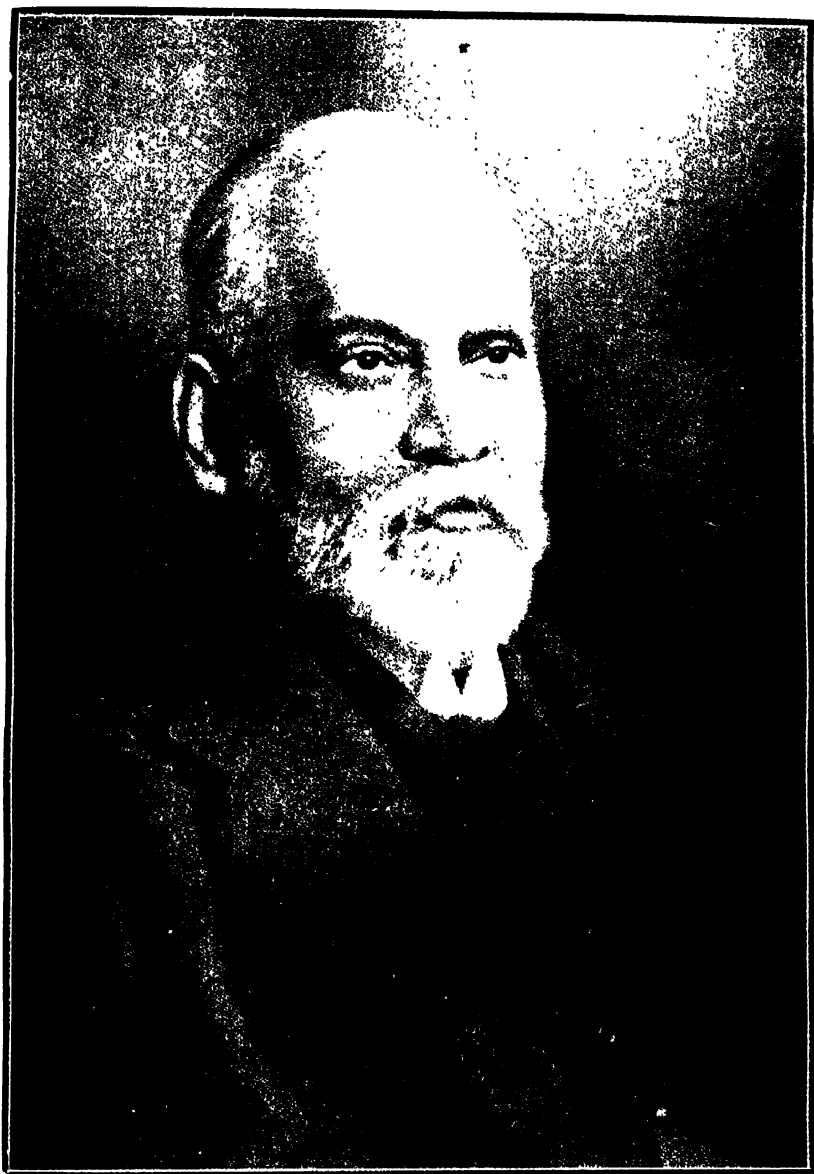
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল মহাশয়ের অভিভাষণ

সমবেত সুধীবৃন্দ !

অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।

আজ আমাদের গ্রামসমূহের বিশেষ সৌভাগ্য যে বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণ আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা না রেলের ধারে, না সর্ব্বকালীন বহমানা নদীর ধারে, আমরা দেশের এমনই এক কোণে পড়িয়াছি যে, আমরাই মাতৃভূমির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদের পথে বসিয়াছি, তাহাতে আপনাদিগকে এখানে আবাহন করিতে আমরা, বিশেষতঃ আমি নিজে, বড়ই সঙ্কুচিত ছিলাম। আমরা জানিতাম, আপনাদিগের পক্ষে এখানে আসা নিতান্ত কষ্টকর হইবে। পথ, ঘাট আমাদের কিছুই নাই; আরও জানিতাম, আমাদের পক্ষে সময় ও কাযোপযোগী আয়োজন অসম্ভব। বলিতে পারেন, এ অবস্থায় এ বৎসরে আমরা সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের দায়িত্ব কোন্ সাহসে গ্রহণ করিলাম। তাহার উত্তরে আমি এইমাত্র বলি যে, আমাদের গ্রামবাসীদিগের আগ্রহ ও কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সেবীদের উৎসাহ, আমাদের সুবুদ্ধির বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। আমাদের দামোদরের বন্যার প্লাবনে বাস করা অভ্যাস আছে; সুতরাং আমরা হাবুডুবু খাইতে বড় ভয় করি না. তবে আপনারাও যে আমাদের সহিত হাবু ডুবু খাইতেছেন, এই আমার দুঃখ। আমার আত্মপক্ষে আর একটী তীব্র দুঃখের কারণ আছে—শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আমি স্বয়ং আপনাদের অভ্যথনা করিতে উপস্থিত হইতে পারিলাম না। আমি জানি আপনারা সে ত্রুটি উপেক্ষা করিবেন—কিন্তু আপনাদের ক্ষমায় আমার মনঃক্ষোভ দূর হইবে না। আমি জানি আমার সহযোগিগণ আপনাদের সেবায় যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকিবেন। আমাকে লইয়া, তাঁহারা হয়ত একটু ব্যস্ত হইতে পারিতেন; তাঁহাদের যে সেটুকু ব্যাঘাতের কারণ রহিল না, সেই আশায়

কথঞ্চিৎ প্রবোধের কারণ হইতে পারে। আমাদের দেশে সম্মিলনের অধিবেশনের পক্ষে অনেক বিঘ্ন-বিসংবাদ থাকা স্বত্বেও যে, আমরা আপনাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়াছি, সে শুদ্ধ আমাদের প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক নহে; খানাকুল-কৃষ্ণনগরে বঙ্গদেশীয় সাহিত্য-সম্মিলনের একটী অধিবেশন না হওয়া আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। আর আমাদের দূরত্ব ও দুর্গমত্ব যদি সম্মিলনের অধিবেশন একেবারে বাধিত করিত, তাহা হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণকে তাহার জন্য কিছুমাত্র দায়িত্ব গ্রহণ করিতে না হইত এমন নহে। আমাদের গ্রামসমষ্টি আপনাদের কাছে একেবারে তাচ্ছিল্যের বস্তু না হইলেও, আমাদের প্রাচীন গৌরব-কাহিনী আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে আমি সবিশেষ ইচ্ছুক নই। আমাদের দেশের সকল দরখাস্তেই লেখা দেখিতে পাওয়া যায় যে, আবেদনকারী বিশিষ্ট সদ্বংশসম্ভূত! আমরা দেখিতেছি, এটার আর এখন বড় মূল্য নাই। আভিজাত্যের দিন গিয়াছে—দোষগুণ বিচারের দিন গিয়াছে। এখন মায়ের কাছে কেবল মাথা গুন্তি করিয়া হাজির করিতে পারিলেই হইবে। এখন আর নচিকেতার মত "পীতোদকা জগ্ধতৃণাঃ", গাভীদানের উপর নাক সেঁট্‌কাইয়া শাপগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা নাই। অনেক দিন পরে বাঙ্গালা দেশে, প্রয়াগের অপর পারস্থিত প্রাচীন ঝাঁসী নগর সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে "আন্ধের নগরী অবুঝ রাজা, টকে সের ভাজী টকে সের খাজা" সেই রাজ্যের পুনরাবির্ভাবের সূচনা দেখিতেছি। আমাদেরও হয়ত সেই নগরীর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে; কিন্তু আমি পুরাণ মানুষ, বহুদিন সঞ্চিত কর্দ্দমে আমার দেহকে পঙ্কিল করিয়া রাখিয়াছে, এ নবস্রোত এখনও তাহাকে ধুইয়া সাফ করিতে পারে নাই। খানাকুলে বসিয়া আভিজাত্যের অভিমান হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম চর্চ্চায়, আমাদের দেশ বঙ্গভূমির সমাদরের স্থান ছিল। এখানে অভিরাম গোস্বামীর আশ্রম ছিল। কেহ কেহ বলেন, তিনি স্বয়ং সুদাম ছিলেন—শ্রীবৃন্দাবন হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। মহাতান্ত্রিক রত্নগর্ভ আগমবাগীশ মহাশয় রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তিসমূহ, এক্ষণে ঔপন্যাসিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। কণাদ তর্কবাগীশ, নারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রভৃতির নাম ও যশ স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক সমাজে এখনও বিখ্যাত। এ কথাটা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—ইঁহাদের জন্মভূমি আমাদের সকলেরই সম্মানের বিষয়। কিন্তু বঙ্গের সাহিত্যিকদিগের উপর বঙ্গের রাজনৈতিকদিগের উপর, বঙ্গবাসীদিগের উপর, আমাদের আর একটা মস্ত দাবী আছে—আমাদের দেশ রামমোহন-

রায়ের জন্মভূমি। একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না—আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের তিনি প্রথম অধিষ্ঠাতা। বঙ্গসাহিত্যকে পুরাতন গণ্ডীর ভিতর হইতে তিনিই উদ্ধার-কর্ত্তা। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত সংঘর্ষণে ও সংস্পর্শে আমাদের সাহিত্যের কতদূর পরিপুষ্টি হইয়াছে, তাহা আপনাদিগের নিকট বলিতে হইবে না। আপনারাই তাহার জীবন্ত জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত। সেই মহাত্মার জন্মভূমি-দর্শন—বাঙ্গালী ও ভারতবাসিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনারা অনেক বাধা সত্ত্বেও যে, সে কর্ত্তব্য পালন করিবেন, এটা আমরা আশা করিয়াছিলাম—সেই আশার বলে আপনাদিগকে আমরা এখানে আবাহন করিতে সাহস পাইয়াছি। আমাদের অনেক অভাব—পথের অভাব, জলের অভাব, স্থানের অভাব, লোকের অভাব, আয়োজনের অভাব। আমরা বঙ্গপল্লীর অভাবময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, আপনাদের সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছি।

আমার এই শেষ নিবেদন যে, আমাদের অনন্ত ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া সম্মিলনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। যিনি সর্ব্বকারুণিক সর্ব্বমঙ্গলময় তিনি আমাদের আরম্ভ সুসম্পন্ন করিবেন। "শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা।" "শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।" প্রাণবৃত্তি ও দিবসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মিত্র আমাদের কল্যাণকারী হউন। অপান বৃত্তি ও রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ আমাদের কল্যাণকারী হউন, চক্ষু বা আদিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্য্যমা আমাদের কল্যাণকারী হউন। বলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র, এবং বাক্য ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃহস্পতি আমাদের কল্যাণকারী হউন। উরুক্রম বিষ্ণু আমাদের কল্যাণকারী হউন। নমো ব্রহ্মণে।

অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি

মান্যবর শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই,

এম এ, এল এল ডি, মহাশয়ের অভিভাষণ

স্বাগতম্

স্বাগত—আসুন। বসুন বলিবার ক্ষমতা নাই। বসিতে দিবার স্থান নাই। গাছতলায় বসাইব, তাহারও উপায় নাই। অভিরাম-শাপগ্রস্ত দ্বারকেশ্বর—কাণাপুতের বড় নামই হয়—বৎসরের অধিকাংশ সময় "কাণা" হইলেও সময় পাইলেই প্রবল প্রকোপ প্রকাশ করে। কাণা-খোঁড়ার চিরদিন একগুণ বাড়া। ঘর-বাড়ী, মানুষ-গরু, ফল-ফসল, পথ-ঘাট, গাছপালা সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাই বলিতেছি যে, গাছতলায় "তৃণাণি" বিছাইয়া বসুন বলিব তাহারও সংস্থান নাই। এ দেশে আসিবার সুপথ নাই। রেলওয়ে কোম্পানীর বাঁধ রক্ষা করিতে হইবেই হইবে বলিয়া বহু বৎসরব্যাপী শত চেষ্টাতেও বন্যার প্রকোপ হইতে দেশকে রক্ষার উপায় হয় নাই। রমাপ্রসাদ রায়ের আমল হইতে এ চেষ্টা চলিতেছে—মহারাজ বর্দ্ধমান চেষ্টা করিয়াছেন, স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় চেষ্টা করিয়াছেন, ললিতমোহন সিংহ রায় চেষ্টা করিয়াছেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু বহু চেষ্টা করিয়াছেন, নগণ্য আমি—আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিছুতেই কিছু হয় নাই। জানি না, শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের চেষ্টায় ভবিষ্যতে কি ফল ফলিবে। কোম্পানীর কয়লা এ পথে আর আসিবার প্রয়োজন হইবে না বলিয়া প্রস্তাবিত রেলওয়ের কাগজপত্র এখন ছেঁড়া কাগজের টুকরীর অন্তর্গত। বন্যার পর বন্যায় রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়া, ক্ষেত-বাগান চিরদিনের জন্য বিনষ্ট। খাইবার পরিবার সংস্থান নাই—যাহারা মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে আপনারা দেখিতেছেন। বন্যার ধ্বংসকার্য্যের বাকী যেটুকু ছিল, তাহা ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে শেষ করিয়াছে।

পথের কষ্ট, আসার কষ্ট, থাকার কষ্ট, খাওয়ার কষ্ট, আহার-পানীয়ের কষ্ট, অভ্যর্থনার ক্রটি—এ সকলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যাহারা নিজগুণে

অভ্যর্থনা-সমিতির পৃষ্ঠপোষক
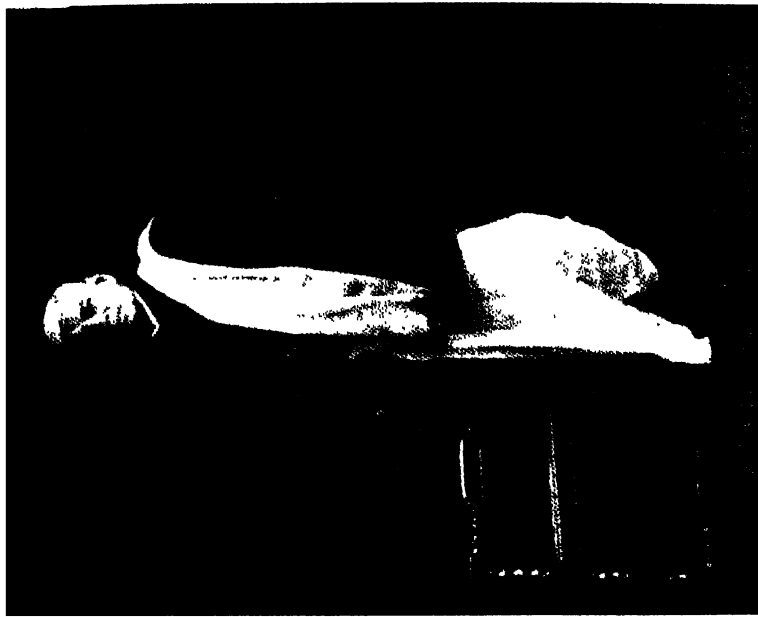
অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি

আসিয়াছেন, পল্লীমাতার গৌরব বাড়াইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য। তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। তাঁহাদিগকে সাদরে অভিবাদন করি, তাঁহাদিগের নিকট অবনতমস্তকে ত্রুটি স্বীকার করি ও ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

এই অধুনা-অবজ্ঞাত নগণ্য গ্রামে দূর দেশদেশান্তর হইতে এত সুধীসমাগমের দুরাশা কখনও কাহারও মনে স্থান পায় নাই। আমরাই সকলে পলাইয়া বিদেশে বাস করিতেছি। খানাকুল কৃষ্ণনগর-সমাজের সভাপতিরূপে একবার মোটামুটি আমাদের এ অঞ্চলের লোকের তালিকা প্রস্তুত করাইতে হইয়াছিল। তাহাতে দেখিয়াছিলাম, খানাকুল কৃষ্ণনগর রাধানগর অঞ্চলের প্রায় ৩।৪ হাজার লোক কলিকাতা ও কলিকাতার সহরতলীর একপ্রকার স্থায়ী অধিবাসী। দেশী বিদেশী এত লোকের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আজ আমার বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে। এই অসহ্য গ্রীষ্মে এত কষ্ট সহিয়া বহুদূর গ্রামান্তর হইতে এত ভদ্র-লোকের—এত সাহিত্যানুরাগীর এস্থানে সমাগম আমাদের যেমন গৌরবের কথা, তেমনই আশার কথা। দেশের এখনও ভরসা আছে বলিয়া মনে হইতেছে।

এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, আমাদের এত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই যে বিপুল জনসমাগম, অভ্যর্থনা-সমিতির কৃতিত্বের ফলে নয়, যে মহাজনের জন্মগৃহের আঙ্গিনায় আজ আমরা সমবেত, তাঁহারই অক্ষয় পুণ্য-ফলে এ অদৃষ্টপূর্ব্ব অঘটন ঘটিয়াছে।

গত বৎসর অমর বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভিটায় সাহিত্য-সম্মিলনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অনিবার্য্য কারণবশতঃ যাইতে পারি নাই। ত্রুটি স্বীকার করিয়া মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাতে লিখিয়া-ছিলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমিতে সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন বড় শোভন হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছিলাম যে, এই প্রণালীতে যদি সম্মিলনের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, আধুনিক বাঙ্গালার যাহা কিছু নূতন, যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু স্থায়ী, যাহা কিছু গৌরবজনক, যাহা কিছু আশাপ্রদ, সে সকলের জন্মভূমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরের জঙ্গলের মাটীতে আসিয়া মাথা ঠেকাইতে হয়। খেয়ালের ঝোঁকে অসাবধানে একথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। উৎসাহের ও আনন্দের সহিত কৃপাপরবশ হইয়া এ দীন আমন্ত্রণ—সাহিত্যিক

সমাজ ও পূর্ব্ব সাহিত্য-সম্মিলনীর পরিচালন সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। তাহার ফলে আজ আপনারা এখানে সমাগত।

এ অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে মহাত্মা রামমোহনের পুণ্যবলে। খানাকুল ও কৃষ্ণনগর রাধানগরের শাপান্তের বোধ হয় সময় উপস্থিত, তাই এত মহাজনের এখানে সমাগম। অভিরামের শাপে দ্বারকেশ্বরের কাণা হওয়ার খ্যাতি বহু দিন এখানে প্রচলিত। কোপন গোস্বামীর কৌপীন ভাসাইয়া লইয়া গিয়া নদী শাপগ্রস্ত হওয়ার এবং মালিনী কুখ্যাতি-কাহিনী রটনাতে সমাজ-নেতা চৌধুরী-দিগের প্রতি অভিশাপের কিংবদন্তী বহু দিন প্রচলিত।

কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অভিশাপের কারণ রামমোহন-নির্যাতন। স্বগৃহ হইতে তাড়িত রামমোহন যখন বাঙ্গালার নাম—বাঙ্গালীর নাম—জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিলেন, তখনও তাঁহার গ্রামবাসী—তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহার স্মৃতির যথেষ্ট মর্য্যাদা করিতে শিখিল না। দেশ-দেশান্তরে তাঁহার স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হইল, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি রাধানগরে হইল না! এত বড় মনস্তাপের কথা বহু দিন রহিয়া গেল। সম্প্রতি হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণের আনুকুল্যে সে ত্রুটি অপনোদনের চেষ্টা হইতেছে—সেই স্মৃতিগৃহের অঙ্গনে আপনারা আজ সমবেত। দক্ষিণে যে অৰ্দ্ধভগ্ন দোলমঞ্চ দেখিতেছেন, তাহাই রাজার কুলদেবতা রাজরাজেশ্বরের দোলমঞ্চ, এবং বামে যে তুলসীস্তূপ দেখিতে পাইতেছেন, তাহাই রাজার সূতিকাগারের নিদর্শন।

আপনারা পুণ্যভূমিতে সমাগত, পবিত্র স্থানে উপস্থিত, আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করিবার, অভিনন্দিত করিবার অধিকার পাইয়া আমি আজ ধন্য ও কৃতার্থ।

এ অধিকার ন্যায্যমত আমার প্রাপ্য নহে। আমাদের দুর্ভাগ্য অনেক—তাহার বহু পরিচয় পূর্ব্বে পাইয়াছেন, আরও কিছু পাইবেন। সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য আমাদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিতান্ত পীড়িত। দারুণ শোকভারে কাতর মন ও রুগ্ন দেহ লইয়াও গুরুতর রাজকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তথাপি ভূপেন্দ্র বাবু আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ-গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া সমগ্র খানাকুল প্রদেশের লোককে ধন্য করিয়াছিলেন; কিন্তু রোগবৃদ্ধির জন্য তিনি আসিতে পারিলেন না, আপনাদিগের সংবর্দ্ধনার ভার আমার অযোগ্য হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনাদিগকে যে আমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা এখনই

আমি আপনাদিগের নিকট পাঠ করিব। আপনারা সকলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন যে, তিনি যেন শীঘ্র নিরাময় হন; তাঁহাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করুন ও তাঁহার আরোগ্যের জন্য শুভ-ইচ্ছা প্রকাশ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আপনাদের অনুমতিক্রমে এই শুভ-ইচ্ছা আমি আপনাদিগের হইয়া তাঁহাকে জ্ঞাপন করিব।

ভূপেন্দ্র বাবুর আমন্ত্রণ-পত্র পাঠ করিলেই আমার সহকারী সভাপতির কার্য্য একরূপ শেষ হয়। কিন্তু সভার প্রারম্ভে শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় ও শাখা সভাপতি মহাশয়গণ এবং সম্মিলনের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদকগণ এবং সাহিত্যামোদী কুমার শরৎকুমার রায়ের ন্যায় মনীষিগণ নির্দ্দেশ করেন যে, অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সমবেত প্রতিনিধিগণকে আপ্যায়ন সময়ে সনাতন রীতি অনুসারে স্থানীয় ইতিহাস, কিংবদন্তী ও সাহিত্য-সংবাদের কথঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। খানাকুল কৃষ্ণনগর-সমাজের এতাদৃশ সমালোচন অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভব; তাহার জন্য সামান্য চেষ্টাতেও সভাপতি মহাশয়ের ও শাখা সভাপতি মহাশয়গণের অভিভাষণ-পাঠের সময় সংক্ষেপ করিলে রসভঙ্গের সম্ভাবনা। অথচ এতাবৎকাল আচরিত সনাতন নিয়ম ক্ষুণ্ণ করিবার সাহস ও স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। বড় দুঃখের বিষয় যে, দেশপ্রাণ বিপিনচন্দ্র ঘোষ ও পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি আজ পরলোকগত। এ বিষয়ের যথোপযুক্ত আলোচনা তাঁহাদের ন্যায় লোকেরই সাধ্য। এ কথার কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, ভাবিয়া পাই না। আধুনিক কাল হইতে আরম্ভ করিলে আমাদের অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কথাই এই অল্প সময়ের মধ্যে বলিয়া উঠা কঠিন। আজ তিনি বঙ্গেশ্বরের অন্যতর প্রধান অমাত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার —এই ক্ষুদ্র গ্রাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুই জন ভাইস্-চ্যান্সেলার পাঠাইতে পারিয়াছে, হিসাব খতিয়ানের সময় এ কথা উঠিতে পারে—তিনি সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের কাউন্সিলে প্রথম বে-সরকারী সভ্য। কৃতী ব্যবহারজীবী বলিয়া, দেশহিতৈষী বলিয়া, উদ্যোগী পুরুষসিংহ বলিয়া ভূপেন বাবুর যে খ্যাতি আছে, সে কথা সবিস্তারে বলিলেই এ প্রস্তাবের উপসংহার হইতে পারিত। কিন্তু এইমাত্র বলিলেই কথা শেষ হওয়া দূরে থাক, আরম্ভ হইবে মাত্র। এক ব্যবহারক্ষেত্রের কথাই যদি ধরা যায়, কলিকাতার আদালত এই কৃষ্ণনগর রাধানগরের অনেক গণ্যমান্য সন্তান দ্বারা পরিপুষ্ট। হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী

জজ রাজা রামমোহন রায়ের সুযোগ্য পুত্র রমাপ্রসাদ রায়। দুর্ভাগ্যক্রমে আদালতে বসিবার পূর্ব্বে এবং এই উচ্চ পদপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই রমাপ্রসাদ পরলোকগমন করেন। রমাপ্রসাদ শুধু কৃতী ব্যবহারজীবী ছিলেন এবং একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক ছিলেন, এমন নয়, সাহিত্যসেবীর বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় "ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী" নামে বাঙ্গালায় প্রথম Constitutional Law সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন এবং তদুপলক্ষে যে বীজবপন হইয়াছিল, তাহা কালে Talukdari Settlement of Oudh ও Hindoo Law of Inheritance আকার ধারণ করে। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের "পাটীগণিত" ও "বীজগণিত" যে গণিতক্ষেত্রে প্রথম ও প্রকৃষ্ট চেষ্টা, সমবেত সাহিত্যিকগণকে সে কথা স্মরণ করাইতে হইবে না। যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের "সঙ্গীতলহরী" ও "তীর্থভ্রমণ" ৭০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। "তীর্থভ্রমণ" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের "উষাহরণ নাটক" ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। পুরাতন নাটক, মধ্যকালের যাত্রা ও বর্ত্তমান যুগের গীতিনাট্যের উপকরণ বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থে ছিল; দুর্ভাগ্যক্রমে সে গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য।

কবি ভারতচন্দ্র রায় গৃহ-বিরোধকালে শ্বশুরালয়ে কিছু দিন এই প্রদেশে থাকিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর আবাল্য সুহৃদ্ ছিলেন। একত্রে তাঁহাদের সাহিত্যসেবা, একত্রে তাঁহাদের পদব্রজে যাওয়া ও বড় নদী পার হইয়া একবার সাঁতরাইয়া আসার গল্প অনেকের মুখে শুনিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ী বীরসিংহ গ্রাম ভৌগোলিক মতে এখন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হইলেও এখান হইতে অধিক দূর নয়। "মৃচ্ছকটিক নাটক" বাঙ্গালায় "বসন্তসেনা" নামে রূপান্তরিত করিয়া যিনি বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ্ বাড়াইয়া গিয়াছিলেন, সেই মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের নিবাসগ্রাম পাতুল এখান হইতে অধিক দূর নয়। পরমহংস রামকৃষ্ণ-দেবের জন্মস্থান আমাদেরই মহকুমার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে। আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রামে অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের হাতেখড়ি হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পিতৃদেবের কিশোর বন্ধু ছিলেন—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়-রচিত হেমচন্দ্রের জীবন-চরিতে তাহার পরিচয় পাইবেন। প্রসন্নকুমারের রাধানগরে স্থাপিত বিদ্যালয় Anglo-Sanskrit Schoolএ হেম বাবু কিছু কাল প্রধান শিক্ষকের কায করিয়া

গ্রামকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর তাঁহার কোনও রচনার পাণ্ডুলিপি আমাদের কলিকাতা বহুবাজার ৫৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাসায় না শুনাইয় ছাপাখানায় যায় নাই। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও তদগ্রজ রামকমল ভট্টাচার্য্যের সাহিত্যচর্চ্চা এইখানে আরম্ভ হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল বাবুও এককালে এই গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অন্যান্য শিক্ষকদিগের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য নাম,—নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, প্রথম বাঙ্গালা ভূগোল-রচয়িতা তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, উত্তরকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শিবচন্দ্র গুঁই, জয়পুর মহারাজ কলেজের অধ্যক্ষ দীননাথ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ান উমেশচন্দ্র গুপ্ত, সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নীলমণি মুখোপাধ্যায় এবং কবি Sturgeon.

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার Anglo-Sanskrit বিদ্যালয়ের জন্য উপরিউক্ত মনীষিগণের ন্যায় শিক্ষক সংগ্রহ করিতেন এবং মাঝে মাঝে দেশ-বিশ্রুত পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, জগন্মোহন তর্কা-লঙ্কার প্রভৃতির ন্যায় পণ্ডিতগণকে আনিয়া গ্রামের গৌরববর্দ্ধন করিতেন, কাযেই উমেশচন্দ্র বটব্যালের ন্যায় ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিত। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ"। প্রসন্নকুমারের বিদ্যালয় নদীগত, গ্রামের মানমর্য্যাদা ও সাহিত্য-সেবা সব নদীগত। অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রদেশটাকে ভালবাসিতেন; তাঁহার গড়মান্দারণ এই মহকুমার অন্তর্গত, তাঁহার কপালকুণ্ডলা ও লুৎফ-উন্নিসা আমাদের গ্রামের অনতিদূরের রাজপথ ধরিয়া বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন—সেই পথই ৺জগন্নাথপুরী যাইবার এ প্রদেশের একমাত্র সুপথ। বহু সাধু সন্ন্যাসী এই পথে যাইতেন, আসিতেন, গ্রামে অতিথি হইতেন। রামমোহন বাল্যজীবনে তাঁহাদের অনেকের সঙ্গলাভের সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্রে আলোচনার অবসর পাইয়াছিলেন। আবার মুন্সী রাম-নারায়ণ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের "মুন্সী চালায়" বসিয়া আরবী ফারসী অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পিতৃমাতৃবংশে তিনি বৈষ্ণব-শাক্তের ঘোর দ্বন্দ্ব আবাল্য দেখিয়া আসিতেছিলেন। নিকটেই ঘণ্টেশ্বর শিব, অভিরামের স্থাপিত গোপী-নাথ, যাদবেন্দু চৌধুরীর স্থাপিত রাধাবল্লভ, রামনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষস্থাপিত রাধাকান্ত, আগমবাগীশের পঞ্চমুণ্ডীর আসন, কণাদের অধ্যাপনার স্থান, কৃষ্ণ-নগরের ঠাকুর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের কীর্ত্তিস্থান অবস্থিত। এইরূপ অপূর্ব্ব

ঘটনাসমবায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া রামমোহনের ন্যায় প্রতিভাশালী মহাপুরুষ যে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টায় সফল হইবেন, Comparative Religion শাস্ত্রের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি!

কথাবাহুল্যের সময় নাই, তথাপি সমাগত মনীষিগণের নির্দ্দেশ অনুসারে দুই একটা স্থানীয় পুরাতন কথার আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা হয় ত অপ্রাসঙ্গিক নহে।

সেকালে খানাকুল কৃষ্ণনগর ও রাধানগর বঙ্গের প্রাচীনতম পল্লীগুলির মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। নবদ্বীপ পণ্ডিত-প্রতিভায় বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে বটে এবং সে স্থান শ্রীচৈতন্যদেবের পদধূলি-স্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তথায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি বোধ হয় জন্মগ্রহণ করেন নাই। চৈতন্যদেবের পদরজ অভিরামের কৃপায় কৃষ্ণনগরেও পড়িয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী। বিক্রমপুর কোটালীপাড়া প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধি কেবলমাত্র বিদ্যাচর্চ্চার জন্য। কিন্তু খানাকুল কৃষ্ণনগর ও রাধানগরে কেবলমাত্র ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ ও ন্যায় স্মৃতি ও তন্ত্রের পণ্ডিতগণ জন্ম-গ্রহণ করিয়াই যে এ স্থানকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাহা নহে। এখানে ভারতের নবযুগের প্রবর্ত্তক আবির্ভূত হইয়া ইহাকে যে এক অপূর্ব্ব অথচ অপব্যবহৃত শক্তিতে শক্তিমান্ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে আজও এখানকার মনীষিগণ সর্ব্বত্র সর্ব্বজনমান্য হইতেছেন।

এই গ্রাম তিনটি পূর্ব্বে বর্দ্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে ইংরাজ বণিক-কোম্পানীর আমলে "জেলা"র সৃষ্টি হইলে এগুলি বর্দ্ধমান জেলার সীমাভুক্ত ছিল। তাহার অনেক পরে হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় ও তৎপরে পুনরায় বর্দ্ধমানের অধীন হয়। মধ্যে একবার ইহা হুগলী ও হাবড়ার অন্তর্গত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা হুগলীর অধীন।

এক সময় এই কৃষ্ণনগর বিশাল নদীগর্ভে বিলীন ছিল। এই নদী রামগড় হইতে উৎপন্ন হইয়া রূপনারায়ণ নদে পতিত হইত। ইহার দৈর্ঘ্য বহুযোজনব্যাপী ও ইহার প্রশস্ততাও যথেষ্ট ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এই নদীর এক-পার্শ্বে পাতুল ও অন্যপার্শ্বে ধামলা অবস্থিত ছিল। মধ্যে অগাধ জলরাশি। সুদৃঢ় ও সুবৃহৎ নৌকা সাহায্যে এই জলরাশি অতিক্রম করিতে হইত। বর্ত্তমান খানাকুল গ্রামে যে ৺ঘণ্টেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে, তাহারই পাশ দিয়া এই স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইত। এই নদীর নাম ছিল রত্নাকর। নবীন রত্নাকর

(অর্থাৎ এখনে রত্নাকর নামে যে নদী বর্ত্তমান) এবং বহুদূরব্যাপী রড়াখাল ("রত্নাকরের" অপভ্রংশ "রড়া") আমাদের পুরাতন রত্নাকর বিলোপের চিহ্ন। আরও এরূপ কিংবদন্তী শুনা যায় যে, কৃষ্ণনগরের উত্তরে যে স্থান এক্ষণে মাজপুর নামে অভিহিত, সেস্থানে তৎকালে মধ্যমপুর নামে এক সমৃদ্ধ নগর ছিল। নৌকা সাহায্যে পণ্যাদি আমদানি রপ্তানি করা হইত। নদীগর্ভ হইতে ক্রমশঃ গ্রামের উদ্ভব হইলে, কোন কোন স্থানে পণ্যবাহী জলযানের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণনগরের উত্তর-পূর্ব্বে নাংড়ীক্ষেত্র নামক স্থানে ভূগর্ভে প্রোথিত মাস্তুল, এবং ঐ স্থানের প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণে ভগবতীতলা নামক স্থানে পুষ্করিণী খননকালে নৌকার অনেক অংশ পাওয়া গিয়াছে।

কত শত বৎসরের নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের ফলে জলভাগ স্থলে পরিণত হইল তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু চতুর্দ্দশ শত শকাব্দের শেষভাগে অথবা পঞ্চদশ শত শকাব্দের প্রারম্ভে যে এই স্থান বাসোপযোগী হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে বহু লোক বসতি করিতে আরম্ভ করিতেছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ৺পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে খানাকুল-কৃষ্ণনগর ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতে আরম্ভ করে।

চৌধুরীবংশীয় মহাত্মা যাদবেন্দু সিংহ রায় চৌধুরী এ সময় ধামলায় বাস করিতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের অথবা ঢাকার নবাবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে গড়মান্দারণের অধিবাসী স্থির করিয়াছেন—ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র সিংহ ও কায়স্থ চৌধুরী বংশে প্রভেদ আছে মনে করেন নাই। এই নূতন উদ্ভূত দেশের মনোহারিত্ব ও জনসংখ্যার ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখিয়া তিনি পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া এস্থানে আসেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণরামের পুত্র বংশীধর, বন্দ্যবংশীয় পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমন্নারায়ণ ঠাকুরের সমসাময়িক। নারায়ণ ঠাকুর প্রণীত 'সবচন স্মৃতি-সর্ব্বস্ব' নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি অতি বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। নারায়ণ ঠাকুর তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে ষোড়শ শত শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা তাঁহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তক হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। সংক্ষিপ্ত-সার ব্যাকরণের তিঙন্তের টীকা শেষ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"ক্ষমাচলেষু শশভূন্মিত-শাকবর্ষে পারীন্দ্রগে দিনমণৌ দ্বিজবংশজেন। শ্রীরামপাদকমলে শরণাগতেন নারায়ণেন সুধিয়াসমলেখি টীকা ॥১৫৮১

তৎরচিত 'ধাতু রত্নাকর' গ্রন্থের শেষভাগে উক্ত হইয়াছে "শাকাব্দে রসনাগরোপ-

রজনীনাথৈর্মিতে মাধবে, শ্রীরামস্ত পদারবিন্দযুগলম্ ধ্যাত্বা চিরং নির্ম্মিতঃ।

১৫৮৬।

গ্রন্থোহয়ম্ শশিবাজিমৈত্রগণিতৈঃ সন্দর্ভিতো ধাতুভিঃ, শ্রীনারায়ণশর্ম্মণা পরমতো বোধ্যম্ প্রয়োগাৎ সতঃ॥

তাঁহার পৌত্র বিষ্ণুদেব "স্মৃতিসংগ্রহের" অনুলিপি শেষ করিয়া লিখিতেছেন "আলেখি স্মৃতিসংগ্রহো জলধরাম্ভোদর্ত্তুভূসংমিতে শাকেঽস্মিন্ সিতপক্ষকে হরি। তিথৌ শ্রীবিষ্ণুনা মাধবে॥ ১৬৪৪

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বিদ্বদ্‌বর নারায়ণ ঠাকুর ও দানশৌণ্ড বংশীধর রায় শোড়শ শত শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আর স্থূলতঃ বশীধরের পিতামহ যাদবেন্দু সিংহ রায়কে পঞ্চদশ শত শকাব্দের লোক মনে করা যুক্তিবিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হয় না। যাদবেন্দু সিংহ ন্যূনাধিক চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এবং মধ্য বা অন্ততঃ শেষ বয়সে তিনি কৃষ্ণনগরে আসিয়া বাস করেন ইহা স্থির। তিনিই কৃষ্ণনগরের প্রথম বিশিষ্ট অধিবাসী, এরূপ মনে করিবার কারণ না থাকিলেও তাঁহার সময়েই কৃষ্ণনগরের ভাবী গৌরবের সূচনা হয় এবং তাঁহার সময় হইতেই কৃষ্ণনগরের গুপ্ত-বৃন্দাবন খ্যাতির যে প্রচার হয়, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে।

যাদবেন্দুর বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅভিরামদেবের কৃষ্ণনগরের সহিত সম্পর্ক সূচিত হয়। যাদবেন্দুর পৌত্র বংশীধর, বন্দ্যবংশের নারায়ণ ঠাকুর, ভট্টাচার্য্য বংশের প্রবর্ত্তক কণাদ ও রত্নগর্ভ আগমভূষণ ক্রমে এখানে আবির্ভূত হন। এই সকল পরম ভাগবত মহাত্মাগণই এ প্রদেশের সাধক ব্যবস্থাপক এবং সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। ইঁহাদের জীবনী আলোচনা স্থানীয় ইতিহাস বুঝিবার সহায়ক।

কবি যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন যে,—স্বচ্ছপবিত্র নির্ম্মল-জ্যোতিঃ বহু মণিরত্নই সমুদ্রের অতলস্পর্শ অন্ধকারাচ্ছন্ন তলদেশে চিরদিন প্রচ্ছন্নভাবেই থাকিয়া যায়। লোক-লোচনের অগোচরে বনমধ্যে অনেক সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া বন বায়ুতেই সেই গন্ধ ছড়াইয়া থাকে এবং কালের নিঃশ্বাসে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। আমাদের এই রত্নপ্রসূ দেশে জোৎস্নামাখা কুসুমের ন্যায় লাবণ্যোজ্জল-কান্ত-কান্তি, বহু বিভূতিসম্পন্ন, আত্মত্যাগী মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জগতে চির-অপরিজ্ঞাত থাকিয়াই তাঁহাদের পবিত্র পুণ্যময় জীবনের অবসান হইয়াছে।
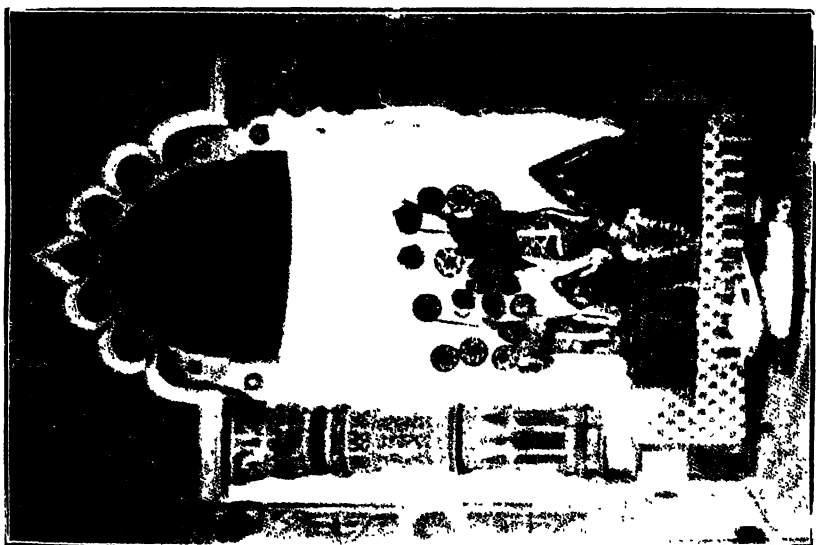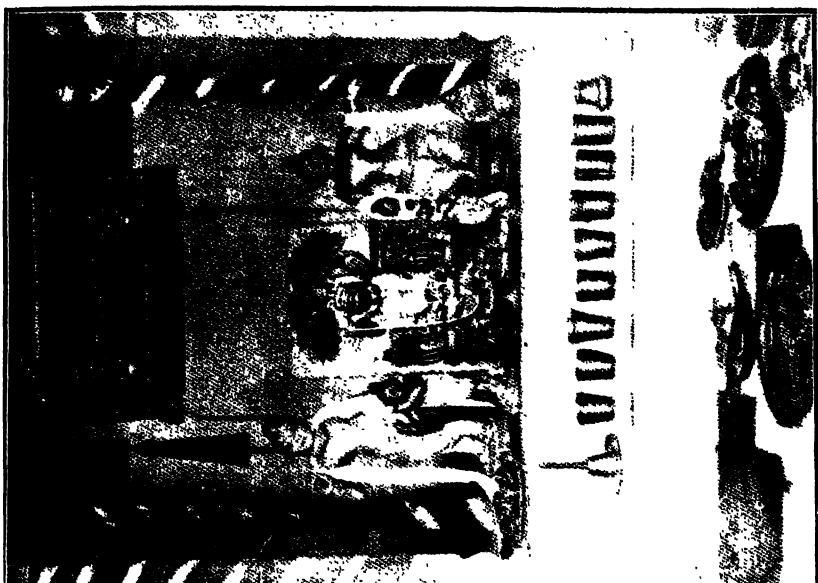
শ্রীযাদবেন্দু :—ইঁহার আদিবাস জাহানাবাদের সন্নিকট গড়মান্দারণে বলিয়া প্রসিদ্ধি। সেখানে কিছুদিন বাস করিবার পর ধামলায় আসেন। ধামলার নিকট এক স্থানে তিনি ঈশ্বরী সারদাদেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। ঐ দেবীর নামানুসারে এক্ষণে ঐ গ্রাম সারদা নামে অভিহিত। এই সময় রত্নাকর নদী ক্রমশঃ মজিয়া এক অতি বিস্তৃত ভূভাগের সৃষ্টি হয়। এই নূতন উৎপন্ন দেশে বাস করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মধ্য বয়সে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। নবাবের একজন প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার প্রতাপ বা বৈভব কম ছিল না, কিন্তু তিনি সামান্যভাবে জীবন যাপন করিতেন। বিলাসিতা বা অনর্থক ব্যয়-বাহুল্য কিছুই তাঁহার ছিল না। তাঁহার উৎসব আনন্দ ছিল দেবপূজায় এবং দেবতাকে নিবেদিত ভোগের প্রসাদে দরিদ্রনারায়ণের সেবায়। কিংবদন্তী এই যে, তিনি একদিন স্বপ্ন দেখেন, যেন তাঁহার অভীষ্ট দেবতা প্রত্যাদেশ করিতেছেন, "যাদবেন্দু তুই এই রমণীয় দেশে আমারই মূর্ত্ত্যন্তর রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা কর, নবাবের তোরণ-স্তম্ভের প্রস্তর হইতে ঐ মূর্ত্তি প্রস্তুত করাস"। ক্ষণেক পরেই দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত ও যাদবেন্দুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। পর দিনই তিনি শ্রীমূর্ত্তি গঠনের জন্য প্রস্তর সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে মন্দির নির্ম্মাণেরও সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বেই প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া তিনি সুদক্ষ ভাস্কর দ্বারা সুচারু দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে কিন্তু মন্দির তখনও অর্দ্ধনির্ম্মিত। এরূপ অবস্থায় তাঁহার শত্রুপক্ষ নবাবকে সংবাদ দিল যে, যাদবেন্দু তাঁহার তোরণ-স্তম্ভ হইতে বহুমূল্য প্রস্তর লইয়া তৎস্থানে অন্য প্রস্তর বসাইয়া দিয়াছে। তৎক্ষণাৎ নবাবের একেবারে চরম আদেশ হইল, "হস্তী দ্বারা যাদবেন্দুর মুণ্ড ছিন্ন করিয়া আন"। হস্তিপক পরিচালিত মদমত্ত হস্তী আসিয়া শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগস্থ প্রাঙ্গণে যাদবেন্দুর মুণ্ড ছিন্ন করিল। ভূতলে পতিত হইবামাত্র ছিন্নমুণ্ড বলিয়া উঠিল, "বড়সাধ রইল মনে, রাধাকান্ত রাধাবল্লভকে বসাতে পারলুম্‌নি নবরতনে"। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে, নয়চূড়াবিশিষ্ট নব-মন্দিরে শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা করেন! এই অলৌকিক ব্যাপার শ্রবণে নবাব বিস্ময়-বিমূঢ় হইলেন। এবং পরে যাদবেন্দুর প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার পুত্র কৃষ্ণরামকে পিতৃপদাভিষিক্ত করিলেন। কৃষ্ণরামের জীবনবৃত্তান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁহার সম্বন্ধে এই মাত্র জানা যায় যে, তিনি কোনরূপে মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য

সম্পন্ন করিয়াছিলেন মাত্র। নবাবের ভয়ে পিতার অভিপ্রায় মত মন্দিরটীকে নয়চূড়া-মণ্ডিত বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন নাই। যাদবেন্দুর এই মন্দির এখনও বিদ্যমান এবং মন্দিরাভ্যন্তরে মধুর মনোমোহন শ্রীমূর্ত্তি আজিও বিরাজিত।

যাদবেন্দুর পৌত্র গুণগ্রাহী বংশীধর বহুদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদের বাসের জন্য কৃষ্ণনগরে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। এক স্থানে বন্দ্যোপাধ্যায়গণকে, অন্যস্থানে ভট্টাচার্য্যগণকে, কোথাওবা চক্রবর্ত্তীগণকে, এইভাবে বসবাস করাইয়া ক্রমশঃ তাঁহাদের বংশীয়গণ বাঁড়ুয্যে পাড়া, ভট্টাচার্য্য পাড়া, চাটুয্যে পাড়া এইরূপ এক একটি পাড়ার সৃষ্টি করিলেন। তন্তুবায় প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের বাসস্থানও বংশীধর বৃত্তাকারে স্থাপিত করেন।

তাঁহার বংশধরগণ সকলেই মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র শিবচরণ ৯ শত বিঘা ভূমি ও ৯টী পুষ্করিণী দান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত জলাশয় এখনও বিদ্যমান আছে, যদিও সংস্কারাভাবে ইহাদের অবস্থা শোচনীয় এবং যে যৎসামান্য জল আছে তাহাও জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ। রাজা রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র খানাকুল কৃষ্ণনগরের চৌধুরী মহাশয়দিগের জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য নবাব কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। কারণ, তাঁহারা সুবিধা বুঝিলেই নবাবের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কর প্রদান বন্ধ করিয়া দিতেন। উক্ত চৌধুরী বংশই এখানকার প্রাচীনতম জমীদার। তাঁহারা কতদূর তেজস্বী ছিলেন তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বাধিকারী বংশ তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এই স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। সর্ব্বাধিকারীদিগের পূর্ব্বপুরুষ রত্নেশ্বর প্রথম এখানে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। কটকে তিনি প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমার দ্বারা সম্ভব ও উচিত নহে।

অন্যান্য কায়স্থবংশের মধ্যে বসু বংশও অতি সমৃদ্ধিশালী ও প্রাচীন বংশ। এই বংশের প্রতিনিধি ৺ত্রৈলোক্যনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু স্বনামধন্য ও দেশপ্রসিদ্ধ। মিত্রবংশীয় ও ঘোষবংশীয় এবং অপরবংশীয়গণও কম প্রতিপত্তিশালী ছিলেন না। কিন্তু সকলের কথা সবিস্তারে বলা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

অভিরাম গোস্বামী। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে কবিকর্ণপুর তৎকৃত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়' লিখিয়াছেন যে—

পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্
দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যংকাষ্ঠমুবাহ যঃ ॥ ১২৬

অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন-লীলার যিনি শ্রীদাম ছিলেন তিনিই অধুনা অভিরাম গোস্বামী, তিনি বত্রিশজনে বহনযোগ্য কাষ্ঠখণ্ড একা বহন করিয়াছিলেন। অভিরাম গোস্বামীর জীবনী নানারূপ অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাহার মধ্য হইতে সত্যের কণা আবিষ্কার করা দুরূহ ব্যাপার। তিনি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পার্শদ ছিলেন ও সেই যুগে তাঁহার প্রভাব যে সকলেই অনুভব করিতেন, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। তাঁহার জীবনী-কথা লইয়া তাঁহার মন্ত্রশিষ্য রামদাস "অভিরাম-লীলামৃত" ও রাইচরণ দাস "অভিরাম-বন্দনা" প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহা ব্যতীত "অভিরামের শ্রীপাট ভ্রমণ" 'অভিরাম পটল' ও 'অভিরামশাখা নির্ণয়' নামক গ্রন্থগুলিতেও তাঁহার পরিচয় সবিশেষ প্রদত্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্ব্বত্রই তাঁহার কথা লিখিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের শাখাভুক্ত বলা হইয়াছে যথা -

অভিরাম মুখ্যশাখা সখ্য প্রেমরাশি
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী ॥

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে অভিরামের মুরলীবাদন সম্বন্ধে লেখা আছে—

একদিন প্রেমানন্দে মত্ত অভিরাম।
করয়ে নর্ত্তন সে ভঙ্গিমা অনুপাম ॥
সখ্য রসাবেশে বংশী বাজাইতে চায়।
ইতি উতি ফিরে নিজ বংশী নাহি পায় ॥
শতাবধি লোক যারে নারে চালাইতে।
হেন কাষ্ঠ বংশী করি ধরিলেন হাতে।

"অভিরামলীলামৃত" গ্রন্থ বলেন যে, ঐ কাষ্ঠ পূর্ব্বাবতারের সকল গোপবালকের মুরলীর সমষ্টি। অভিরাম পত্নী শ্রীমতী মালিনী ঠাকুরাণী ঐ কাষ্ঠ এক অঙ্গুলী দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের সান্নিধ্যে কাজীপুর নামক এক গ্রাম ছিল। অভিরাম গোস্বামীর আগমনের পর উহা শ্রীপাট খানাকুল নামে প্রসিদ্ধ হয়। অধুনা উহার তটবাহিনী "কানা" নদীই পূর্ব্বকালের "রত্নেশ্বর"। অভিরামের কৌপিন ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহার শাপে উহা ক্ষুদ্রকায়া হইয়াছে। ইহাও 'অভিরামলীলামৃতে' বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ

শতাব্দী হইতেই এই নদী স্বল্পতোয়া হইয়াছে। 'বৈষ্ণবাচারদর্পণে'ও অভিরাম সম্বন্ধে লিখিত আছে—

গৌড়দেশে খানাকুল নিবাস প্রচার।
বত্রিশ বোঝা কাষ্ঠের হয় বংশী যাহার॥

'অভিরামশাখানির্ণয়ে' তাঁহার ২৪ জন প্রধান শিষ্যের নাম ধামের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে—

"খানাকুলে কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস।
কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগভ পরবাস॥"

ও "রাধানগরে বাস যদু হালদার
হীরামাধবদাস স্থিতি অনন্তসাগর॥"

কৃষ্ণদাস ঠাকুর ও যদু হালদারের ন্যায় ব্যক্তিগণ যে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও এ অঞ্চলে অভিরামের প্রভাব বুঝা যায়। উক্ত দুই মহাত্মার কোন বংশধর এখন জীবিত নাই। যদু হালদারের শ্রীবিগ্রহ অভিরামের গোপীনাথ মন্দিরে সেবিত হইতেছেন। বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ ভাগে পুরাতন নবরত্ন মন্দির বিরাজিত। ঐ স্থানেই অভিরাম ঠাকুর খড়ের ঘরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্ত্তমান মন্দির ১২১৯ সালে নির্ম্মিত হয়। মন্দির মধ্যে অভিরাম ঠাকুরের শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর শ্রীমূর্ত্তি একখানি কষ্টি প্রস্তরের উপর খোদিত। প্রস্তর খানিতে বস্ত্রহরণ-লীলার চিত্রও উৎকীর্ণ। নিম্নে যমুনা প্রবাহিতা, উচ্চে পর্ব্বতে ধেনু চরিতেছে, কদম্ববৃক্ষোপরি শ্রীগোপীনাথ বংশীধ্বনি করিতেছেন গোপীগণ চতুর্দ্দিকে বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছেন। চিত্রের পরিকল্পনা এইরূপ। উক্ত শ্রীবিগ্রহ ব্যতীত বলরাম, মদনমোহন, গোপাল ও অভিরাম ঠাকুরের মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে অবস্থিত। কথিত আছে, উপাস্য শ্রীকান্তকে হারাইয়া অভিরাম ঠাকুর দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোথাও তাঁহার হৃদয়-দেবতার দেখা পাইলেন না। কোন বিগ্রহে সর্ব্বব্যাপী তাঁহার শক্তি নিহিত করিলেন। সাধকের প্রণাম জাগ্রত বিগ্রহ ভিন্ন কে সহ্য করিতে পারে? অভিরাম দেবমূর্ত্তি দেখিলেই দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করেন, আর সেই প্রণামরূপ দণ্ডাঘাতে বিগ্রহ চূর্ণ হইয়া যায়। কথিত আছে, এই উৎকট প্রণাম সহিয়াছিলেন বগড়ীর কৃষ্ণরায় (যদিও কৃষ্ণরায় ও বিকৃতাঙ্গ হইলেন) এবং রাধানগরের সর্ব্বাধিকারীদিগের বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও তৎসহচর শালগ্রাম—যদিও এই অসহ্য প্রণামের তাড়নায়
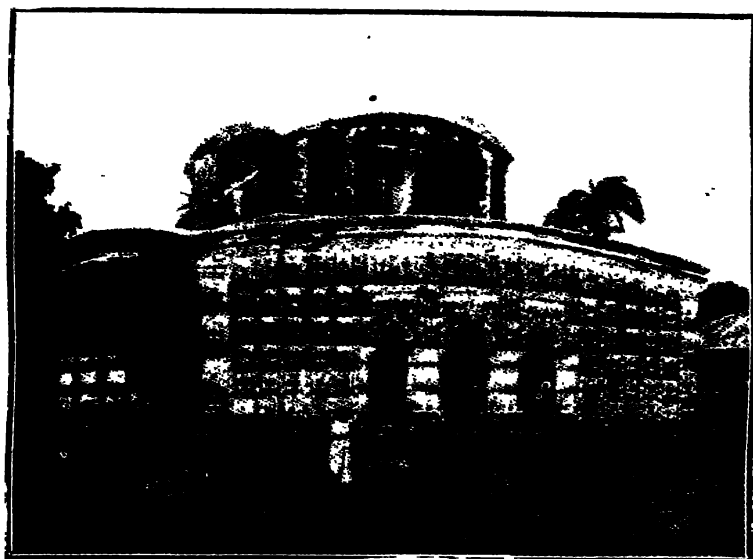
রাধাবল্লভের মন্দির—কৃষ্ণনগর

গোপীনাথের মন্দির—কৃষ্ণনগর

শালগ্রাম শীতলকায় হইলেন। সেই হইতে তিনি শীতলানন্দ নামে খ্যাত।

এইরূপ নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে অভিরাম কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করেন। অবসন্ন মনে আকুলপ্রাণে তিনি বাঞ্ছিতের দর্শন কামনা করিতে লাগিলেন। ভক্তের ব্যাকুলতায় ভগবানের প্রাণে বাজিলে প্রত্যাদেশ হইল—"বৃথা আর আমার অন্বেষণ করিস্‌না, কলিযুগ আগতপ্রায়, আর আমি নয়নগোচর হইব না। সন্নিকটস্থ এই বকুল বৃক্ষের কাণ্ডদেশে আমার প্রস্তরমূর্ত্তি পাইবি। তাহাই প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনের শেষ কয়েক দিন তাঁহারই আরাধনায় অতিবাহিত কর।" এই প্রত্যাদেশে ভক্তশ্রেষ্ঠ নিরস্ত হইলেন, এবং আপাততঃ এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বৃক্ষকাণ্ড হইতে অভীষ্ট মূর্ত্তি বাহির করিয়া তৎসেবায় নিরত হইলেন। বহুদিন পরে সুরম্য মন্দির ও নাট্য-মন্দির ইত্যাদি নির্ম্মিত হয় ও তন্মধ্যে শ্রীশ্রীগোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত হন। তদবধি অভিরামের শিষ্যের বংশধরগণ ঐ স্থানে বাস করিয়া এতাবৎকাল ৺পূজা ভোগরাগ উৎসব নামকীর্ত্তন দরিদ্র-নারায়ণ সেবা প্রভৃতি যথানিয়মে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। এখনও বিশেষ বিশেষ উৎসবকালে নানাদেশ হইতে ভক্তগণ আসিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা **নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর** এ অঞ্চলের অন্যতম গৌরব। তিনি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সঠিক জানা যায় না। 'অভিরাম-লীলামৃতের' ৭ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত তাঁহার বাণী অনুসারে তাঁহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলা যাইতে পারে। ঐ স্থানে তিনি কাশীধামের বিচার-সভায় নিজের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—

"গোপীনাথো মহাপ্রভুর্বিজয়তে যত্রাভিরামো মহান্, গোস্বামী শতবাহু দারুমুরলীং কৃত্বা সমবাদয়ৎ যং ক্রয়ুর্জবাসিবৈষ্ণবগণাঃ শ্রীগুপ্তবৃন্দাবনম্ তস্মিন্ শ্রীমতি চারুকৃষ্ণনগরে বাসোমদীয়োঽধুনা।"

স্মার্ত্তরঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে যে যে স্থানে অলৌকিকতা আছে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, সে সকল তিনি খণ্ডন করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম "স্মৃতি-সর্ব্বস্ব"। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত Buhler সাহেবের Detailed Reports of a tour in search of Sanskrit Mss. made in Kashmir, Rajputana and Central India তে ঐ গ্রন্থের উল্লেখ

আছে। Eggelings India Office Catalogueএও আছে। তিনি প্রায় তিন শত গ্রাম লইয়া প্রভূত শক্তিশালী খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজ প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে বংশীধর রায়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিমপারে এত বড় সমাজ আর কোথাও নাই। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন গভীরদর্শী মনীষী ছিলেন। ইঁহার পিতা শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার সন্নিকট বালীগ্রামে বাস করিতেন। নারায়ণ ঠাকুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশবেই মাতৃহীন হওয়ায় কিছুদিন মাতামহ চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের আলয়ে প্রতিপালিত হন। নয় দশ বৎসর বয়সে একমাত্র সহোদরার মৃত্যুর পর তিনি বিদ্যালাভের জন্য কাশীধাম গমন করেন। তথায় ১৮ বৎসর বাস করিয়া বেদবেদান্ততর্ক-মীমাংসাদি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কাশীতে অধ্যয়ন শেষ হইলে তিনি প্রয়াগাদি নানা তীর্থ ও বিদ্বজ্জনসেবিত মিথিলাদি নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া অবশেষে কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণনগরের সন্নিকটস্থ রামনগর গ্রামে রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নামে এক অতি সুপণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার সহিত ঐ স্থানে ইঁহার প্রথম আলাপ ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি হয়। তাহার ফলে রাজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বহুদর্শী বিচক্ষণ প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে পারেন ও তাঁহাকে এস্থানে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সময়ে যাদবেন্দুর পৌত্র বদান্য বংশীধর কৃষ্ণনগর-সমাজ স্থাপন নিমিত্ত নানাদেশ হইতে সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ কুলীনগণকে আনাইয়া এস্থানে বাস করাইতে-ছিলেন। শুনা যায়, পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রনাথ তাঁহারই আনীত। তিনি নবাগত মহাপুরুষের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও কৌলীন্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে বাস করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। নারায়ণ ঠাকুর তাহাতে স্বীকৃত হন ও চৌধুরী বংশের গুরু পঞ্চানন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। দানগ্রহণে পাতিত্য জন্মে বলিয়া তিনি দানগ্রহণে কোন ক্রমেই সম্মত হন নাই। অবশেষে বংশীধর ভূমি ও বাস-স্থানাদি তাঁহার গুরুকে অর্পণ করেন এবং তিনি পরে কন্যা বিবাহের যৌতুকরূপে ঐ সমস্ত বিষয় জামাতা নারায়ণ ঠাকুরকে দান করেন।

অল্পদিন পরেই একমাত্র শিশুসন্তান রাখিয়া তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। শিশুপুত্র পালনের জন্য ও বংশীধরপ্রমুখ সকলের বিশেষ অনুরোধে তিনি পঞ্চানন ন্যায়রত্নের সহোদর মহেশ চূড়ামণির সতী নাম্নী কন্যাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাহার পর তিনি দ্বিতীয়বার কাশীযাত্রা করেন। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠ

পুত্র দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দিষ্ট থাকেন। তাঁহার শ্রাদ্ধাদিও যথারীতি সম্পন্ন হইয়া যায়। দ্বাদশ বৎসরের পর পুত্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে কোন পণ্ডিতই কাশীরাজকে পুনর্ব্বার পুত্রগ্রহণের ব্যবস্থা দিলেন না, সকলেই একবাক্যে এরূপ গ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দোষাবহ বলিয়া প্রচার করেন। এ সংবাদ শ্রবণে নারায়ণ রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া ঐ পুত্রের পুনর্গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া মত দেন। পরদিন এ বিষয়ের শাস্ত্রসম্মত মীমাংসার জন্য এক মহতী পণ্ডিতসভা আহূত হইলে তদ্দেশীয় প্রধান পণ্ডিতগণ সহ তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হন ও তাঁহাদের মতের ভ্রম নির্দ্দেশ করতঃ যুক্তিবলে ও শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। ইহার ফলে তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হয়। সকল শাস্ত্রেই তাঁহার অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে তিনি 'সারাবলী' নামে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ১৫৮৬ শকে 'ধাতু-রত্নাকর' নামে আর একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে ধাতুরূপ অতি সুন্দরভাবে ছন্দে লিখিত হয়। ইহা ব্যাকরণ-শিক্ষার্থীর অবশ্যপাঠ্য। অতঃপর তিনি অশৌচ ব্যবস্থাবলী শ্লোকনিবদ্ধ করিয়া "শুদ্ধিকারিকা" নামে এক পুস্তক লেখেন। তাঁহার "সবচন নির্ব্বচন স্মৃতিসর্ব্বস্ব" তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। "খানাকুল কৃষ্ণনগর মত" বলিয়া যে মত প্রচলিত এবং বাঙ্গালায় বহুলোক যে মতাবলম্বী তাহা নারায়ণ ঠাকুরেরই প্রবর্ত্তিত। সে মত প্রচলিত সঙ্কীর্ণ ও রঘুনন্দনের স্মার্ত্ত মতের স্থানে স্থানে বিরোধী হইলেও বিচার যুক্তি ও যথার্থ শাস্ত্রমর্ম্মসম্মত এবং সহৃদয়তারূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

'বেদান্তবাদ' নামে তিনি শেষ বয়সে একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বেদান্তদর্শনের সারমর্ম্ম ও নিজের ধর্ম্মমত অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার একখানি গ্রন্থও ছিল।

বড়ই দুঃখের বিষয়, ৩০০ বৎসর অতীত হইয়া যাইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন পুস্তকই প্রকাশিত হইল না। গুপ্তবৃন্দাবনের সকল মণিরত্নই গুপ্ত রহিয়া গেল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া 'সারাবলী', "শুদ্ধি কারিকা", 'ধাতুরত্নাকর' ও 'সবচন নির্ব্বচন স্মৃতিসর্ব্বস্ব' এইকয়খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। অন্যগুলির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার ও তাঁহার সুযোগ্য বংশধরদিগের নিকট বাঙ্গালার বহুখ্যাতনামা অধ্যাপকগণ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তৎকাল-প্রচলিত রীতি অনুসারে নিশ্চয়ই গুরুর অমূল্য গ্রন্থরাজির এক প্রস্থ অনুলিপি

করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ঐ সকল অধ্যাপকগণের উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে নারায়ণ ঠাকুরের লুপ্ত গ্রন্থগুলির হয়ত সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, নচেৎ উপায়ান্তর আর নাই। ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী "সারাবলী" মুদ্রণের চেষ্টা করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

আধ্যাত্মিক জীবনেও নারায়ণ ঠাকুর বিশেষ উন্নত ছিলেন। বৃদ্ধ-পরম্পরা-শ্রুত তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি দিবারাত্রি পূজা, অর্চ্চনা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন।

নারায়ণ ঠাকুরের পুত্র শান্তিনাথ, কৃষ্ণদেব স্মার্ত্তবাগীশ, রঘুবীর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গঙ্গারাম ন্যায়পঞ্চানন ও রঘুনাথ। ইঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত ও বিদ্বৎ সমাজ-বরণীয় ছিলেন।

এ অঞ্চলের অন্যতর গৌরবস্তম্ভ **কণাদ তর্কবাগীশ** বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, ইনি 'ভাষারত্নের' মঙ্গলাচরণে আপনাকে সিদ্ধান্তমঞ্জরীর গ্রন্থকার জানকীনাথ চূড়ামণির ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

"চূড়ামণিপদাম্ভোজভ্রমরীভূতমৌলিকা
সংক্ষিপ্য শ্রীকণাদেন ভাষারত্নং বিতন্যতে।"

কণাদ তর্কবাগীশ খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হইয়া "মণিব্যাখ্যা" নামে চিন্তামণির টীকা রচনা করেন। ইনি কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত ভট্টাচাযাবংশের আদি পুরুষ। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী জোগ্রাম কুলীনগ্রাম হইতে বংশীধর রায় ইঁহাকে আনয়ন করেন। ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও শক্তি-উপাসক ছিলেন। শবাসনা শ্যামামূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পঞ্চমুণ্ডের আসনে আসীন হইয়া তন্ত্রোক্তমতে দেবীপূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ইনি "মহর্ষিকণাদ" নামে অভিহিত। ইঁহার বংশধরগণের মধ্যে হরদাস তর্কালঙ্কার ও তারকনাথ তর্করত্ন সমধিক বিখ্যাত হন।

রত্নগর্ভ আগমবাগীশ। রাধানগর গ্রাম সিদ্ধ আগমবাগীশের বাসস্থান। রত্নাকরনদীতটে ৺ঘণ্টেশ্বর মহাদেবের নিকট এক তন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী আগমন করেন। আগমবাগীশ মহাশয় তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া বহু বৎসর কঠোর সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করেন। ইনিও মহর্ষি কণাদের ন্যায় তান্ত্রিক ও শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, কোন সময়ে তিনি দেবীপূজার জন্য কারণ-বারি লইয়া

আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার আচরণে হতশ্রদ্ধ হইয়া মন্তপ ব্রাহ্মণজ্ঞানে তাঁহাকে ঘৃণার সহিত তিরস্কার করেন। জিতক্রোধ সিদ্ধ রত্নগর্ভ মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ, আপনি অশান্ত হইবেন না। যাহা দিতেছি, হস্ত প্রসারিত করিয়া গ্রহণ করুন" এই বলিয়া তাঁহার হস্তে দুগ্ধ ঢালিয়া দেন। ব্রাহ্মণ নিশ্চয় জানিতেন যে, পাত্রে সুরা ছিল, তাহার এরূপ রূপান্তরে তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন। আগমবাগীশ প্রান্তরমধ্যে ত্রিকোণ গৃহে কালিকামূর্ত্তি ও পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করেন। উহা রাধানগরের প্রান্তরে এখনও বর্ত্তমান। শুনা যায়, ইঁহার বাক্যমাত্রেই অনেক দুরারোগ্য রোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন। ইনি অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করায় সিদ্ধ আগমবাগীশ নামে প্রসিদ্ধ হন।

১২৬২ সালে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের মধ্যমপুত্র রামতনু রায়ের অশীতিপর বৃদ্ধ পুত্র তারকনাথ রায়ের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন যে, কবিকুলশ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্র যখন সাধনার জন্য শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন বৈষ্ণবগণ শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভারতচন্দ্রের নিকট তথায় গমনেচ্ছা প্রকাশ করাতে ভারত তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইলেন। পরে সকলে একত্র হইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে যাত্রা করিয়া পদব্রজে জিলা হুগলীর অন্তঃপাতি খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া এই স্থানেই যে গুপ্ত-বৃন্দাবন অবস্থিত, তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন। অনুমান ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ভারতচন্দ্র এখানে আগমন করেন এবং কিছু দিন এ প্রদেশে থাকিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করেন।

এ অঞ্চলের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস নিজের স্বল্প জ্ঞানবুদ্ধিমত অযোগ্যভাবে সাঙ্গ করিলাম। অভ্যর্থনা-সমিতির প্রতিনিধির পক্ষে সম্মিলন উন্মোচন সময়ে বাস্তব অবাস্তব এই সকল স্থানীয় তথ্যের আলোচনা করাই পুরাতন রীতি। তদনুযায়ী এবং সম্মিলনের পরিচালকগণের বারংবার অনুমতি অনুসারে এত কথা বলিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইলাম। আশা করি, আপনারা নিজগুণে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু কথা অনেক বাকী রহিয়া গেল। সভাপতি মহাশয় সে সমস্ত কথার বিশদ আলোচনা করিয়া আপনাদের তৃপ্তি সাধন করিবেন আশা করি।

রাধানগরে এই সম্মিলনের আয়োজন অভাবনীয় ব্যাপার। নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যে মনীষিগণকে সভাপতি ও শাখা

সভাপতিরূপে পাইয়াছি তাহাও অভাবনীয়। সাহিত্য, ইতিহাস, গবেষণা ও প্রত্ন-তত্ত্ব ক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয়ের নাম স্বপ্রভায় সমুজ্জ্বল। খানাকুল কৃষ্ণনগরের সহিত তাঁহার নানা সম্বন্ধ। তাঁহাকে সভাপতিপদে বরণ করিয়া আমরা ধন্য। সাহিত্য-শাখার সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় আমাদের অনুরোধে নিতান্ত অসুস্থতা সত্বেও কার্য্যভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া আমাদিগকে চিরঋণী করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের ন্যায় অধ্যবসায়শীল কৃতী প্রত্ন-তাত্ত্বিককে ইতিহাস শাখার সভাপতিরূপে পাইয়া আমরা নিতান্ত উৎসাহিত হইয়াছি। ভক্তপ্রবর দার্শনিক সুকণ্ঠ প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে দর্শন-শাখার সভাপতিত্বে আমি সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহার কৃতিত্বে শুষ্ক কাষ্ঠেও রস-সঞ্চার সম্ভাবনা। ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় উদ্যমশীল সরলপ্রাণ একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদের পরম আপ্যায়িত করিয়াছেন।

প্রচলিত নিয়মানুসারে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আমি ইঁহাদের সভাপতি ও শাখা-সভাপতিপদে বরণ করিতেছি এবং সমাগত প্রতিনিধিবর্গ ও সুধীবৃন্দের অনুমোদন সহকারে ইঁহাদিগকে মাল্যদান করিতেছি। আপনারা সকলে প্রীতিজ্ঞাপন করুন এবং যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন শাখার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় তাহার সহায়তা করুন। সম্মিলনের কার্য্য আপনাদিগের সাহায্য, আশীর্ব্বাদ ও সহানুভূতিতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হউক, শ্রীভগবানের নিকট করজোড়ে ইহাই ভিক্ষা। আপনারা স্বস্তিবাচন করুন যাহাতে রাধানগর সাহিত্য-সম্মিলন সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। এতদিন রাজধানী বা সহর নগরেই আপনারা সকল সুবিধার মধ্যে সম্মিলনের অধিবেশন করিয়া আসিয়াছেন। এবার একটু মুখ বদলাইয়া লউন। এখানে যান-বাহন, আবাস আহার ও পানীয়ের অভাব, গীতবাদ্য আমোদেরও তেমনি দৈন্য। আপনাদিগের প্রীত্যর্থে আমরা কোন আয়োজন করিতে পারি নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে কিঞ্চিৎ লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ভয় পাইবেন না। এ ঔষধি শরীরের জন্য নহে। আপনাদের কিছু নেত্রসুখ উৎপাদনই ইহার উদ্দেশ্য। মোগল পাঠান রাজপুতের সংঘর্ষকালে একদিন এখানকার অধিবাসিগণ বীর বলিয়া খ্যাত ছিল। বুঝিবা তাহারই ফলে ৺সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধি-কারী-পরিকল্পিত ও স্থাপিত বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোর, বেঙ্গলী ডবল কোম্পানী,

বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট, ইউনিভারসিটি কোর ও টেরিটোরিয়াল কোরের ব্যবস্থা উত্তরকালে হইয়াছিল। এ প্রদেশের লাঠিখেলা দেশপ্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ম্যালেরিয়া বন্যা অন্নাভাব ও পুলিশ পীড়নে তাহা অন্তর্হিতপ্রায়। সভার কার্য্য-শেষে সেই লাঠি খেলার কিছু অবশিষ্ট নিদর্শন আপনাদিগকে দেখাইবার ইচ্ছা আছে। পূর্ব্ব গৌরবের কঙ্কালমাত্র দেখিয়া যাহা ছিল অনুমান করিয়া লইবেন।

বাঙ্গালার বিভিন্ন সুন্দর পল্লীতে প্রতি বৎসরে এইরূপ সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা হইলে সমগ্র দেশের চিন্তাস্রোত হয়ত আবার নূতন ভাবে বহিবে এবং বুঝি পল্লীসমাজও আবার পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া পাইবে। এই সুযোগে যদি পল্লী-মাতাকে চিনিবার উপায় হয়, পূর্ব্বপুরুষদিগের পদরজপূত বাস্তুভিটা আঙ্গিনাদির জীর্ণ সংস্কারের ইচ্ছা মনে জাগে ও দেশের দিকে দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলেই রাধা-নগর সম্মিলনের কার্য্য চরম সফলতা লাভ করিবে। এই নবপ্রদর্শিত পন্থায় কাশীরাম, কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কন, মধুসূদন প্রভৃতি মহাজনগণের জন্মস্থানে যদি এতাদৃশ ব্যবস্থার সঙ্কল্প হয়, তাহা হইলেও রাধানগর সাহিত্য-সম্মিলন সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও ধন্য হইবে। ভগবান্ করুন, সাহিত্যিক, সাহিত্যসেবী ও সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি এই নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সাহিত্য-রসের নূতন তরঙ্গ বহাইয়া জাতির, সমাজের, দেশের ও ধর্ম্মের আনুকূল্য করুন। এ মহাকার্য্যে শ্রীভগবান্ সহায় হউন।

যদি রামমোহনের পুণ্যস্মৃতির সম্মান উপলক্ষে ও আপনাদের শুভাগমনে গ্রামের ও প্রদেশের অভিশাপমোচন হয়, তবে খানাকুল কৃষ্ণনগর ও রাধানগর হয়ত আবার পূর্ব্বগৌরবের অধিকারী হইলেও হইতে পারে। আমরা ক্রমশঃ গ্রামে ধীরে ধীরে লাইব্রেরী স্থাপন করিতেছি, পল্লী-সমিতি গঠন করিতেছি, ম্যালেরিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আপনাদের পুণ্যবলে ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের কৃপায় তাঁহাদের প্রদত্ত টিউব-ওয়েলে আজ শুষ্ক নদীগর্ভ হইতে জল উঠিয়া স্বর্গগঙ্গার সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সেবার সুবিধা করিয়াছে। ভগবান্ করুন মরুভূমিতে যখন আপনাদের পুণ্যফলে এই অঘটন সংঘটন হইয়াছে, এ স্রোত যেন শুকাইয়া না যায়।

রামমোহনের সুযোগ্য প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় ও তাঁহার পৌত্রবধূ শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবী আমাদের কার্য্যে বড় সহায়তা করিয়াছেন। এখন-

জল-হাওয়া ফিরিয়াছে। এমন দিন ছিল যখন রামমোহনের বংশধরগণ ও তাঁহার গ্রামবাসিগণ রামমোহনের নামমাত্রও করিতেন না।

রামমোহন-স্মৃতির প্রতি তাচ্ছিল্য-মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তেরও শেষ হইতে বোধ হয় আর বেশী বাকী নাই। এই যজ্ঞের হোতা আপনারা; আমাদের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া দিয়া যান। রামমোহনের নাম করিয়া এ প্রদেশের গৌরবধ্বজা আবার গরিমাভরে উড্ডীন হউক।

সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয়ের সম্বোধন

খানাকুল-কৃষ্ণনগর

সমবেত মহোদয়গণ! আপনারা এবার খানাকুল কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান করিয়া বড়ই ভাল কাজ করিয়াছেন। এতদিন সম্মিলন বড় বড় নগরেই হইয়াছে। মাত্র আর বৎসর উহা নগর হইতে নামিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামই বাঙ্লার প্রাণ। গ্রামে যেটা জাগ্‌বে, সেটাই টিক্‌বে। নগর ইংরাজের কীর্ত্তি। টিকিবে কি না আজিও বুঝা যাইতেছে না। তাই সাহিত্য-সম্মিলন, নগর হইতে গ্রামে নামায় ভরসা হইতেছে যে, সম্মিলনটা টিকিবে ও একটা জাতীয় উৎসবের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার পর, আর বৎসর বঙ্কিমের স্মৃতি লইয়া সম্মিলন হইয়াছিল; এবার মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি লইয়া হইতেছে। আর বারে যেখানে হইয়াছিল, সে একটা বড় ব্রাহ্মণের সমাজ, কিন্তু বড় বেশী পুরাণ নয়—২০০।২৫০ বৎসরের বেশী হইবে না। কিন্তু এবার যেখানে হইতেছে, সেটা রাঢ়দেশের একটা খুব পুরাণ জায়গা। এই-রূপে পাড়াগাঁয়ে বড়লোকের নাম রক্ষার জন্য সম্মিলন যত অধিক হয়, ততই দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা বেশী।

আপনারা এ সম্মিলনে আমাকে কর্ত্তা করিয়াছেন তাহার জন্য আমি আপনাদের নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া আমার একটা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে হইয়াছে এবং সে জন্য আমার একটা কৈফিয়ৎ

পঞ্চদশ অধিবেশনের সভাপতি
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

দেওয়া দরকার হইতেছে। একই লোককে বার বার সভাপতি করাটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। সাধ্যমত সাহিত্যচর্চ্চা এখন অনেকেই করিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই এক একবার সভাপতি হইবার অধিকার আছে। তাঁহাদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা একেবারেই উচিত নয়। দেশে যোগ্য ব্যক্তির অভাবও নাই। বাঙ্‌লা সাহিত্য শিশু সাহিত্যও নয় যে, উহা এক মা বাপের কোলে বিশ বৎসর থাকিবে। এরূপ স্থানে প্রতিবৎসর নূতন নূতন সভাপতি করাই উচিত। কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একথা আমি বার বার বলিয়া আসিয়াছি, এবং নিজেও দ্বিতীয়বার স্বীকার করি নাই— এবং করিবার ইচ্ছাও ছিল না।

কিন্তু এবার আমি খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। কারণ, খানাকুল কৃষ্ণনগরটী অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজ, অতি প্রাচীন কায়স্থ সমাজ, ও অতি প্রাচীন বৈষ্ণব সমাজ। ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন—খানাকুল কৃষ্ণনগর নবদ্বীপের ছোট ভাই। এ বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে। কিন্তু সে কথা এখন বলিতেছি না। নানা কারণে আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ আমার পূর্ব্বপুরুষ নৈহাটীর ভট্টাচার্য্যদের সঙ্গে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সম্পর্ক অতি মিষ্ট ও অতি ঘনিষ্ঠ। বর্গীর হাঙ্গামায় যখন গঙ্গার পশ্চিম পারের সমস্ত দেশ লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়, তখন হইতেই কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত-সমাজ অনেকটা ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেই সময়েই আমার পূর্ব্বপুরুষেরা নৈহাটীতে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের টোল খুলেন। একশত বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলের নৈয়ায়িকেরা আমাদের বাড়ী পাঠ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অনেকেই নৈহাটীতে পাঠসমাপ্ত করিয়া তথা হইতে উপাধি লইয়া গিয়াছেন। বেশী দূর যাইতে হইবে না, এখানকার প্রবীণ নৈয়ায়িক কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় আমার ন ঠাকুরদাদার পড়ুয়া ছিলেন। ন ঠাকুরদাদা মৃত্যুকালে তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তুমি আমার ভাইপো রামকমল ন্যায়রত্নের নিকট পাঠ স্বীকার করিও। কিন্তু কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তাহা করেন নাই। অন্য কোথাও পাঠ স্বীকার করেন নাই। এখানে আসিয়া টোল করেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা বারাণসী দাদা, রামকমল ন্যায়রত্নের নিকট পাঠস্বীকার করেন এবং অনেকদিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। বাবার এক প্রধান ছাত্র সত্যব্রত। সত্যব্রতের বাড়ী খানাকুল। বাবা বলেছিলেন সত্যব্রতের মত ছাত্র পাওয়া কঠিন। আমার মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিতেন কমলের:

বড় ভাগ্য যে, সত্যব্রতের মত ছাত্র পাইয়াছে। ক্ষীরপাই রাধানগরের শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় আমার বাবার পড়ো ছিলেন। তিনিও আপন দেশে খুব পসার প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন। সে সব পড়ুয়া আর কেহই নাই। তাঁহার পুত্রেরাও অনেকে গত হইয়াছেন। তাঁহার পৌত্রেরা আমাকে চিনিবেন কি না জানি না। তবু তাঁহাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিবার লোভ আমি সামলাইতে পারি নাই। লোভ না সামলাইবার আর দুইটি কারণ আছে। বর্গীর হাঙ্গামার কিছুদিন পরেই দেশগুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পূর্ব্বদেশ হইতে আসিয়া চাতরায় বাস করেন। তাঁহারা শাক্ত, তান্ত্রিক ও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের গুরু। চাতরার দেশগুরু বংশের আদিপুরুষদের সঙ্গে অনেক বিচারের পর আমার প্রপিতামহের এই সর্ত্তে রফা হয় যে, তাঁহারা আমাদের বাড়ী পড়িবেন আর আমরা তাঁহাদের কাছে মন্ত্র লইব। ইহার পূর্ব্বে আমরা ঘরে ঘরেই মন্ত্র লইতাম। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই দেশগুরুদের আদিপুরুষ শ্যাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌহিত্র ছিলেন। উভয়েই সুরাই মেলের লোক। সুতরাং রামমোহন রায়ের সহিতও আমাদের বেশ জানাশুনা ছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যখন কলিকাতায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর অগ্রগণ্য, সেই সময় আমার ন ঠাকুরদাদার এক ছাত্র আসিয়া তাঁহার সহিত জোটেন। ইঁহার নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বা গুড়্‌গুড়ে ভট্টাচার্য্য। ন ঠাকুরদা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যকে পালন করেন। কিছুদিন রামমোহন রায়ের সঙ্গে থাকিয়া অনেক বিষয়েই তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তিনি উঁহাকে ত্যাগ করেন ও ব্রহ্মসভার বিরোধী যে ধর্ম্মসভা ছিল তাহাতেই উপস্থিত হন ও তাহার কর্ত্তা নন্দলাল ঠাকুরের দক্ষিণহস্ত হইয়া উঠেন। গৌরীশঙ্কর বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের নাম আপনাদের অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। তিনি 'সম্বাদ-ভাস্কর', 'রসরাজ' প্রভৃতি বঙ্গলা কাগজের সম্পাদক হইয়া খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। গৌরীশঙ্করের গুরুভক্তির বিশেষ অভাব ছিল না। আমাদের বাড়ীর কেহ কখনও কলিকাতায় আসিলে তিনি মহা সমারোহে তাঁহাকে কলিকাতার বাড়ীতে লইয়া যাইতেন ও বৎসর বৎসর ৺পূজার সময় আমার ন ঠাকুরমাকে ৺পূজার প্রণামীর টাকা ও কাপড় পাঠাইয়া দিতেন।

১৮৫৮ সালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্ত্রীর পরলোক হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ৺ রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় তখন হাইকোর্টের প্রধান উকীল। তাঁহার বাৎসরিক আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল। তিনি শাস্ত্রানুসারে

মাতৃশ্রাদ্ধ করিবার জন্য উদ্‌যোগ করেন, কিন্তু দেশের কেহই রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে অধ্যক্ষতা করিতে রাজী হন নাই। এদেশের সকলেই আমাদের বাড়ীর ছাত্র, সুতরাং বাবার উপর খুব পীড়াপীড়ি হয় আপনি অধ্যক্ষতা করুন। বাবা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। রমাপ্রসাদ রায় তখন আমার বড় ভাই নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চুকে ধরিয়া বসিলেন। দাদার বয়স তখন ২৩।২৪ মাত্র। তিনি অধ্যক্ষতা করিতে স্বীকার করিলেন। লক্ষ টাকার বেশী খরচ হইল। নৈহাটীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা অধ্যক্ষতা করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাদের ছাত্রেরা কেহই না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। দাদার কথামত রায় মহাশয় তাঁহাদের যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিলেন। ১১৪ জন অভিজাত ব্রাহ্মণ ভিন্ন সমাজের ব্রাহ্মণেরাও ভোজন করিয়া গেলেন। সুতরাং রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় পুত্র হিন্দু সমাজে আপনার স্থান পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন।

এই সকল কারণে আমি খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারি নাই। যদি বিশেষ দোষ হইয়া থাকে, আপনারা ক্ষমা করিবেন।

অনেকে মনে করেন, বক্তিয়ার খিলিজি যখন নবদ্বীপ ও গৌড় দখল করিয়া ফেলিলেন, তখন বুঝি সমস্ত বাঙ্গালাটাই তাঁহার দখল হইয়া গেল। কিন্তু সে কথা একেবারেই সত্য নয়। বাঙ্গালার বড় রাজা লক্ষ্মণসেন পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সামন্ত রাজারা কেহই বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দান করেন নাই। সমস্ত রাঢ়দেশ এখন যেমন ইংরেজের হইয়াছে, মুসলমানদের এইরূপ কখনও হইয়াছিল কি না সন্দেহ। দেশময় অনেক ছোট ছোট রাজা ছিলেন, তাঁহাদের কেল্লা ছিল, সৈন্য ছিল, রাজধানী ছিল। তাঁহারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। মুসলমানেরা অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলে কিছু কর দিয়া তাঁহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইতেন। রাঢ় দেশের খানিকটা এখনও ময়ূরভঞ্জের রাজার আছে। বিষ্ণুপুর বরাবরই স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছেন। বীরভূমে যদিও ব্রাহ্মণ রাজাকে মারিয়া একজন মুসলমান রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও রাজাই হইয়াছিলেন; মুরসিদাবাদের নবাবের অধীন হন্ নাই। বর্গীর হাঙ্গামার কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতচন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্র রায় ভুরস্থটে রাজত্ব করিতেন।

রাঢ় দেশ মুসলমানের অধীন না হওয়ার আর একটা বিশেষ কারণ ছিল। উড়িষ্যার রাজারা খুব প্রবল ছিলেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে সমস্ত রাঢ় দেশ দখল করিয়া লইতেন। অনেক সময় গঙ্গা, রাঢ়াবরেন্দ্রগবনীনয়নাশ্রুতে কাল

হইয়া যাইতেন। রাঢ় দেশে মুসলমানদের অপেক্ষা উড়িয়াদের প্রাধান্য বেশী ছিল। মেদিনীপুর নগরটী যিনি স্থাপন করেন তিনি একজন উড়িয়া রাজার গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার নাম মেদিনীকর। তিনি আপনার নামে ঐ নগর স্থাপন করেন এবং তিনি 'মেদিনী কোষ' নামে একখানি অভিধান রচনা করেন। ঐ অভিধান খানি সংস্কৃতে, প্রায় অমরকোষের সমান। উড়িষ্যার রাজা ও রাজপুরুষেরা রাঢ়দেশে অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। গিয়াস্‌-উদ্দীন বল্‌বনের সময় কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা এমন কি কাশী পর্য্যন্ত বড় বড় তীর্থ লোপ হইয়াছিল। প্রায় দুই শত বৎসর এই সমস্ত তীর্থ লুপ্ত ছিল। তাহার পর সেগুলিকে উদ্ধার করিতে আরও এক শত বৎসর লাগে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গালীরা বিশেষ রাঢ় দেশের লোকে এক মাত্র জগন্নাথকেই আপনাদের তীর্থস্থান বলিয়া মনে করিত। জগন্নাথ উড়িষ্যা দেশে। সেখানে তখনও মুসলমান যাইতে পারে নাই। সুতরাং সেই তীর্থ একেবারেই লোপ পায় নাই। জগন্নাথ যাইতে হইলে, বাঙ্গালীকে কুলীনগাঁয়ের বোসেদের বাড়ী গিয়া ডুরি লইতে হইত। সেই ডুরি হাতে বাঁধিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে জগন্নাথের পথে যাতায়াত করিত। ডুরি যেন পাসপোর্ট ছিল। রাস্তায় নারায়ণগড়ের কেল্লা পড়িত। কেল্লার উত্তর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতে হইত। ডুরি দেখিলে নারায়ণগরের রাজা কিছু বলিতেন না। সঙ্গে করিয়া জগন্নাথ-ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার জন্য একটা ব্যবসায়ই ছিল। ব্যবসাদারদিগকে সেথো বলিত—যে হেতু তাহারা যাত্রীদিগকে সাথে করিয়া লইয়া যাইত। আমাদের বঙ্গদেশের স্মৃতিতে অন্য তীর্থের কথা বড় নাই, কেবল পুরুষোত্তম তীর্থ। রঘুনন্দনের ২৮ তত্ত্বের পুরুষোত্তম-তত্ত্ব একটা। অনেক বড় বড় বাঙ্গালী পুরুষোত্তমে যাইয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম সর্ব্বপ্রধান। এই বাসুদেব সার্ব্বভৌমই সর্ব্বপ্রথম মিথিলায় গিয়া ন্যায়-শাস্ত্র পড়িয়া আসেন। শুনিয়াছি কণাদ তর্কবাগীশ ও রঘুনাথ শিরোমণি এই দুই জনই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। কণাদ তর্কবাগীশ বয়সে বড়, শিরোমণি ঠাকুর বয়সে ছোট। কণাদ তর্কবাগীশই শিরোমণিকে মিথিলায় যাইতে পরামর্শ দেন। এবং সেই পরামর্শ মত শিরোমণি মিথিলায় যাইয়া খুব প্রতিপত্তি লাভ করেন ও ফিরিয়া আসিয়া নব্য-ন্যায়ের এক সম্প্রদায়ই চালাইয়া যান্‌। কণাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাড়ী খানাকুল; তিনি শিরোমণির পূর্ব্বে ন্যায়-শাস্ত্রের মূল অর্থাৎ 'তত্ত্বচিন্তামণির' এক টীকা লেখেন। সেই টীকার

কিছু আমি বারাসতের নিকট ব্রাহ্মণগ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। লেখা বেশ গাঢ় এবং মূলকে বিশদ করিবার বেশ চেষ্টা হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, বিদ্যানিধি মহাশয় যে খানাকুলকে নবদ্বীপের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া গিয়াছেন, সেটা যেন ঠিক না হইতেও পারে। তবে শিরোমণির প্রতিভায় কণাদ অনেকটা চাপা পড়িয়াছেন। শিরোমণির প্রতিভা যেমন ছিল, উদ্যমও তেমন ছিল। তিনি ত মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের কাছে পড়িয়াই ছিলেন এবং সেখানে পাঠ সমাপ্ত করিয়া উপাধিও পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই। সেই সময় গোদাবরী নদীর তীরে পাইঠানা নগরে রামেশ্বর নামে একজন বড় পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন। তিনি মহালক্ষ্মী মন্দির দর্শন করিতে কোহ্লাপুর যান। তথা হইতে বিদ্যানগরে উপস্থিত হন্ এবং তথায় প্রভূত সম্মান লাভ করেন। বিদ্যানগরের রাজারা তখন হিন্দুদের মধ্যে রাজরাজেশ্বর। কিন্তু রাজা কৃষ্ণরায় তাঁহাকে মহাদান দিবার চেষ্টা করায় তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিয়া দ্বারকায় যান্। এবং সেখানে ৮ বৎসর টোল করিয়া পড়ান। আমাদের শিরোমণি ঠাকুর ততদূর যাওয়া করিয়া রামেশ্বরের কাছে অনেক দিন পাঠ করেন। একথা রামেশ্বরের পৌত্র শঙ্করভট্ট 'গাধিবংশানুচরিত' নামক আপনাদের বংশ-পরিচয়ে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। সুতরাং শিরোমণির মত প্রতিভাবান্ ও উদ্যমশীল পণ্ডিতের প্রতিভার কাছে কণাদ যে একটু ম্লান হইবেন, তাহার খুবই সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কণাদও বড় ছোটখাট লোক ছিলেন না। সব দেশের নৈয়ায়িকেরা নবদ্বীপে পাঠ সমাপন করিতে আসেন; কিন্তু কণাদের বংশে বা সম্প্রদায়ে সেটা বড় একটা ছিল না। শেষাবস্থায় তাঁহারা আমাদের বাড়ী গিয়া পাঠ সমাধা করিতেন, তথাপি নবদ্বীপে যাইতেন না। কণাদ তর্কবাগীশের পুরা টীকাটা পাওয়া গেলে বড় ভাল হয়। কারণ সেটা শিরোমণির আগেকার পুথি। শিরোমণির পূর্ব্বে আমাদের দেশে ন্যায় শাস্ত্রের কিরূপ অবস্থা ছিল, কণাদের টীকাই তাহা জানিবার একমাত্র উপায়।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় কণাদের বংশীয় অনেকের পরিচয় দিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলিবার দরকার নাই। কণাদ তর্কবাগীশ যে সময়ের লোক, তখন বাঙ্গালার অবস্থা অতি ভীষণ, দ্বিতীয় ইলিয়াস্ সাহী বংশ তখন মৃতপ্রায়। গৌড়ে কখন খোজা, কখনও হাবশী রাজারাই সুলতান হইয়া বসেন। সে সকল কথা ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস পড়িলে হাস্য সংবরণ করা

যায় না। শুনিয়াছি একজন খোজা রাজা নাকি আড়াই মণ করিয়া পোলাও খাইতেন এবং চওড়া পাড়ের শাড়ী পরিয়া অন্দর মহলে নাচিতেন। তাঁহাদের সময় উড়িষ্যার রাজা গজপতি পুরুষোত্তমদেব গঙ্গার পশ্চিম তীর প্রায় সব দখল করিয়া লইয়াছিলেন। রাঢ় দেশে মুসলমান রাজত্ব এক প্রকার লোপই হইয়া গিয়াছিল। এই পশ্চিম বাঙ্গালাটাকে কতক পরিমাণে দখল করেন হোসেন সা। আবার ঠিক এই সময়েই সাতগাঁয়ের মালিক মুসলমানদিগকে বিদায় দিয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই সাতগাঁয়ের রাজত্ব দখল করেন। সাতগাঁয়ের রাজত্ব তখন যশোহরের ভৈরব নদী হইতে প্রায় রূপনারায়ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাঁহাদের রাজধানী ছিল সাতগাঁ। সুতরাং এই সময়টা হিন্দুদের পক্ষে এক রকম মাহেন্দ্রযোগ ছিল। সর্ব্বত্রই হিন্দুদের প্রাদুর্ভাব হইতেছিল। হিরণ্য গোবর্দ্ধনের যিনি গুরু ছিলেন, চৈতন্যদেব দ্বিতীয় পক্ষে তাঁহারই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার ঠিক এই সময়েই দেবীবর রাঢ়ি শ্রেণীর সমস্ত কুলীন ব্রাহ্মণকে একত্র করিয়া কালনার নিকট আয়েদা গ্রামে তাঁহার গুরু শুভাকরের বাড়ীতে এক প্রকাণ্ড সভা করিয়া কুলীনদের মেল্ বন্ধন করিয়া দেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরের সমাজের উৎপত্তি এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্ব্বে হওয়াই সম্ভব। অনেকের সংস্কার যে, এখানকার সর্ব্বাধিকারীরা নবাব সরকারের সর্ব্বাধিকারী ছিলেন। কিন্তু সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিতেন তাঁহারা উড়িষ্যার রাজাদের সর্ব্বাধিকারী ছিলেন। উড়িষ্যার রাজার দেওয়া রঘুনাথপুর তালুক এখনও তাঁহারা ভোগ করেন, এবং তাঁহাদের জগন্নাথের মন্দিরে তাঞ্জাম চড়িয়া যাইবার অধিকার আছে। এ সকল কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু কথা হইতেছে, তাঁহারা কোন্ রাজার সময়ে সর্ব্বাধিকারী ছিলেন। ১৫৬৭ সালে কালাপাহাড় উড়িষ্যা দখল করেন। তাহার পর উড়িষ্যায় মোগল পাঠানের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শেষ হইলে বাদশা আকবর উড়িষ্যার রাজাকে চারিটী মাত্র পরগণা ও জগন্নাথের মন্দিরের ভার দেন। সুতরাং সে সময়ে ইঁহারা যদি উড়িষ্যার রাজার সর্ব্বাধিকারী হইতেন, সেটা বড় বেশী কিছু মান্যের কথা ছিল না, তাহার পূর্ব্বে কোনও সময়েই তাঁহারা উড়িষ্যা রাজার সর্ব্বাধিকারী হইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজ নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাই যে, খানাকুল-কৃষ্ণনগর গ্রাম পত্তন হইবার পূর্ব্বে নিকটেই ধামাল নামে এক গণ্ডগ্রাম ছিল। একথাটা কানে খুব বাজিল। ধামাল মানে ধর্ম্ম ঠাকুরের

একটা স্থান। যেখানেই গ্রামের নাম ধাম-ওয়ালা সেইখানেই বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্ম ঠাকুরের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক আছে অর্থাৎ ইহা বৌদ্ধদিগের এককালে একটা বাসস্থান ছিল। ধর্ম্মঠাকুরের উৎপত্তি অনেকে বলেন এগার শতকে হইয়াছিল। কিন্তু আমরা এখন নেপাল হইতে আনা বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে সেই সময়কার বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধদের যেরূপ অবস্থা দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম সে সময় খুব প্রবল ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ধর্ম্মঠাকুররূপে পরিণত হয় নাই। সেই পরিণামটা আরও দুই তিন শত বৎসর পরে হইয়াছিল। 'শূন্য-পুরাণে'র ভূমিকায় নগেন্দ্র বাবু বলিতেছেন যে, ঐ পুরাণের ভাষা ও ভাব দেখিয়া মনে হয়, যখন রাঢ়দেশে উড়িয়াদের প্রভাব খুব বেশী, সেই সময় এই সমস্ত বহির প্রচার হয়। তাহা হইলে খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজ আরও পুরাণো হইবে। কত পুরাণো বলিতে পারা যায় না।

ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। এখনও অনেকের ধারণা যে, ধর্ম্মঠাকুরের উৎপত্তি এগার শতকে হইয়াছিল। সেটা যে হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি নামে এক প্রাচীন পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দিক্‌ডাক নামে বাঙ্গালা ও নিকটবর্ত্তী দেশের ভূগোলের কিছু পরিচয় আছে। তাহাতে কতক-গুলি স্বাধীন রাজ্যের নাম আছে, যথা সোয়ালক্ষ উড়িষ্যা, বত্রিশলক্ষ গৌড়, তেত্রিশলক্ষ কল্লরী, নবলক্ষ বঙ্গ, চৌদ্দলক্ষ সুবঙ্গ, জাঙ্গিকারা, পাটলী, রঙ্গপুর, গোরক্ষপুর প্রভৃতি। ইহাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কারণ এই যে, উহার সঙ্গে উহার রাজস্বের পরিমাণ দেওয়া আছে। যেমন সোয়ালক্ষ উড়িষ্যা, নবলক্ষ বঙ্গ ইত্যাদি। এখন দেখিতে হইবে কোন্ সময় এই দেশগুলি স্বাধীন ছিল। গৌড় ত মুসলমানের হইয়াছিল, উহার রাজস্ব ছিল বত্রিশলক্ষ, বঙ্গের নয়লক্ষ, কল্লরীর তেত্রিশলক্ষ, সুবঙ্গের চৌদ্দলক্ষ ছিল। এখন দেখিতে হইবে, কোন সময়ে এই দেশগুলির স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। উড়িষ্যা ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। বঙ্গ মোটামুটি ১৩২০ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। সুবঙ্গ বা শ্রীহট্ট ১৩৫০ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল, তাহার পরেও টুকি টুকি করিয়া অধীন হয়। গৌড় ১২০০ সালে মুসলমানের হস্তগত হয়। কল্লরী দুইভাগ হইয়া যায়। একভাগ চৌদ্দশতকে রেওয়ার সামিল হইয়া যায়। আর এক ভাগ মহারাট্টরা দখল করে, সে অনেক পরে। তাই দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হয় যে, এই ভূগোলের ব্যাপার ১২০০ হইতে ১৩০০ সালের মধ্যে লেখা হয়। ধর্ম্মঠাকুরের উৎপত্তি

সেইখান হইতে। ব্রাহ্মণদের প্রভাব রাঢ়ে যত বাড়িতে লাগিল, ধর্ম্মঠাকুর ক্রমেই সরিয়া যাইতে লাগিলেন। সেইরূপ এক ধর্ম্মঠাকুরের আস্তানা ভাঙ্গিয়া খানাকুল গ্রামের উৎপত্তি হইয়াছে। খানাকুলের লোকেও জানেন যে, ধামলা হইতেই খানাকুলের উৎপত্তি।

খানাকুলের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অভিরাম গোপালের নাম শুনিতে পাই। তিনি ত ১৩১৬ শকে আবিভূত হন্, সুতরাং চৈতন্যদেবের অনেক পূর্ব্বে, নবদ্বীপের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠতার অনেক পূর্ব্বে। অভিরাম গোস্বামীর জীবনের সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডিদাসের জীবনের অনেক স্থানে মিল আছে। চণ্ডিদাসের যেমন রামি, অভিরাম গোস্বামীর তেমন মালিনী। রামি ধোবানী ছিল, মালিনী কাবাড়ির বাড়ীতে থাকিত। অভিরামেরও জাতি যায়, চণ্ডিদাসেরও জাতি যায়। মালিনীর সিদ্ধি প্রভাবে অভিরামের জাতি রক্ষা হয়, রামিরও সিদ্ধি প্রভাবে চণ্ডিদাসের জাতি রক্ষা হয়। আমার বোধ হয়, চৈতন্যের পূর্ব্বে বৈষ্ণবদের মধ্যে সহজিয়া ভাবটা ঢুকিয়াছিল। জয়দেবও সহজিয়া ভাবের, বড়ু চণ্ডিদাসও সহজিয়া ভাবের। চৈতন্যের পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্ম এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। পরে ঐ পন্থের বৈষ্ণবেরা চৈতন্যধর্ম্মে মিশিয়া যায়, এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই ধর্ম্মের দুই দল হয়, গোস্বামী মতের বৈষ্ণব ও সহজিয়া মতের বৈষ্ণব। অভিরাম ঠাকুর সহজিয়া মতেরই বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার জীবন চরিত সম্বন্ধে একখানা বহি ছাপা হইয়াছে, নাম 'অভিরাম লীলামৃত'। তিনি অনেক দিন বাঁচিয়া ছিলেন। এবং চৈতন্য ও নিত্যানন্দের সঙ্গে অনেকবার মিলিয়াছিলেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের আর একজন প্রধান লোক নারায়ণ ঠাকুর। তাঁহার 'শুদ্ধিকারিকা' অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এখনও মুখস্থ আছে। সেকালে ত ছাপা ছিল না, পুঁথি চুরির বেশ সুবিধা ছিল। হরিনারায়ণ শর্ম্মা নামে একজন প্রধান পণ্ডিত নারায়ণ বাঁড়ুয্যের নামের একখানা পুঁথি নিজ নামে চালাইয়া গিয়াছেন। রামভদ্র সার্ব্বভৌমও তাহাই করিয়াছেন। বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের আর এক পুস্তকের নাম 'স্মৃতিসর্ব্বস্ব'। অনেকের ধারণা স্মৃতিসর্ব্বস্ব রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের সংক্ষেপ। কিন্তু আমার বোধ হয় কথাটা ঠিক নয়। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, বাঁড়ুয্যে ঠাকুর কণাদের শিষ্য। তাহা হইলে তিনি ত রঘুনন্দনের তুল্যকাল হইলেন। রঘুনন্দন তাঁহার 'জ্যোতিষতত্ত্ব' ১৫৬৭ সালে লিখিয়াছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহারই তুল্যকাল কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা প্রাচীন। রঘুনাথের এক ছাত্র ছিলেন মহেশ পণ্ডিত। উভয়েই ন্যায়শাস্ত্রের মূলের টীকা করেন। মহেশ

পণ্ডিতের লেখা শিরোমণির শিরোনামে একখানি পত্র আমি এসিয়াটিক সোসাই-টীর 'বিবস্বৎ-সংহিতার' মধ্যে পাইয়াছিলাম। পুথিখানি ১৫২৯ সম্বতের তৈয়ারি। কবেকার হাতের লেখা জানি না। এই শিরোমণিকে মিথিলায় পাঠাইবার কর্ত্তা হইলেন কণাদ। সুতরাং তিনি শিরোমণি অপেক্ষাও প্রাচীন। তাঁহার ছাত্র রঘুনন্দনের সঙ্গে বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের তুল্যকাল হওয়াই সম্ভব, পরে হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং 'স্মৃতিসর্ব্বস্ব' রঘুনন্দনের সংক্ষেপ নহে, তাঁহারই তুল্যকালের কোন লোকের লেখা। বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের জন্মবৃত্তান্ত, পড়াশুনা, খানাকুলে আসা, এ সমস্ত কথা বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন যে, স্মৃতিসর্ব্বস্ব বহিখানির উল্লেখ এসিয়াটিক সোসাইটীর তালিকায় আছে। উহার ১৬০৩ শকের এক প্রতিলিপিও গবর্ণমেণ্ট সংগ্রহ করিয়াছেন। ৯৫৫ সালে উহা সঙ্কলিত হয়। বাস্তবিক সেখানি এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথি নয়, উহা ইণ্ডিয়া আফিসের পুথি। তাহাতে যে অংশটুকু উদ্ধৃত আছে তাহার অর্থ এই যে, ক্ষয়নামক বৎসর ১৬০৩ শকে হইতে, ও ৯৫৫ শকে হইয়া গিয়াছে। উহা প্রতিলিপি বা সঙ্কলনের কাল নহে।

১৬০৩ শক হইলে উহা খৃষ্টের ১৬৮১ হইবে, ৯৫৫ শক হইলে উহা খৃষ্টের ১০৪৩ হইবে। নারায়ণ বাঁড়ুয্যে মহাশয় জানিতেন, এই দুটী বৎসর ক্ষয় সংবৎসর। লোকের ধারণা, বাঁড়ুয্যে ঠাকুর যখন রঘুনন্দনের সংক্ষেপ করিয়াছেন, তখন উনি রঘুনন্দনের ১০০।১৫০ বৎসর পরের লোক। উনি যখন ১৬৮১ সালকে ভবিষ্যৎ কাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তখন সে কথাটা বেশ খাটিল বলিয়া বোধ হয় না।

বাঁড়ুয্যে ঠাকুর যে রঘুনন্দনের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী সে বিষয়ে আর একটী বিশেষ প্রমাণ আছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অনেক পুথি নকল করা হয়। ১৮৩৬ সালে ঐ কলেজ উঠিয়া গেলে ঐ পুথিগুলি এসিয়াটিক সোসাইটিতে দেওয়া হয়। ঐ সকল পুথির মধ্যে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনখানি পুথির নকল আছে—স্মৃতিসংগ্রহ, সাত্ত্বিকতত্ত্ব ও স্মৃতিসার। শেষ পুথিখানির প্রথমেই লেখা আছে উহা বংশীরায়ের সভায় লেখা হয়। বংশীরায় যাদবেন্দ্ররায়ের উত্তরাধিকারী। তাহা হইলে ১৫০০ হইতে ১৫৫০ পর্য্যন্ত অথবা উহারই কাছাকাছি কোনও সময়ে তিনি সমাজের কর্ত্তা ছিলেন এবং বাঁড়ুয্যে ঠাকুর তাঁহার সভায় বসিয়াই স্মার্ত্তদিগের জন্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

যখন অভিরাম গোস্বামী চৈতন্যের তুলকাল অথচ তাঁহা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়; যখন কণাদ তর্কবাগীশ শিরোমণির তুল্যকাল অথচ তাঁহা অপেক্ষা

বয়সে অনেক বড় এবং বাঁড়ুযো ঠাকুরও রঘুনন্দনের তুল্যকাল অথচ তাঁহা অপেক্ষা বয়সে বড়; তখন আমরা খানাকুলকে নবদ্বীপের ছোট ভাই বলিব কেমন করিয়া? 'বড়' নিতান্ত বলিতে না দাও, পিঠাপিঠি বলিব। খামাল ভাঙ্গিয়া খানাকুলের উৎপত্তি যখন, তখন বুঝিতে হইবে বৌদ্ধধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যে চৌধুরী মহাশয়েরা কণাদ তর্কবাগীশ ও বাঁড়ুযো ঠাকুরকে ১৫০ বিঘা করিয়া ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয় আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতেন, না হলে তাঁহাদের ভূমিদান সিদ্ধ হইবে কেন? সে সময়ে এরূপ ছোট ছোট রাজা রাঢ় দেশে বহুতর ছিলেন। ইঁহারা কখন উড়িষ্যার রাজার হইয়া মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেন, কখন বা মুসলমানের হইয়া উড়িষ্যার রাজার সহিত যুদ্ধ করিতেন। কিন্তু নিকটে আর কোন হিন্দু রাজা না থাকায় তাঁহারা উড়িয়াদেরই অনুকরণ করিতেন। তাঁহাদের প্রজারাও তাহাই করিত। উড়িয়াদের মত কাপড় পরিত, উড়িয়াদের মত মাথা কামাইত, উড়িয়ার বুলি বলিবার চেষ্টা করিত, উড়িয়া মন্দিরের নকলে মন্দির বানাইত, উড়িয়াদের ঠাকুর জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করিত, এইরূপে সমস্ত রাঢদেশেই উড়িয়াদের প্রভাব বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ১২০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত রাঢ়দেশের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যেও উড়িষ্যার প্রভাব বেশ দেখা যাইত। 'শূন্য পুরাণের' ভাষায় উড়িয়া ভাষার প্রভাবের কথা নগেন্দ্র বাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, যে দেখিয়াছে সেই স্বীকার করিবে। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতেও উড়িয়ার প্রভাব যথেষ্ট আছে। কারণ এই তিনশ বৎসর রাঢ়ের হিন্দুরা পুরুষোত্তম ভিন্ন অন্য তীর্থে যাইতে ভরসা করিত না। রাঢ়ের পরবগুলি সব উড়িয়ার দেখাদেখি হইয়াছে। যথা রথ, দোল, স্নানযাত্রা, গুণ্ডিবাড়ী পূর্ণযাত্রা—সবই উড়িষ্যার অনুকরণ। এই তিনশ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যে রাঢ়দেশে একখানি মাত্র ভাল পুথি হইয়াছে। সেখানি শূলপাণির "বিবেক"। শূলপাণি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ গোত্র, সাহুড়ীয়া গাঁই। তিনি মাধবাচার্য্যের লেখা 'পরাশর সংহিতার' টীকার দোহাই দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে কিছুতেই ১৩৬০এর পূর্ব্বে দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহার 'বিবেক' ১২ খানি। একখানি 'দোলযাত্রা-বিবেক।' বোধ হয় উড়িষ্যার অনুকরণেই লেখা। ইহার পূর্ব্বে বাংলাদেশে আর দোলযাত্রার পুথি পাই নাই। একখানি "দুর্গোৎসব-বিবেক।" এখানির সঙ্গেও উড়িষ্যার সম্পর্ক আছে বোধ হয়। কারণ, ইহার পূর্ব্বে আর দুর্গোৎসবের পুথি পাওয়া যায় নাই।

তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে' লেখা আছে নগ্নদর্শন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; সে "নগ্ন" মানে "বৌদ্ধাদয়ঃ"। তখনও রাঢ়ে খুব বৌদ্ধ দেখা যাইত। শূলপাণির সঙ্গে রঘুনন্দনের তুলনা করিলে রাঢ়দেশে উড়িয়ার প্রভাব কতদূর বাড়িয়াছিল তাঁহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। রঘুনন্দনের কাছে আর তীর্থ নাই, কেবল পুরুষোত্তম।

বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের "স্মৃতিসর্ব্বস্ব" ও "শুদ্ধিকারিকা" পড়িয়া এক একবার মনে হয় যেন, তিনি জীমূতবাহন ও শূলপাণির সারমর্ম্ম দিতেছেন। তিনি যে রঘুনন্দনের সারমর্ম্ম দিতেছেন এরূপ মনে হয় না। মনে হয় সংক্ষেপে প্রাচীন স্মৃতির মর্ম্মাদি দিতেছেন। কিন্তু লোকে বলে যে, তিনি রঘুনন্দনের পরবর্ত্তী, রঘুনন্দনেরই অনুগমন করিয়াছেন, এ কথার কোনও বিশেষ ভার আছে তাহা মনে হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহারা দুইজনেই তুল্যকালের লোক। বরং কণাদের শিষ্য বাঁড়ুয্যে ঠাকুর একটু বয়সে বড় হইতে পারেন। তাহার পর রঘুনন্দন ত সমস্ত বাঙ্গালার জন্য বই লিখেন নাই। তাঁহার মতে ত্রিবেণী চাকদা দক্ষিণ দেশ, যেন তাঁহার অধিকারের বাহিরে—তাহা হইলে খানাকুল ত আরও দক্ষিণ দেশ। সুতরাং ও কথাটার উপর জোর দেওয়া চলে না। বলিতে পারি না বাঁড়ুয্যে ঠাকুর কোনও উড়িয়া স্মৃতির সংক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন কি না। উড়িয়া স্মৃতির সব কথা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। তবে একটা কথা এই যে, বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের শুদ্ধিকারিকা বইখানি রামভদ্র সার্ব্বভৌম "শুদ্ধিতত্ত্বকারিকা" বলিয়া নিজ নামে চালাইয়াছেন। তাহাতে লোকে ভাবিল, যদি শুদ্ধিতত্ত্ব-'করিকা' হইল তাহা হইলে রঘুনন্দনের তত্ত্বের উপরই কারিকা হইবে।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়েরা যখন এখানে আসেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন আগম ব্রাহ্মণ, নাম রত্নেশ্বর। সাধারণ লোকে তাঁহাকে আগমবাগীশ বলিয়া আর একজন আগমবাগীশের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে চান। তাঁহার নাম কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তিনিও এই সময়ের লোক কিন্তু তিনি নবদ্বীপাঞ্চলের লোক। তাঁহার প্রধান পুথি 'তন্ত্রসার'। তিনি বুদ্ধ ছাড়া বৌদ্ধদিগের অনেক বোধিসত্ত্ব ও ডাকিনী যোগিনীর পূজা ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মে প্রবেশ করাইয়া যান। এই সময়টা অর্থাৎ খৃঃ ১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত অনেক বৌদ্ধ-দেবতা হিন্দু দেবতার সামিল হইয়া যান। যে সকল মহাপুরুষ এইরূপে ভারতবর্ষের দুইটী প্রধান ধর্ম্ম মিলাইয়া দেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গদেশে ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ প্রধান। আর রাঢ়ে আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ, তাঁহার পুত্র

ও পৌত্র। এই সময় হইতেই বাঙ্গালাদেশে গুরুগিরির সূত্রপাত। বৈদিক পুরোহিতের উপর এই সময় হইতে তান্ত্রিক গুরু দেশে প্রভুত্ব করিতে থাকেন। এই সময়েই রঘুনন্দন 'দীক্ষাতত্ত্ব' লিখিয়া তন্ত্রকে স্মৃতিভুক্ত করিয়া লন এবং স্মৃতির ভিতর নানা তন্ত্রের বচন প্রামাণিক বলিয়া উদ্ধার করিতে থাকেন। খানাকুলের রত্নেশ্বর আগমবাগীশও এই সময়ের লোক।

খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজ ১৪০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হয়। এখানে অভিরাম গোপাল পুরাণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। পরে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলে তাঁহার সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া যান। তিনি খুব উৎসাহী পুরুষ ছিলেন; তিনি আপন শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা নানাস্থানে বিষ্ণু মন্দির স্থাপন করিয়া ও তাহার নিত্য সেবার ব্যবস্থা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম খুব প্রচার করিয়া যান। খানাকুল কৃষ্ণনগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামে এইরূপ অনেক মন্দির আছে। তাঁহার পর কণাদ তর্কবাগীশ মিথিলায় পড়িয়া আসিয়া 'তত্ত্বচিন্তামণি-টীকা' লিখেন। তাঁহার শিষ্য বাঁড়ুয্যে ঠাকুর এক নূতন স্মৃতির মত চালাইয়া যান। তাহার পর রত্নেশ্বর আগমভূষণ তান্ত্রিক মত প্রচলন করেন। সুতরাং একশ বা দেড়শ বৎসরের মধ্যে এই সমাজে বৈষ্ণব শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র সবই প্রচলিত হয়। সমাজটী সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করিয়া উঠিতে থাকে।

এতক্ষণ যাহা কিছু বলিয়াছি সবই ব্রাহ্মণ সমাজের কথা। এখন কায়স্থ সমাজের কথাও একটু বলিতে চাই। যাদবেন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার পুত্র বংশীধর চৌধুরীই এই সমাজ স্থাপন করেন, বড় বড় ব্রাহ্মণ বাস করান। তাঁহাদিগকে প্রচুর ভূমি দান করেন। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা কি ছিল কেহ বলিতে পারেন না। প্রচলিত প্রবাদ মত তাঁহারা নবাব সরকারের ইজারাদার মাত্র। কিন্তু আমার উহা বোধ হয় না। আমার বোধ হয় হিন্দু ও মুসলমান দুই রাজ্যের সীমানায় অনেক লোক এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যকে রাজ্য বলিত না, সমাজ বলিত। এই সময়ে অনেকে স্বাধীন ভাবে ক্ষুদ্র রাজ্য বা সমাজ স্থাপন করিতেন। প্রবল রাজারা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে কর দিতেন, নইলে দিতেন না। যুদ্ধের সময় একপক্ষ বা আর একপক্ষের সহায়তা করিয়া আপনার ধন বৃদ্ধি করিতেন। যাদবেন্দ্র সেই শ্রেণীর লোক বলিয়া আমার মনে হয়। এ সময়ে গৌড়ের মুসলমান সুলতানগণের অবস্থা ভাল ছিল না। সুতরাং আপন কোটে চৌধুরী মহাশয়েরা যা খুসী তাই করিতেন।

তাঁহারা উড়িষ্যা হইতে সর্ব্বাধিকারী বংশকে আনিয়া খানাকুলে স্থাপন

করেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়েরা সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ বসু বংশ। তাঁহারা মাই-নগরের বসু। মূল দশরথ বসু হইতে যিনি ১২ নম্বরে তিনি উড়িষ্যায় যান এবং সেখানকার স্বাধীন হিন্দু রাজার সর্ব্বাধিকারী হন। সেটা কোন্ শতাব্দী তাহা কোথাও লেখা নাই। তবে ১২ নম্বর হইলে ১২০০ হইতে ১৩০০ মধ্যে সম্ভব। ইহার পূর্ব্বেই জগন্নাথের মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল, সেটা বোধ হয় ১০৩৮ হইতে ১১১৮ পর্য্যন্ত। তাহার পর ভোগের ও পূজার বন্দোবস্ত। তাহাতে অনেক পুরুষ লাগে। মাইনগরের সর্ব্বেশ্বর বসু মহাশয়, বোধ হয় এই সময়েই উড়িষ্যার অথবা জগন্নাথ-ক্ষেত্রের সর্ব্বাধিকারী হন। কারণ জগন্নাথ-মন্দিরে তাঁহার ও তাঁহার বংশধরগণের অনেক অধিকার এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহারা তাঞ্জামে চড়িয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন। ছাতা মাথায় দিয়াও প্রবেশ করিতে পারেন। এটা একটা বড় রাজসম্মান। মন্দিরের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে এ সকল অধিকার পাওয়া যায় না। এই সময়ে তাঁহারা উড়িষ্যার রঘুনাথপুরের তালুক পান। ঐ তালুকের সত্ত্ব এখনও সর্ব্বাধিকারী বংশ ভোগ করিতেছেন। তবে অনেক ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাধিকারীরা অনেক পুরুষ ধরিয়া রঘুনাথপুরে বাস করিতেছিলেন। উনিশ পর্য্যায় রত্নেশ্বর বসু সর্ব্বাধিকারীকে আনিয়া যাদবেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কন্যা সম্প্রদান করেন এবং কৃষ্ণনগরে বাস করান। তাঁহার আর দুই ভাইও এই সময়ে আসিয়া কৃষ্ণনগরে বাস করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা আজিও উড়িয়া অধিকারী বা উড়িয়া সর্ব্বাধিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ; কারণ তাঁহারা উড়িয়া স্ত্রী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়েরা যখন উড়িষ্যার রাজার কর্ম্মচারী ও জগন্নাথ-মন্দিরের সেবক ছিলেন তখন যে তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা এখনও বৈষ্ণব ধর্ম্মে পরম আস্থাবান্। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের অনেক কথাই লিখিয়াছেন, তাহাতে আপনারা অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে সর্ব্বাধিকারী বংশের রামনারায়ণ মুন্সী কলিকাতায় আসিয়া খুব পসার প্রতিপত্তি করেন। তিনি একবার ভূ-কৈলাসের ভূ-সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিয়া প্রভূত যশোলাভ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মথুরামোহন সর্ব্বাধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মিউটিনির পূর্ব্ব বৎসর হাঁটিয়া তীর্থ দর্শন করিতে যান এবং মিউটিনি শেষ হয় হয় এমন সময় দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার

এই তীর্থ-ভ্রমণের এক বিবরণ আছে। ঐ বিবরণ ১৮৫৮ সালে লেখা হয়। উহা গদ্যে লেখা এবং একখানি বড় বই। এত বড় এবং এমন সুন্দর গদ্যে লেখা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বাঙ্গালা ভাষায় আর আছে কি না সন্দেহ। যদুনাথ পায়ে হাঁটিয়া বদরিকাশ্রম, জ্বালামুখী প্রভৃতি তীর্থস্থানের বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। কোথায় কি কি পুণ্য কার্য্য করিতে হয়—কোথায় কিরূপ থাকিবার স্থান পাওয়া যায়—কোথায় কিরূপ খাবার জিনিস পাওয়া যায়, এ সব কথা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বেশ পরিষ্কার করিয়া লেখা আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই "তীর্থ-ভ্রমণ" প্রকাশ করিয়াছেন। যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর ছেলারা সকলেই সুপরিচিত। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রথম ছিলেন, আমরা তাঁহার কাছে পড়িয়াছি। তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার সদ্‌গুণ সমূহের অনুকরণ করাই জীবনের সার বস্তু বলিয়া মনে করি। ২য় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী নিজে ত স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, তাহার পর "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।"—তাঁহার পুত্রেরা সকলেই কৃতী। দেববাবু ও সুরেশ ত জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। দেব বাবু উপস্থিত আছেন। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির বিষয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সুরেশ অল্পভোগী ছিল, অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল। আমি তাহাকে অতি অল্প বয়স হইতেই জানিতাম। সে যে কাজেই লাগিত প্রাণপণে তাহা সুসিদ্ধ করিত। কি অস্ত্র-চিকিৎসায়, কি অন্য চিকিৎসায় তাহার মত তাহার সময়ে আর কয়জন ছিল? তাহার পর এই যে বেঙ্গলী 'এম্বুলেন্স কোর' এটা ত সেই করিয়া গিয়াছে। সে পরলোকগত হইয়াছে; আমরা পরলোকে তাহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর আর এক পুত্র রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার পাইয়া রীতমত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করিয়াই জীবনের অধিকাংশ কাটাইয়া গিয়াছেন। তাহার উপর রাজ-নীতি ক্ষেত্রে তিনি ত একজন পাইওনিয়ার। কত কাজই যে করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমরা এতক্ষণ খানাকুলের অনেকেরই কথা বলিলাম, কিন্তু এখানকার প্রধান পুরুষের নাম এখনও করি নাই। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। ইনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, ইঁহার অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ হইতেই ইঁহারা ব্রাহ্মণ-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাকরী ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কখনও বড়লোক হইতেন,

কখনও বা পড়াইয়া খাইতেন। রামমোহন রায়ের উভয় কুল পবিত্র। তাঁহার পিতৃকুলের কথা তিনিই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাতামহ দেশগুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের আদি পুরুষ শ্যাম ভট্টাচার্য্য। ইনি চাতরায় বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন, এবং সেকালে বড় বড় ব্রাহ্মণের গুরু ছিলেন। রামমোহন রায় প্রথম আরবী ও পারসী পড়িয়াছিলেন। পাটনা তাঁহার পাঠস্থান ছিল। তাঁহার পিতৃ-বংশ বৈষ্ণব ও মাতামহ-বংশ শাক্ত ছিল। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে ধর্ম্ম-সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। তাহার পর আরবী পারসী পড়িয়া তিনি একেশ্বরবাদী হইয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি ১৬ বৎসর বয়সে পুতুল পুজার বিরুদ্ধে এক বই লেখেন। ঐ বই লেখায় তাঁহার পিতা ও মাতামহ উভয়েই তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনিও চারি বৎসর নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ২০ বৎসর বয়সে দেশে ফিরিয়া আসেন এবং পিতা পুত্রে আবার সদ্ভাব হয়। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার সংস্কার জন্মে যে, একেশ্বরবাদ প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য এবং সেই সকল শাস্ত্রের পর নানা নূতন ও অসার মত প্রচলিত হইয়া আমাদের ধর্ম্মকে দূষিত করিয়াছে। সুতরাং তিনি পুরাণ ও তন্ত্র নিম্ন অধিকারীর পক্ষে রাখিয়া উচ্চ অধিকারীর জন্য ব্রহ্মজ্ঞানই প্রচার করিতে থাকেন।

ইংরাজি ১৮০০ হইতে ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত রামমোহন রায় সরকারী চাকরী করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। এই চাকরীর সময়েই তিনি ইংরাজি শিখেন। ইংরাজের সঙ্গে মিশিতে থাকেন এবং ক্রমেই ইংরাজের ঘোরতর পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। চাকরী হইতে অবসর লইয়া তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার মত প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার মত প্রচারের চারিটি উপায় ছিল। (১) কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক, (২) বিদ্যালয় সংস্থাপন ও শিক্ষাদান, (৩) পুস্তক প্রচার, (৪) সভাসংস্থাপন।

এই চারি উপায়ে তিনি আপন মত প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না যে, হিন্দু সমাজ ভাঙ্গিয়া যায়। হিন্দু সমাজ, তিনি যাহাকে উপধর্ম্ম বলিতেন, তাহা ত্যাগ করিয়া উন্নত হয় এই তাঁহার ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল। উপধর্ম্মের মধ্যে "সতী" হওয়া একটা। এটা যে অতি নৃশংস ব্যাপার তাঁহার এই ধারণা হইলে ১৮১৭ হইতে ১৮২৯ পর্য্যন্ত তিনি উহাকে উঠাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ যখন স্থাপিত হয় তখনও তিনি ইহার বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখি করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা না

থাকিলেও, ইংরাজেরা যে আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সকল দেশটাকে ইংরাজি ভাবে চালাইতে চাহিয়াছিলেন, তিনিই তাহার সূত্রপাত করিয়া যান। তিনিই সব প্রথমে আপনার বাড়ীটী ইংরাজী ভাবে সাজাইয়াছিলেন। আর এই একশত বৎসর সমস্ত ভারত বর্ষটাই ইংরাজি সাজে সাজিয়াছে যাঁহারা ইহাকে উন্নতি বলেন তাঁহারা রামমোহন রায় মহাশয়কে ইহার আদি কর্ত্তা বলিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারা বলেন রামমোহন রায় মহাশয় হইতেই ভারতবর্ষের সবদিকে উন্নতি। সুতরাং তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ, অসাধারণ মনীষী। পুরাণ আদর্শ নিবাইয়া দিয়া নূতন আদর্শ আনার তিনিই মূল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় সকল বিষয়েই ভাগ্যবান্ ছিলেন। "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্"। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় একজন প্রকাণ্ড পুরুষ ছিলেন। ওকালতীতে তিনিই বাঙ্গালাদেশে প্রথম প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনিই কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী জজ্ নিযুক্ত হন। কিন্তু শরীর ভগ্ন হওয়ায় তিনি এক দিনও বিচারাসনে বসিতে পারেন নাই। তিনি শুনিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

এতক্ষণে আমরা খানাকুলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের কতক বলিলাম। সময় নাই যে সবকথা বলি। আর অধিক বলিতে গেলে আপনাদের ধৈর্য্যও থাকিবে না। ইহারই মধ্যে দেখিতেছি অনেকেই উস্‌খুস্ করিতেছেন। আমরা আজ এই পুণ্যভূমিতে মিলিত হইয়াছি। এখানে কিছু সাহিত্য-চর্চ্চা হয়, এইটীই আমাদের সকলের ইচ্ছা।

সাহিত্য-শাখার সভাপতি—

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের

অভিভাষণ।

বঙ্গসাহিত্যসেবকবৃন্দ,

সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন জানাইয়া প্রার্থনা করি—"অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যের ও সাহিত্যসেবকগণের সেবা করিয়া আসিতেছি; তজ্জন্য সেবার যৎকিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিয়াছে; কিন্তু পৌরোহিত্য-

দর্শন-শাখার সভাপতি
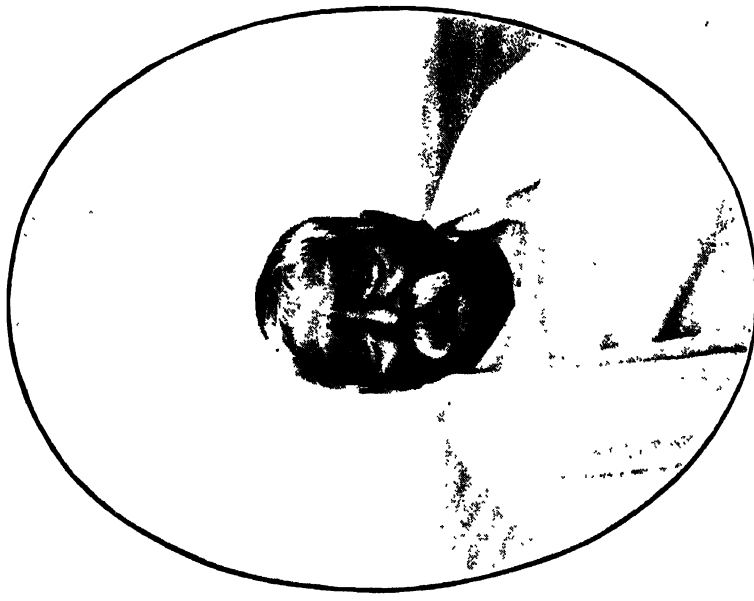
সাহিত্য-শাখার সভাপতি

অনভ্যস্ত অনধিকারচর্চ্চা। আপনারা অনধিকারীর দুর্ব্বল মস্তকে সম্মানের উষ্ণীষ পরাইয়া দিয়া তাহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আপনাদিগের নিকট যে দুই চারিটী কথা বলিব, তাহা সভাপতির অভিভাষণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না ;—তাহা সেবকের বিনীত নিবেদন।

আজ যে স্থানে আমরা সম্মিলিত হইয়াছি, তাহা সমগ্র বঙ্গবাসীর সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র। একদিন ইহা আচার্য্য অভিরাম ঠাকুরের লীলাস্থল ছিল ; তাঁহার শ্রীপাট এখনও অসংখ্য ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর ভক্তির অর্ঘ্যে সুরভিত ; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। এই স্থানে আবার বাঙ্গালা সাহিত্যের অগ্রদূত, নব্যভারতের নবযুগপ্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। এই স্থানেরই অনতিদূরে সেনহাট গ্রামে বহুদিন পূর্ব্বে—১১৯২ সালে আর এক সাধক, ভক্ত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর দাস। তাঁহার 'জগন্নাথ-মঙ্গল' ১২২৩ সালে লিখিত হয় ; তাঁহার 'সঙ্গীত-মাধব', 'প্রেম-সম্পুট', 'ভক্ত-রত্নমালা' বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কার। মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিতকার স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় এইখানে বসিয়া সংবাদ-পত্র ও রঙ্গালয়ের ইতিহাস লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। বহুদিনের বহুক্লেশের পথশ্রমের অবসানে তীর্থক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া মন্দিরচূড়া দর্শন করিবামাত্র তীর্থযাত্রিগণ যেরূপ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া থাকে, এই স্থানে, এই পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হইয়া, সেইরূপ উল্লাসে সর্ব্বাগ্রে ইহার জয়ধ্বনি করি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতে করিতে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি ; তাহার কোনটীরই মীমাংসা করিতে পারি নাই ;—করিবার মত সেরূপ শক্তি সামর্থ্য নাই ; সেরূপ স্পর্দ্ধাও প্রকাশ করিতে পারি না। সেই সমস্যাগুলিই সর্ব্বাগ্রে নিবেদন করিব।

প্রথম সমস্যা—বর্ণ-বিন্যাস। পুরাতন পুথিতে বর্ণ-বিন্যাসের যে রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই যে পুরাতন রীতি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যে রীতি ধীরে ধীরে নব্য বঙ্গে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাকে পুনরায় পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য অল্পদিন হইতে নবীন উদ্যম প্রকাশিত হইতেছে। 'কজ্জ' হইতে 'কাজে'র উৎপত্তি ধরিয়া লইয়া সেকালের লেখকগণ বর্গীক 'জ'কারের ব্যবহার করিতেন ; 'কার্য্য' হইতে 'কাযে'র উৎপত্তি কল্পনা করিয়া, পরবর্ত্তী কালে অনেকে অন্তঃস্থ 'য'কারের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছিলেন ; এখন 'কাজে'র বর্ণ-বিন্যাসে আমরা কোন্ রীতি অবলম্বন করিব,—ইহার

সমাধান কঠিন নয়। কারণ, উভয় রীতির মূলেই ইতিহাস আছে। কিন্তু যে সকল বর্ণ-বিন্যাসের মূলে কোনরূপ ইতিহাস নাই, সেইরূপ বর্ণ-বিন্যাস চালাইতে হইলে, শব্দের ইতিহাসের মুল সূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমরা সে সকল স্থলে কোন্ রীতির অনুসরণ করিব? সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক শব্দ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। এই শ্রেণীর অনেক শব্দ দিন দিন অধিক মাত্রায় বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া তাহার শব্দদৈন্য দূর করিতেছে। তাহাদের বর্ণ-বিন্যাস কিরূপ হইবে? 'বঙ্গ' নামটি পুরাতন; তাহা পুরাকালে আমাদের দেশের একটি অংশকেই বুঝাইত। 'বাঙ্গালা' নাম আধুনিক। এখন সমগ্র দেশকে বুঝাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার বর্ণ-বিন্যাস কিরূপ হইবে? এ এ বিষয়ে মীমাংসা আবশ্যক, মীমাংসা হয় নাই।

দ্বিতীয় সমস্যা—পদ-বিন্যাস। ইহাও বহু পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু নিতান্ত আধুনিক হইলেও, বিলক্ষণ জটিল। পদ-বিন্যাসের সঙ্গে রীতির সম্বন্ধ অপরিহার্য্য; রীতির সঙ্গে দেশের সম্বন্ধও সেইরূপ। পুরাকালে সংস্কৃত-সাহিত্যে "গৌড়ী রীতি" প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল,—বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যের উপরেও তাহা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাঙ্গালীর সেই নিজস্ব রচনারীতি ছাড়িয়া দিয়া, পদ-বিন্যাস করিলে, অধিকাংশ বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা দুর্ব্বোধ্য হইবার আশঙ্কা আছে। যাত্রায়, কথকতায় সাধুশব্দ-বিন্যাসের আতিশয্য থাকিলেও কোন বাঙ্গালী অর্থ বোধ করিতে কষ্ট বোধ করে না। ভাষাকে যতই স্বাধীন ও সরল করা হউক না কেন, তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে উচ্ছৃঙ্খল করা সঙ্গত কি না, তাহাই বিচার্য্য। আমরা যাহাকে মৃত ও যাহাকে জীবিত ভাষা বলিয়া থাকি, তাহাদের ঐরূপ নামকরণ করা ঠিক কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। যে ভাষা সুসংযত, সুমার্জ্জিত, সুসংস্কৃত, তাহা মরে না বলিয়া, তাহাই জীবিত ভাষা বলিয়া কথিত হইতে পারে;—সংস্কৃত, আরবী, লাটিন, গ্রীক এই হিসাবে মৃত নয়, চির-জীবিত ভাষা। আধুনিক ভাষাগুলি শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া, নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে নিরন্তর অগ্রসর হইতেছে। এক যুগের রচনা অন্য যুগে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িতেছে সত্য, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন কি সজীবতার লক্ষণ নহে? আমাদের জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালা ভাষার গতি কি হইবে? ইহাকে যদি সজীব করিতে হয়, তবে নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে কি না? সে নিয়ম পুরাতন না হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু সকলকেই তাহা মানিয়া চলিতে হইবে কি না?

তৃতীয় সমস্যা—সুরুচি ও কুরুচি, সুনীতি ও কুনীতি। বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে এই সুরুচি ও কুরুচি, সুনীতি ও কুনীতি লইয়া আলোচনা, আন্দোলন ও কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধানও আমরা দেখিতে চাই। বঙ্গসাহিত্য এক্ষণে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য নয়; বাঙ্গালা ভাষার তথা বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবকগণ নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহাদের রীতি নীতি, আচার ব্যবহারও বিভিন্ন। এ অবস্থায় কোন এক সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতির বৈলক্ষণ্যই সুরুচি কুরুচির মানদণ্ড হইতে পারে কি না, সে কথা চিন্তাশীল সুধীবৃন্দের বিচার্য্য। দেশের এই যুগ-পরিবর্ত্তনের সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার দ্বার উন্মুক্ত রাখিবে, না, তাহা সম্প্রদায়-বিশেষের পুরাতন গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিবে কি না, নূতনের সংস্পর্শে আসিবে কি না, তাহার মীমাংসার সময় আসিয়াছে। তাই আপনাদের সম্মুখে কথাটা উপস্থিত করিলাম।

এই তিনটি সমস্যা সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। সাময়িক পত্রের সম্পাদকরূপে কোন পক্ষেরই পক্ষপাত কোন দিন করি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ভাষার গতি নিয়মিত করিবার জন্য আপনারা কি কোন চেষ্টা করিবেন না? যদি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—আর বিলম্বের অবসর নাই,—সময় আসিয়াছে।

এক্ষণে সাধারণ ভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, প্রথমেই কাব্যের কথা আসিয়া পড়ে;—সেই কথাই সর্ব্বাগ্রে বলিবার চেষ্টা করিব।

কাব্য একটী ললিত কলা। কাব্য অনুভূতির সাহায্যে ভাবকে মূর্ত্তি দান করে। সুকবি ও বরেণ্য সমালোচক ম্যাথ্যু আর্ণল্ড সত্যই বলিয়াছেন,—"কাব্য এক শ্রেণীর ভাষ্য—জীবন-বেদের ভাষ্য;—মানব-মনের আনন্দদাতা, মানবের রক্ষাকর্ত্তা। কাব্য ছাড়া বিজ্ঞানও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এখন আমরা যাহাকে দর্শন ও ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিতেছি, কালে কাব্য তাহারও স্থান অধিকার করিবে।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—"এখন আমরা যাহাকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিতেছি, তাহার অন্তরালে নিতান্ত অজ্ঞাতসারে যে কাব্যরস বর্ত্তমান আছে, তাহাই ধর্ম্ম-শক্তির মূল প্রস্রবণ।" যে ধর্ম্ম অনুভূতির সাহায্যে পরব্রহ্মকে পাইবার সন্ধান দিতে পারিবে, সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে জগতে পরিগণিত হইবে।

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র "সাধুকাব্যনিষেবনে'র উল্লেখ করিয়া, "অসাধু কাব্যের"

প্রতি প্রসঙ্গক্রমে কটাক্ষপাত করিয়া গিয়াছে। উৎকর্ষে কাব্য সাধু হয়, অপকর্ষে অসাধু হইয়া থাকে। গুণ, অলঙ্কার এবং রীতি—এই তিনটী কাব্যের উৎকর্ষের হেতু। ইহা কেবল সংস্কৃত-সাহিত্যের কথা নয়, সমগ্র মানব-সাহিত্যের কথা। ইহাকে বুঝিতে হইলে কবির মর্য্যাদা কোথায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। মানুষকে মানুষ করিবার উদ্দেশ্যই মানব-সমাজের মজ্জাগত মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল দেশে সকল যুগে নানারূপ রাজবিধি ও সমাজবিধি উদ্ভাবিত হইয়াছে;—কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই। কারণ, তাহা দণ্ডমূলক বলিয়া কেবল দণ্ড দান করিয়া আসিয়াছে —চরিত্র-সংশোধনে মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে নাই। বিচারালয়, কারাগার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সামাজিক প্রায়শ্চিত্ত এবং বাধ্যতামূলক লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা এই জন্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; কেবল কবির ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, তাহা দণ্ডমূলক নয়—সমবেদনামূলক। তজ্জন্য কবিই কেবল অলক্ষিত ভাবে অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের ক্ষতে সহানুভূতির শীতল প্রলেপ প্রদান করেন, মনুষ্যত্বের দিকে অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করেন,—মানুষকে মানুষ হইবার জন্য সাহায্য দান করেন। এই গুণে কবি মানব-বন্ধু—মানব-শিক্ষক—মনীষী ও ঋষি;—এই গুণে ব্যাস বাল্মীকি—ব্যাস বাল্মীকি। কবির এই সমুচ্চ পদ-মর্য্যাদা বিস্মৃত না হইয়া, কবি যদি কাব্য রচনা করেন, তবে তাহা সংসার-দাবদগ্ধ জনসমাজের পক্ষে চির-শীতল অমৃত-প্রলেপে পরিণত হয়। দণ্ডদানের দুঃখ-ক্লেশের পরিবর্ত্তে পথভ্রান্ত মানবকে কবি স্নেহালিঙ্গনে সৎপথে আকর্ষণ করেন,— "ভোগে নহে ত্যাগে"—এই মহাশিক্ষায় মানবকে দেবত্বের দিকে পরিচালিত করিয়া থাকেন।

সত্যনিষ্ঠাই সাহিত্যের পবিত্র পন্থা। তাহাই সকল সমাজের মেরুদণ্ডকে সুদৃঢ় ও সবল করিতে পারে; তাহাকে কথার হেরফেরে হাসিয়া উড়াইয়া দিলে, সমাজকে পরিণামে পঙ্গু হইয়া পড়িতে হয়। তজ্জন্য সাহিত্যে সত্যনিষ্ঠা আবশ্যক। বঙ্গসাহিত্যের সম্মুখে আশার যুগ আসিয়াছে বলিয়া, এই কথা পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইবার সময় আসিয়াছে। সময় আসিয়াছে বলিয়াই পবিত্রতার কথাটা বিশেষ ভাবে ভাবিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

কণ্বপালিতা, আশ্রমললামভূতা শকুন্তলার রূপ-বর্ণনায় অমর কবি তাঁহাকে "মধুনবমনাস্বাদিতরসং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। পরিপূর্ণ মধুভাণ্ড হইতে কেহ এক বিন্দু তুলিয়া লইয়া আস্বাদন করিলে, ভাণ্ডস্থিত অবশিষ্ট মধুর রস

অল্প হইয়া যায় না, মিষ্টতা সমানই রহিয়া যায়; তবে কবি এমন ব্যর্থ শব্দ-প্রয়োগে শক্তিক্ষয় করিয়াছিলেন কেন? সকলই থাকে, থাকে না কেবল পবিত্রতা,—তাহার অনাস্বাদিত মিষ্টতাই প্রকৃত মিষ্টতা,—এই কথাটুকু বুঝাইবার জন্যই কবি এত প্রয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যেও সেই পবিত্রতা আবশ্যক। না থাকিলে, মিষ্টতার অল্পতা হয় না, কলাকৌশলের অপচয় হয় না, কিন্তু উপাদেয়তা নষ্ট হইয়া যায়। কলা-লালিত্যে মিষ্টতা চাই;—কিন্তু তাহাই সর্ব্বস্ব নয়,—সঙ্গে সঙ্গে উপাদেয়তাও অপরিহার্য্য। ইহার একটীকে মারিয়া, অন্যটীকে বাঁচাইয়া রচনা করিলে, তাহাতে সাহিত্য অঙ্গহীন হয়; যাহা আমাদের সম্মুখে অসাধারণ দেবত্বের আদর্শ ধরিয়া রাখিতে পারিত, তাহা সাধারণ মনুষ্যত্বের হীন আদর্শ ধরিয়াই দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। যাহা আছে তাহার ফটোগ্রাফ এবং যাহা হইতে পারে তাহার আলেখ্য এক নয়, পৃথক্;—ললিতকলার হিসাবেও কোন্‌টী অপরিহার্য্য, কোন্‌টী পরিহার্য্য, তাহার বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। কারণ, রসকে বড় সন্তর্পণে রক্ষা করিতে হয়, নচেৎ রস থাকে না, বিকৃত হইয়া সুরাসবের জন্মদান করে; তখন তাহার মিষ্টতা সুতীব্র মাদকতায় পরিণত হয়।

এখন বঙ্গসাহিত্যের ক্রীড়া-কৌতুকময় শৈশব-লীলার অবসান হইয়াছে,—এখন যাহারা ইহার সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত, কেহ কেহ বিশ্ববিখ্যাত। অনেকে রচনাশক্তিতে বিশ্ব-সাহিত্য-সেবকদলের মধ্যে উচ্চাসন লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইঁহারা কেবল আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের আশার প্রদীপ নন, সমগ্র মানব-সমাজের চিন্তাপ্রবাহের গতি নির্দ্দেশ করিবার উপযুক্ত শক্তিসামর্থ্যে শক্তিশালী। তাঁহাদিগকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

কাব্যের আলোচনার পর নাটকের কথা বলা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহাও কাব্যের অন্তর্গত;—শ্রব্য নয়, দৃশ্য—এইমাত্র পার্থক্য। নাটক সম্বন্ধে গত বর্ষের সাহিত্য-বিভাগের সভাপতি শ্রদ্ধেয় রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বিশেষজ্ঞ; তাঁহার অধিক আমি নূতন কিছু বলিতে পারিব না। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের, তথা বঙ্গ-রঙ্গালয়ের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য একটা বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে; অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, রঙ্গালয়ের শোভা-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এদিকে যেমন আয়োজন হইতেছে, অন্য

দিকে তেমনই উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয়েরও ব্যবস্থা হইতেছে। আশা করা যায়, অত্যল্পকালের মধ্যেই আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চগুলি আপনাদের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবে। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য সর্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদরূপে নাটক উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সেই মূল উদ্দেশ্য অব্যাহত থাকিলেই নাট্য-সাহিত্য দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারে,—এ কথা যেন বিস্মৃত না হই।

এক সময়ে বাঙ্গালার চিন্তাধারা পদ্যের ভিতর দিয়াই প্রধানতঃ প্রকাশিত হইত। গদ্য-সাহিত্যের প্রচলন বাঙ্গালায় কতদিন হইয়াছে, সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতে চাই না—বলিবার অধিকারীও আমি নই। তবে রামমোহনের জন্মভূমিতে দাঁড়াইয়া গদ্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-বঙ্কিমচন্দ্র-ভূদেব-কাঙ্গালহরিনাথ-কালীপ্রসন্ন-সেবিত যে বঙ্গভাষা বাল্যে পাঠ করিয়া আনন্দ ও শিক্ষা পাইয়াছি, যৌবন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে ভাষা-জননীর সেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, সেই বঙ্গবাণীর বরবপু সাজাইবার জন্য যাঁহারা যাহা দিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য আমার নাই। তবে, এ কথা গর্ব্বের সহিত বলিতে পারি যে, প্রাচীনকালে যে সকল মহামনীষী ভাষাজননীর মন্দির নির্ম্মাণ-কল্পে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবের ও ভাবুকতার সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর মন্দিরের ভিত্তি গড়িয়াছিলেন, উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাঁহারা নানাদেশ হইতে মালমসলা আহরণ করিয়াছিলেন, নব নব রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া মাতৃমন্দিরকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন; এবং আমাদের চিরারাধ্যা বঙ্গবাণীর দেবীপ্রতিমা তাহার ভিতর প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিভরে মায়ের পূজার আবাহন করিয়াছিলেন। সে পূজার রীতি আজ পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্য পুরাতন-প্রীতিতে। এই পুরাতন-প্রীতির বন্ধন এখনও ছিন্ন হয় নাই।

গদ্য-সাহিত্যের ভিতর তিনটী বিষয়ে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

প্রথমে সন্দর্ভের কথা। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বের ন্যায় আজকাল চিন্তাশীল সাহিত্যবিষয়ক সন্দর্ভ বড় একটা বাহির হইতেছে না। যে জাতি ভাবুক ও চিন্তাশীল বলিয়া জগতের নিকট পরিচিত, সে জাতির সাহিত্য হইতে চিন্তাশীলতার ছাপ কি একেবারে মুছিয়া যাইবে? বঙ্কিমমণ্ডলীর কথা ছাড়িয়া দিলেও, পরবর্ত্তী বহুলেখকের সন্দর্ভে যে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইত, সেরূপ পরিচয় আজকাল ক্রমে ক্রমে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথ

চিন্তাশীল দার্শনিক লেখক,—তাঁহার কাব্যে উপন্যাসে গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার উপন্যাসে চরিত্র-বিশ্লেষণ যেমন আছে, চিন্তা করিবার সম্ভারও তাহাতে সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে চিন্তাশীলতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়,—কিন্তু দার্শনিক সুচিন্তিত প্রবন্ধ আজকাল আর প্রকাশিত হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই চিন্তাশীলতার অভাবের কারণ অনুসন্ধানের সময় আসিয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহার যে কারণ অনুমিত হয়, তাহা আপনাদের নিকট বর্ণিব। দারিদ্র্য-দুঃখ-অভাব-ক্লিষ্ট আমরা চিন্তা করিতে পারি না—চিন্তা করিবার জন্য যে সময় ব্যয় করা আবশ্যক, তাহা আমরা ব্যয় করিতে পারি না, সে অবসর আমাদের নাই, সে সাধনা আমাদের নাই, তাই আমরা চিন্তাশীল প্রবন্ধ পাইলেও গ্রহণ করি না। আমরা চাই সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু রস—একটু আনন্দ—একটু তৃপ্তি। সেটা পাই আমরা কথা-সাহিত্য হইতে। তাই আমরা কথা-সাহিত্যের অধিকমাত্রায় পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছি। সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য, চিন্তাশীল প্রবন্ধাবলী প্রচারিত না হইলে আমরা কেবল রস-সাহিত্য ধরিয়া মানুষ হইতে পারিব না। দেশ চায় ভাবের প্রেরণা—নূতন ভাবের সন্ধান। যে ঋত্বিক্ এই ভাবের সন্ধান দিতে পারিবেন, তিনি আমাদের নমস্য হইবেন। তিনিই একদিন ভগীরথের ন্যায় নূতন ভাব-গঙ্গার প্রবাহ ছুটাইবেন, যাহার শীতল বারি পান করিয়া জাতি প্রাণরক্ষা করিবে। আর একটা কথা। যদি কথা-সাহিত্যের প্রতি সাধারণ লোকের অনুরাগই অধিক সূচিত হয়, তাহা হইলে কথা-সাহিত্যিকদিগের কর্ত্তব্য—অন্ততঃ উপন্যাসের ভিতর দিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া;—কেবল রসসৃষ্টির দিকে মনোযোগ না দিয়া মানব-সমাজের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। "গোরা" ও "পল্লীসমাজ" ভাল করিয়া পাঠ করিলে আমরা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারি।

কেবল রত্ন আহরণের জন্য দেশবিদেশে ছুটিলে চলিবে না; মানবকে বাঁচিতে হইলে আহার করিতে হইবে। এই আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এদেশে এখন কৃত্রিমতার যুগ আসিয়াছে, খাঁটি জিনিষ এখন আর বড় মেলে না—এখন ভেজালেরই দিন। তাই বলি, ভাষা-জননীর প্রাণরক্ষার জন্য খাঁটি আহার্য্যদ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। জগতের আহার্য্য-ভাণ্ডার হইতে বলকারক আহার্য্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে। এই কার্য্য করিতে হইলে অনুবাদের আবশ্যক। বিশ্বসাহিত্যের যেখানে যা কিছু ভাল, তাহাই গ্রহণ করা

উচিত। এই অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বদেশেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। অনুবাদ করিতে হইলে মূল হইতে অনুবাদ করাই যুক্তিযুক্ত। আর কেবল অনুবাদ হইলেও চলিবে না; দেশ, কাল, পাত্রোপযোগী করিয়া অনূদিত বিষয়কে নিজস্ব করিয়া লইতে হইবে।

এইবার কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চাই। নাটকের ও কথা-সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি একরূপ। উভয় হইতেই আমরা চিত্তবিনোদ ও শিক্ষালাভ করি। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই।—নাটক কার্য্য ও দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়া চরিত্র ফুটায়, কথা-সাহিত্য সেরূপ করে না। কথা-সাহিত্য মানবমনে স্থায়ী অনুভূতি উদ্রেক করিয়া দিবার চেষ্টা করে। চরিত্র-সৃষ্টি, রসোদ্রেক ও চিত্তবিনোদন কথা-সাহিত্যিকের মুখ্য উদ্দেশ্য; আর একটী উদ্দেশ্য, মানবজীবনের পরীক্ষিত সত্যগুলিকে কাল্পনিক বা প্রকৃত ঘটনার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট করা। সমাজবদ্ধ-মানব-সংস্থিতির জন্য যে সমস্ত সমস্যা ঘটিয়া থাকে, উঠিয়া থাকে বা উঠিতে পারে, তাহাদের সমাধান করাও কথা-সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য। কোন কোন কথা-সাহিত্যিক উপন্যাসে অনাগত সমস্যা তুলিয়া থাকেন। কিন্তু এগুলিকে আমাদের দেশ, কাল, পাত্রোপযোগী না করিয়া উপস্থাপিত করিলে কোন দিনই চলিবে না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কথা-সাহিত্যিক না হইলে কেহই অনাগত সমস্যার কথা লিখিতে পারেন না।

কথা-সাহিত্যের দুইটী দিক আছে—উপন্যাস ও ছোট গল্প। ছোট গল্পে একটী ঘটনা বা মানবীয় একটী অনুভূতির অথবা একটী ঘটনা-ফলে উৎপন্ন কয়েকটী অনুভূতির সমাবেশ, ভাবের একতা ও পূর্ণতা থাকে। ফরাসী কথা-সাহিত্যিকদিগের মতে ছোট গল্পের উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্য্য ও রসানুভূতির উদ্রেক করা—কোন শিক্ষার কথা ছোট গল্পে স্থান পায় না। আমেরিকার কথা-সাহিত্যিকদিগের মতে, ছোট গল্পের উদ্দেশ্য,—অল্প পরিসরের ভিতর সহজে একটা সজীব ভাবের উদ্রেক করা।

ছোট গল্পে কল্পনার প্রসার—অবাধ গতি ও স্বচ্ছন্দ লীলাভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়। ছোটগল্পলেখককে জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিতে হয় না; ঔপন্যাসিককে তাহা দেখিতে হয়। ছোটগল্পলেখক জীবনের কোন একটা ঘটনা বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক অভিজ্ঞতা মনোজ্ঞ ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া সকলকাম হন। অভিজ্ঞতা ভূয়োদর্শনসাপেক্ষ।

এক্ষণে উপন্যাস সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিব। উপন্যাস দুই শ্রেণীর, ভাবগত

(Idealistic) ও বস্তুগত (Realistic)। বস্তুগত উপন্যাসে জীবনের পরীক্ষিত বাস্তব সত্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়; আর ভাবগত উপন্যাসে সত্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়; আর ভাবগত উপন্যাসে জীবনের উচ্চ আদর্শ বিবৃত হয়। বস্তুগত ঔপন্যাসিকদের লক্ষ্য থাকে ঘটনার ও চরিত্রের যথাযথ বর্ণনের দিকে, মানসিক ভাবের স্ফুরণের দিকে। অবস্থা বা ঘটনা তাঁহাদের নিকট চরিত্রবিকাশের সহায়মাত্র। কোন্ অবস্থায় মানবচরিত্র কি ভাবে ফুটিয়া উঠে তাঁহারা তাহারই বর্ণনা করিয়া থাকেন। সত্যই তাঁহাদের বর্ণিতব্য বিষয়।

আবার অন্যদিক্ হইতে দেখিতে গেলে, বস্তুপন্থীদিগের স্বাধীনতা বড় কম; কারণ, আপনার পরীক্ষিত বিষয় ভিন্ন তাঁহারা কোনও কথা বলিতে পারেন না। ভাবপন্থী ঔপন্যাসিকদের স্বাধীনতা কিন্তু বেশী। কল্পনার মনোরথে চড়িয়া তাঁহারা যে সত্যের সন্ধান পান, তাহাই পাঠকদিগের নিকট উপস্থাপিত করেন। যতক্ষণ তাঁহাদের পাঠকেরা তাঁহাদের প্রতি আস্থাবান্ থাকেন, ততক্ষণ তাঁহাদের সিংহাসন অপ্রতিহত থাকে। কিন্তু সত্যের পথ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র দূরে সরিয়া গেলে, তাঁহাদের প্রতিপত্তি আর থাকে না।

এক্ষণে আমি শ্রীমান্ চারুচন্দ্র মিত্রের 'উপন্যাসে বাস্তবতা বনাম ভাবুকতা' প্রবন্ধ হইতে সামান্য একটু উদ্ধৃত করিয়া এ আলোচনা শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেন,—

"জগতের বড় বড় মনীষীরা, বড় বড় ঔপন্যাসিকেরা নীতির পথ হইতে বিচ্যুত হন না। তাঁহাদিগকে নীতিবিদ্ (moralist) বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা বাস্তব ঘটনাগুলিকে এরূপভাবে চিত্রিত—জীবনের কার্য্যগুলিকে এরূপভাবে অঙ্কিত করেন, যাহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা দেখাইতে চান প্রত্যেক কার্য্য বা ঘটনার একটা নৈতিক দিক্ (moral bearing) আছে। পাপের প্রতি আস্থা কখনই তাঁহাদের লেখনী হইতে পাওয়া যায় না। জীবন-সমস্যার সমাধান তাঁহারা করিয়া থাকেন। জীবন-বেদ আর্টিষ্টের তুলিকায় অঙ্কিত করিতে না পারিলে সফলকাম হওয়া যায় না। উপন্যাসের আখ্যান-ভাগের ভিতর দিয়া চরিত্র বা নীতির কার্য্য চলিবে, জীবনের সমস্যাগুলি ঔপন্যাসিককে সমাধান করিয়া দিতে হইবে: কিন্তু একদেশদর্শী ধর্ম্ম-প্রচারকের ন্যায় মতবাদের অজুহাতে লেখক মহাশয়ের সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে এইরূপ দাড়াইতেছে, উপন্যাস চারিত্র নয়। উপন্যাসে চারিত্রের মতগুলির ব্যাখ্যান বা বিবৃতি আমরা চাই

না, —চাই আমরা সমগ্র উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া জীবনের ব্যাখ্যা দেখিতে,—মানবের চিন্তা, কার্য্য ও ভাবের ভিতর নীতির ছাপ দেখিতে। নৈতিক নিয়মবশে যাহাতে কার্য্যগুলি সম্পন্ন হয়, তাহা দেখিতে পাইলেই আমরা ধন্য হইব।"

এক্ষণে আমরা ভ্রমণ-কাহিনী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই। আধুনিক ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ধারণা যে, ইংরাজী ভ্রমণ-কাহিনীর অনুকরণে এ দেশে ভ্রমণ-কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে। এ ধারণার মূলে কিন্তু সত্য আদৌ নাই। প্রাচীনকালে হিন্দু-মুসলমানেরা ধর্ম্মের জন্য তীর্থ ভ্রমণ করিতে যাইতেন, স্বাস্থ্যের জন্য কেহ কখনও যাইতেন না, কারণ তখনকার দিনে সকলের স্বাস্থ্য অটুট থাকিত। প্রাচীন ভক্ত কবি নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'ব্রজ-পরিক্রমা' ও 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা' হইতে এই দুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ত্ব বেশ জানিতে পারা যায়। রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয় ইং ১৮০৯ সালে কাশী পরিক্রম করিয়া মনোজ্ঞ 'কাশী-পরিক্রমা' বর্ণনা করিয়াছেন। কবি বিজয়রাম ১১৮৮ সালে 'তীর্থ-মঙ্গল' গাহিয়াছেন। সেও আজ ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। এগুলি তৎকাল-প্রচলিত রীত্যনুসারে কবিতায় রচিত। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পিতামহ স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সরল ভাষায় তীর্থ-ভ্রমণের রোজনামচা লিখিয়া যান। আমরা ধারণাই করিতে পারি না যে, এরূপভাবে রোজনামচা বাঙ্গলায় সেকালে লিখিত হইয়াছিল। এ পুস্তকে কেবল তীর্থমাহাত্ম্য বা পৌরাণিক স্থান সংস্থানের কথা আলোচিত হয় নাই—ইহাতে "নানা স্থানের সমাজ-চিত্র, লোকচরিত্র, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ইতিকথা ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়" বর্ণিত আছে।

এখন ভ্রমণ-কাহিনী লেখার ভঙ্গীটা একটু পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পাশ্চাত্য জগতে সাহচর্য্য (Laws of Association) নিয়মবশে ভ্রমণ কাহিনী লিখিত হইয়া থাকে। এ পদ্ধতিতে যে-কোন স্থানের বিষয়ে যাহা কিছু জানা প্রয়োজন তাহাই বিবৃত হয়। ইতিহাস, ভূগোল, উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয়, স্থানীয় অধীবাসীদের স্বভাব-চরিত্রের কথা, স্থান, কাল, পাত্র ও ভাবের সাহচর্য্যে মনোরম ভাবে লিখিত হয়। বড় বড় মনীষীদের চিন্তার ধারাও ইহাতে বেশ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত হয়।

এইবার আমরা জীবন-বৃত্ত বা জীবনচরিত সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই। মানুষ হইতে গেলে—প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি তাহা বুঝিতে গেলে কেবল

চরিত্র পাঠ করিলে চলে না। চরিত্র পড়িয়া যদি সর্ব্বথা চরিত্রবান্ হওয়া যাইত,তাহা হইলে নীতিবিদ্যাভিজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতকে চরিত্রহীন দেখিতে হইত না। পুথিগত অধীত বিদ্যাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে, সম্মুখে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া মানস-চক্ষের সম্মুখে রাখা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যোগ্য ব্যক্তির বাস্তব চিত্র। তাঁহাকে যোগ্য ব্যক্তি বলিব, যিনি জ্ঞানে ও কর্ম্মে, দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণে ও ত্যাগে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন—যাঁহার প্রেমানলে ঝাঁপ দিতে মানব-পতঙ্গ ছুটিতে ব্যগ্র—যাঁহার ছায়া-শীতল পাদমূলে বসিলে অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়—যিনি নূতন ভাবের প্রেরণা দিয়া জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেন—যিনি সত্যের সন্ধান বলিয়া দেন। এইরূপ যোগ্য ব্যক্তির জীবন-চরিত বিবৃত করা উচিত। অযোগ্যকে যোগ্যের আসন দিয়া, তাহাদের জীবন-চরিত ব্যাখ্যা করা কিছুতেই উচিত নয়।

বাঙ্গালা দেশে শতকরা যতজন নিরক্ষর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের কোন দেশেই ততজন দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত না হইলে, অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয় না—মানব পশুত্ব হইতে মানবত্বে উপনীত হইতে পারে না। এই জ্ঞানলাভ সাধন-সাপেক্ষ। ভারতে ইংরাজ-আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ইংরাজী ভাষার প্রচলন হইয়াছে। জ্ঞানমার্গে উপনীত হইবার ইহাই এক সময়ে একমাত্র সোপান বলিয়া স্থির হইয়াছিল। এতদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষাকে বাহন করিয়া বিদ্যা দান করা হইত। আশ্চর্য্যের বিষয়, জগতের কোনও দেশে বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান করা হয় না; এরূপ করাও অন্যদেশে সম্ভবপর নয়। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তারা এই উপায়কে এতদিন ছাত্রদিগের অন্তর্নিহিত শক্তিবিকাশের চরম পন্থা বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। সে দিনের কথা মনে পড়ে, যে দিন কুশাগ্রবুদ্ধি দূরদর্শী স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষায় পঠন-প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্রাহ্য হইয়াছিল। আর আজ মনীষী স্যর আশুতোষের অদম্য চেষ্টায় ও যত্নে আমার মাতৃভাষার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে হইয়াছে। যদিও এম-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, মাতৃ-ভাষার শিক্ষার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মগুলি এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা—বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে যতদিন না চলিবে,

ততদিন দেশের মঙ্গল হইবে না। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা সময়সাপেক্ষ। জ্ঞানান্বেষণার্থী বিদ্যার্থীকে অকারণ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয়। উচ্চশিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করা একে দুরূহ, তাহার উপর ভাষা-বিভ্রাটে অধিকতর কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তাদের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষা যাহাতে মাতৃভাষায় দান করা হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া দিন। অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি হইবে।

আধুনিক নারী-জাগরণের দিনে দেশে স্ত্রীশিক্ষা কি ভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধেও দেশবাসীকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। আজকাল স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কেহ আর সন্দিহান নন,—তবে তাহা কি ভাবে চলিবে, তাহাই বিচার্য্য। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সহিত আমরাও বলি,—"শত দোষ স্বীকার করিয়াও আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। ইহাতে পৃথিবীর কি উপকার বা অপকার হয়, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে অক্ষম হইলেও—এইটুকু বলিতে পারি যে, সাহিত্য ও শিল্পকলা পুরুষের ন্যায় রমণীর পক্ষেও অতি সুখের সামগ্রী, অতি আদরের বস্তু। তাহাতে যে কত অবসরের নিশ্চিন্ত আরাম, কত নির্জ্জনতার নিষ্কণ্টক সঙ্গী, কত নবরাজ্যের চিরোন্মুক্ত দ্বার, কত উচ্চাকাঙ্ক্ষার নীরব প্ররোচক, কত সুখদুঃখের মমতাপূর্ণ বন্ধু, কত মাধুর্য্যের অমৃত প্রস্রবণ—তাহা যিনি জানিয়াছেন, তিনি কেন না ইচ্ছা করিবেন যে, সকল নারীই সেই সুধারস পান করুক;—করিয়া তাহাদের নারীত্ব মধুরতর, গভীরতর, উচ্চতর, উদারতর, স্নিগ্ধতর হউক।"

বাঙ্গালা ভাষার প্রসারকল্পে আর একটী কথা বলিতে চাই। পূর্ব্বে ধর্ম্মাধিকরণে উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন ছিল। কালে উর্দ্দু ভাষার স্থান বাঙ্গালা ভাষাই গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে সুদূর মফঃস্বলেও বাঙ্গালার স্থান ইংরাজী ভাষা গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ হইতে দেওয়া কোন মতে উচিত নয়। বাঙ্গালী হাকিমদের নিকট ইংরাজীতে সওয়াল-জবাব করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। বাদী-প্রতিবাদী, সাক্ষী-সাবুদ, উকিল ও হাকিমেরা যে ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করেন, পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়া যে ভাষায় প্রথম তাঁহারা বাক্যোচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই মাতৃভাষা কি এত দীনা যে, ইংরাজীতে না বলিলে বক্তব্য বিষয় বুঝান যায় না? জেলার ইংরাজ হাকিমদিগকেও শুনিতে পাই, এদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া আসিতে হয়। তবে তাঁহাদের নিকটেই বা

বাঙ্গালা ভাষা চলিবে না কেন ? অবশ্য আইনের পারিভাষিক শব্দগুলি (legal terms) ইংরাজীতে বলিলে ক্ষতি নাই, কারণ এখন পর্য্যন্তও সর্ব্ববিষয়ের পারিভাষিক শব্দ বাহির হয় নাই। আমি আপনাদিগের নিকট ও বাঙ্গালার 'বার লাইব্রেরী'গুলির উকীল মহাশয়দের নিকট অনুরোধ করি, এ বিষয়ে তাঁহারা অবহিত হউন—ভাষার প্রসারকল্পে সহায়তা করুন।

সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদি এখন আমাদের দেশের শক্তিস্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সংবাদ-পত্রের আলোচনার উপর লোকে আর নাসিকা কুঞ্চিত করেন না: তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় লইয়া সাধারণে এখন আলোচনা করিয়া সত্যের পথে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করেন। এই শক্তির অপব্যবহার করা যে উচিত নয় তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আর আমি কিছু বলিতে চাই না; বলিবার সামর্থ্যই বা কোথায় ? বঙ্গবাণীর সেবা করিবার জন্য আপনাদের সম্মুখে যে দণ্ডায়মান হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট। তাহার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ। যখন সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির আহ্বান আমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন আমি শয্যাশায়ী—অনন্ত-পথের যাত্রী। আশা ছিল না যে, এ যাত্রা রক্ষা পাইব। ভগবানের কৃপায় ও আপনাদের শুভ-কামনায় ধীরে ধীরে সুস্থ হইলাম বটে, কিন্তু লিখিবার পড়িবার পূর্ব্ব সামর্থ্য এখন পর্য্যন্ত ফিরিয়া পাই নাই।

সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, মনের কথা মনের মত করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিতাম না। যাঁহাদের চরণোপান্তে বসিয়া ভাষা-জননীর সেবা-মন্ত্রের উপদেশ লাভ করিয়াছিলাম, যে সকল সহোদরাধিক স্নেহপরায়ণ সেবকবৃন্দের সাহায্যে সেই সেবাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, তাঁহারা বঙ্গভাষা সেবার জন্য যে উৎসাহপূর্ণ অক্লান্ত আকাঙ্ক্ষার হোমাগ্নিশিখা জ্বালিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দিনে দিনে অল্পে অল্পে আলোকসম্পাতশূন্য ধূমপুঞ্জে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে,—এখন সকল দিক্ হইতেই এক মর্ম্মন্তুদ হাহাকার কেবল একটী কথাই নিরন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে,—"তে হি নো দিবসা গতাঃ।" এমন দিনে এমন অবস্থায় জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, আপনাদিগকে কি বলিব,—কি শুনাইব,—তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া স্থির করিতে পারিলাম না। কথা অপেক্ষা দীন নয়নের সজল দৃষ্টিপাতই সেবকের আবেদন অধিক পরিস্ফুট করিয়া থাকে। আমি সেই সেবকের মতই আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এক যাচ্ঞা আপনাদের কাছে, আর এক যাচ্ঞা জননী বঙ্গবাণীর কাছে করিতেছি।

আপনাদের কাছে যাচ্ঞা এই যে,—আপনারা বঙ্গসাহিত্যকে তৃণের ন্যায় স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দিবেন না।—ইহার গতি নির্দ্দেশ করুন, রীতি নির্দ্দেশ করুন, নীতি সংস্থাপন করুন। ভাষাজননীর কাছে যাচ্ঞা এই যে,—

"জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনা মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটী অমল-কমল চরণে স্থান।"

দর্শন-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ মহাশয়ের

অভিভাষণ

জ্ঞানের উন্মেষ হইতেই মানুষ সত্যের সন্ধানে ফিরিতেছে। মানুষের চেষ্টা কোনও অনির্দ্দেশ্য প্রেরণার ফলে সর্ব্বদাই সত্যকে ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমরা যাহা জানি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করি; যাহা জানি, তাহাও ভাল করিয়া জানিবার জন্য ব্যগ্র হই। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ প্রতি-নিয়ত আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে এবং প্রতিনিয়ত আমরা কিছু না কিছু জানিতে পারিতেছি। এই সকলের সন্নিকর্ষ হইতে যে জ্ঞান-লাভ হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। চক্ষুর দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই শুধু প্রত্যক্ষ নহে; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা, শ্রবণ, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকেও প্রত্যক্ষ বলা হয়; যদিও তাহাতে অক্ষি বা চক্ষুর ব্যাপার কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়-গণের দ্বারা, যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার প্রায় দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ চক্ষুর সাধ্য। শুধু তাহাই নহে, চক্ষুঘটিত জ্ঞান অন্যান্য ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুস্পষ্ট, সুদূরব্যাপী ও বিশ্বস্ত। সাধারণ দৃষ্টিতে অনুমানাদির তুলনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষাকৃত অবিসংবাদিত, সেই জন্যই ইন্দ্রিয়-গোচর জ্ঞান মাত্রকেই প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজিতেও observation শব্দটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞান মাত্রে প্রযুক্ত হয়।

'দর্শন' শব্দের অর্থও জ্ঞান লাভ করা। সত্যের সাক্ষাৎকারের নাম দর্শন। সে সত্যের স্বরূপ যাহাই হউক না, যে জ্ঞানে তাহা প্রতিফলিত হয় তাহা শ্রেষ্ঠ

জ্ঞান। সত্যের প্রকাশ কবিকল্পনার বিষয় নহে, তর্কজালের দ্বারা রচিত কোনও মতবাদ মাত্র নহে। সত্য যখন কাহারও চিত্রপটে প্রতিফলিত হয়, তখন তাহা সমস্ত আশঙ্কা-সংশয়ের অন্ধকাররাশি বিনাশ করিয়া আলোকের মত, জ্যোতির মত, সূর্য্যের মত প্রকাশিত হয়।

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।- ছান্দোগ্য। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ।—মুণ্ডক।

সেই জন্য যাঁহারা সত্যের উপলব্ধি করিতেন তাঁহাদিগকে এদেশে ঋষি বা মন্ত্রের দ্রষ্টা বলা হইত; ইয়ুরোপে বলিত "Seer." সেই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধিকে 'দর্শন' বলা হয়।

Philosophy অর্থে 'দর্শন' শব্দটি আমাদের দেশে খুব প্রাচীন নহে। কিন্তু সত্যের সাক্ষাৎকার যে, প্রাকৃত দৃষ্টিরই মত, ইহা আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন ধারণা। তত্ত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়সাধ্য নহে, তাই উপনিষদ্ বলেন আত্মা দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন।

মনোঽস্য দিব্যং চক্ষুঃ

ইহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় জ্ঞানযোগী মহাদেবের তৃতীয় নয়ন কল্পিত হইয়াছিল। সেই জ্ঞান-নয়নের জ্যোতিঃ অগ্নিজ্বলনের ন্যায় মদনকে ভস্ম করিয়াছিল। জ্ঞান বিনা কামকে ভস্ম করিতে পারে এরূপ সাধ্য আর কিছুরই নাই।

তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে দর্শন শব্দের প্রয়োগ আমরা শ্রুতিতে দেখিতে পাই,—

আত্মা বারে দ্রষ্টব্যো শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ।

আত্মাকে দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, ধারণা করিতে হইবে এবং ধ্যান করিতে হইবে।

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয়ঃ এতে দর্শনহেতবঃ॥

উপরোক্ত প্রাচীন শ্রুতি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, দর্শন শব্দের দ্যোতনা প্রাচীন কাল হইতেই কোন্ দিকে রহিয়াছে। উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ হইতেও আমরা এই অর্থই প্রাপ্ত হই। আত্মা চিৎস্বভাব বা চৈতন্যময়। চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের উপলব্ধি প্রসিদ্ধ। চক্ষু শরীরের অংশ মাত্র, সুতরাং জড়ের ধর্ম্মবিশিষ্ট। সুতরাং চক্ষুর ব্যাপার যে দর্শন, তাহা আত্মাতে

প্রযুক্ত হইবে কি প্রকারে? আত্মদর্শন একটি অসাধারণ ব্যাপার হইলেও; ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট ইহাই পরম সত্য বলিয়া উপপন্ন হইয়াছিল।

প্রাচীন কালে তত্ত্ব-জ্ঞানকে 'বিদ্যা' বলিয়া উল্লেখ করা হইত। বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। আমরা এখনও তত্ত্ববিদ্যা, খনিজ বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতি শব্দ কখনও কখনও ব্যবহার করিয়া থাকি। জ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা আছে যথা, আন্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি ইত্যাদি। জ্ঞানের মূল কাণ্ডের নাম বেদ। যাহাতে পরমতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাই বেদ। আধুনিক ভাষায় পারিভাষিকভাবে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, সম্যক্‌জ্ঞান প্রভৃতি শব্দের প্রচলনের চেষ্টাও দেখিতে পাওয়া যায়।

দর্শন ও PHILOSOPHY

Philosophy শব্দটি আমাদের অনেকের নিকট সুপরিচিত। ইহার মূল অবশ্য গ্রীস দেশে। হিরোডোটস্ লিখিয়াছেন যে, ক্রিসাস্ (Croesus) এবং সোলন (Solon) এর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ক্রিসাস বলিতেছেন যে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই সোলনের নাম শ্রুত আছেন। সোলন যে, জ্ঞানের লোভে (Philosophising) নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন তাহাও তিনি শুনিয়াছেন। লোকে দেশ পর্য্যটন করিতে যায় ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে, অর্থের অথবা চাকরীর চেষ্টায়। সুতরাং কেহ যখন শুধু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিদেশ পর্য্যটনে যায়, তখন তাহাকে নিঃস্বার্থ বা অহৈতুকী জ্ঞান-লিপ্সাপ্রণোদিত বলিতে হয়। ইহাই পাশ্চাত্য জগতে ফিলজফি কথার মূল। কথিত আছে, পাইথাগোরস্ আপনাকে ফিলজফস্ অর্থাৎ জ্ঞানানুরাগী বলিতেন, 'জ্ঞানী' এ কথা বলিতেন না। এই কথাটির মধ্যে একটু তাৎপর্য্য আছে—তত্ত্বজ্ঞান যে নিঃস্বার্থতা-প্রণোদিত, ইহাই ঐ পারিভাষিক শব্দটির ইতিহাসে রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের 'দর্শন' শাস্ত্র ঠিক নিঃস্বার্থতা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, প্রচলিত দর্শনগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রায়শঃ তাহাদের জন্ম পরমার্থ চিন্তন হইতে। পূর্ব্বমীমাংসা ব্যতীত অন্য দর্শন গুলির উদ্দেশ্য যে মোক্ষ-লাভ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। মোক্ষকেই প্রাচীন ঋষিগণ পরম পুরুষার্থ বা 'নিঃশ্রেয়স' (অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর কিছু শ্রেয়ঃ নাই summum bonum) এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ

একটি পারমার্থিক বা পারলৌকিক প্রয়োজন থাকায় অস্মদ্দেশে দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্ম-তত্ত্বের বা theology র সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, ইউরোপের মধ্যযুগে যেরূপ তদ্দেশীয় দার্শনিক বিদ্যা ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া Church এর কবলে পড়িয়াছিল, আমাদের দেশেও সেইরূপ ভাবে দর্শন-শাস্ত্রের স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা ধর্ম্মমতের দ্বারা খর্ব্ব হইয়াছিল। এই জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে আমাদের দেশের দর্শনকে ফিলজফি পদের যোগ্য মনে করেন না। পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিক চিন্তা অব্যাহত স্বৈরগতি। ভগবত্তত্ত্ব, পরলোকবাদ, শ্রুতি স্মৃতির দ্বারা তাহার প্রণালী সীমাবদ্ধ নহে।

আমাদের দেশে দার্শনিক বিদ্যার যে স্বাধীনতা ছিল না, তাহা আমি স্বীকার করি না। লোকায়ত, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তত্তৎকালের মানসিক অবস্থার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, যে সকল দার্শনিক মত আমরা সর্ব্বদর্শন সংগ্রহেই প্রাপ্ত হই, তাহা বহুকালের গবেষণার ফল। তাহাদের ক্রম-বিবর্ত্তন অল্প দিনে হয় নাই। ঐ সকল মত গঠিত হইবার জন্য যে দীর্ঘ কালের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা নহে; সমাজ-দেহে রাষ্ট্রনীতিতে ও ধর্ম্মজগতেও যে নানা ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য

যাহা হউক, জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভ করিবার যে চেষ্টা, সত্যের জন্য সত্য উদ্ধার করিবার যে সঙ্কল্প, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ। পাশ্চাত্য জগতের তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় এই যে নিঃস্বার্থতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অশেষ কল্যাণের আকর হইয়াছিল। ইহার ফলে সে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবাধ স্রোত প্রবাহিত হইয়া মানব মনকে উন্নতির পথে বহুদূর লইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের যে মোক্ষবাদ, ইহারও অনুকূলে বলিবার অনেক কথা আছে। আমরা মুখে যাহাই বলি না কেন, আদর্শ হিসাবে যেরূপই সিদ্ধান্ত করি না কেন, কার্য্যক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত যে, জ্ঞানলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার অন্তরালে কোনও না কোনও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রত্যেক কার্য্যই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত। জ্ঞানলাভ ক্রিয়ারও একটী উদ্দেশ্য থাকিবেই। অর্থোপার্জ্জনই হউক, আর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাদিই হউক, কোনও না কোনও উদ্দেশ্য বর্ত্তমান থাকিবেই।

বেকন্ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, জ্ঞানই শক্তি। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাই জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার শক্তি জন্মে। সেই শিক্ষার ফলে আজ মানব নিত্য নূতন জ্ঞানের আহরণে নিযুক্ত আছে এবং এই জ্ঞানের দ্বারা সে প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে সংযত, নিয়ত করিয়া নিজের কার্য্যে লাগাইতেছে। বিদ্যুৎকে দিয়া সে কল চালাইতেছে, পাখা ঘুরাইতেছে, বাতি জ্বালাইতেছে, দূর দূরান্তরে সংবাদ বহন করাইতেছে। জল বায়ু পৃথিবী মন্থন করিয়া নব নব নিয়মের আবিষ্কার দ্বারা সে জগতের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আর্য্য ঋষিগণ এই সকল জাগতিক ব্যাপার হইতে তত্ত্বজ্ঞানকে বিযুক্ত করিয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য কোনও হীন, তুচ্ছ, সংকীর্ণ স্বার্থ-প্রাপ্তি নহে। মানব-জীবনের চরম কল্যাণ, আত্মার পরম শ্রেয়োলাভের চেষ্টায় 'দর্শন'কে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলেন। পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ করিয়া যে তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তা-প্রণালী পরম পুরুষার্থে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাও কম নিঃস্বার্থতার পরিচায়ক নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহারা মোক্ষ বা মুক্তি বলিতে কি বুঝিতেন। হিন্দু-দিগের মুখ্য ষড়্‌দর্শন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত। মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্যযোগ। মীমাংসা-দর্শন পূর্ব্ব এবং উত্তর অথবা কর্ম্মমীমাংসা এবং তত্ত্বমীমাংসা এই দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মমীমাংসায় আত্মতত্ত্বের উপদেশ পাওয়া যায় না। স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য কি প্রকারে যাগযজ্ঞ করিতে হয়, তাহারই উপদেশ জৈমিনির ধর্ম্ম-মীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসায় দেখিতে পাওয়া যায়। জৈমিনির মতে কর্ম্মই ফল প্রদানে সমর্থ। ইহার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না।* এই পূর্ব্বমীমাংসা ভিন্ন সকল দার্শনিক তত্ত্বের লক্ষ্য—মোক্ষ—মুক্তি বা অপবর্গ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

> সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মোক্ষধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।
> সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সদোষাঃ স্যুঃ পুনরাবৃত্তিকারকাঃ॥

---

* যদিও লৌগাক্ষি ভাস্কর 'পূর্ব্বমীমাংসার্থ সংগ্রহে' বলেন—

ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তু নিঃশ্রেয়সহেতুঃ

অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে, তাহাই নিঃশ্রেয়স—অর্থাৎ মোক্ষের কারণ হয়।

ন্যায় মতে—

অথ শাস্ত্রস্য পরমং প্রয়োজনমপবর্গঃ।

মোক্ষই পরম প্রয়োজন।

কণাদ বলেন :—

যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।

ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্কর মিশ্র বলেন—

"নিঃশ্রেয়সমাত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ"

বিবৃতিকার বলেন—

"নিঃশ্রেয়সং মোক্ষঃ"

সাংখ্য বলেন—

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি।

কৈবল্য অর্থে—মোক্ষ। মোক্ষই পুরুষার্থ।

পুরুষার্থো মোক্ষস্তদর্থং জ্ঞানমিদং গুহ্যং রহস্যং
শ্রীকপিলর্ষিণা সমাখ্যাতম্।—(গৌড়পাদ ভাষ্য)

যোগদর্শনের লক্ষ্যও মোক্ষ বা কৈবল্য। অভ্যাসের দ্বারা দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়ে অর্থাৎ ধন-রত্ন-স্ত্রীপরিজন এবং স্বর্গাদি কাম্য বিষয়ে বিতৃষ্ণ ব্যক্তি পুরুষ-দর্শন অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞান-প্রসাদে পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন। তখন সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-শূন্য গুণের প্রলয় হইয়া আত্মা কেবলমাত্র চিৎশক্তিতে নিয়ত অধিষ্ঠান করেন।

পুরুষার্থ-শূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতি শক্তিরিতি।—(যোগসূত্র—কৈবল্যপাদ)

তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের নিকট পার্থিব কোনও সুখই দাঁড়াইতে পারে না।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্।

সুতরাং তৃষ্ণাক্ষয়-জনিত বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিলে, লোক জীবন্মুক্ত হইতে পারে। শ্রুতিও বলেন—"জীবন্নেব বিদ্বান্ মুক্তো ভবতি।"

বেদান্ত আত্মাকে মোক্ষ-ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন --

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।—(বেদান্তসূত্র ১ম পাদ ৭ম সূত্র)

তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো এই রূপ শ্রুতি হইতে আত্মার চিৎস্বরূপতা ও অর্থ সংপৎস্যে ইত্যাদি হইতে প্রারব্ধ ক্ষয়ানন্তর মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়।

অতএব আমাদের প্রধান আর্য্যদর্শনগুলিকে মোক্ষদর্শন বলিলেও অন্যায় হয় না। বৌদ্ধ-দর্শনে যে নির্ব্বাণের আদর্শ আছে, তাহাও এই মোক্ষেরই নামান্তর বলিয়া আমি মনে করি। অনাদিবাসনাসন্তান নিবৃত্ত হইলে নির্ব্বাণ লাভ হয়।

রাগাদিজ্ঞানসন্তানবাসনাচ্ছেদসম্ভবা।
চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

(সর্ব্বদর্শন)

আর্হত দর্শনেও মোক্ষমার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে। সকল প্রকার কর্ম্ম নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে আত্মা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম হইতেও যাবতীয় ক্লেশ. কর্ম্ম হইতেই সংসার; জন্মমৃত্যু ক্লেশের নামান্তর। জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম ভস্মসাৎ হইলে আত্মা ঘৃতাভিবর্দ্ধিত হোমানলশিখার ন্যায় উর্দ্ধে প্রয়াণ করে।

সংসারের অনিত্যতা

এক্ষণে এই যে ভারতীয় দর্শনের একান্ত কামনার বিষয় মুক্তি বা মোক্ষ, ইহার স্বরূপ কি? দর্শনগুলির মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে যতই মতভেদ থাক, একটি বিষয়ে বেশ সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়,—সংসারের অনিত্যতা। এই অনিত্যতা-বুদ্ধি পাশ্চাত্য দর্শনেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটো ইহার একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তাঁহার মতে এই দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা, অসার, ছায়াবাজী মাত্র। সত্যলোক জগতের পরপারে কোথাও অছে। এই মরজগতে বসিয়া আমরা কখন কখনও সেই ধ্রুবলোকের কিছু কিছু আস্বাদ পাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় প্রাচ্যে এই অনিত্যতাবাদ এবং দুঃখাত্মকতাবাদ যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, পাশ্চাত্য দেশে সেরূপ নহে। এ দেশের কাব্যে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে সর্ব্বত্র এই অসারত্ব-বাদ প্রসার লাভ করিয়াছে। তাই মোক্ষের জন্য এত আগ্রহ, এত ব্যাকুলতা।

আমরা মুক্তির প্রয়াসী। কিন্তু মুক্তি চায় কে, না যে পরাধীন। আমরা এমন কোন পরাধীনতা ক্লেশ সহ্য করিতেছি যাহা হইতে ছুটি পাইবার জন্য এরূপ দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা! সাংখ্য বলিবেন, জগতের দুঃখরাশি আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, আমরা ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাই। এমন ভাবে পরিত্রাণ চাই যে, আর কখনও সে দুঃখ আমাদিগকে গ্রাস করিতে না পারে। দুঃখই বন্ধের হেতু।

পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞো হি ইষ্টাপূর্ত্তকারী কামোপহতমনা বধ্যতে।—(তত্ত্বকৌমুদী)

কাম্যেঽকাম্যে চ কর্ম্মণি দুঃখাৎ দুঃখং ভবতি।—(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

যাহা আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, তাহাও দুঃখ। সুখভোগোঽপি দুঃখভোগ এব। সুতরাং দুঃখ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাই চিন্তনীয়। এই দুঃখ-নিবৃত্তি-বাদ সাংখ্য ও যোগদর্শনের মূল কথা।

জৈন দার্শনিকেরাও বলেন—

কর্ম্মণো নিরসনাদাত্যন্তিক কর্ম্মমোক্ষণং মোক্ষঃ।

(সর্ব্বদর্শন)

কর্ম্ম ত্যাগ করিতে করিতে যখন আত্যন্তিক কর্ম্মক্ষয় হয়, তখন তাহাকে মোক্ষ বলে। কারণ কর্ম্ম করিলেই অবশ্য তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।

কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত সকলই ক্ষয়শীল। শ্রুতি বলেন "যথেহ কর্ম্মচিতো লোক ক্ষীয়তে এবমেবাঽমুত্র পুণ্যচিতো লোক ক্ষীয়তে।"

সাংখ্য ও জৈন দর্শন হইতে আমরা কর্ম্ম সম্বন্ধে একটি জটিল দার্শনিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হই। জন্ম মৃত্যু সকলই কর্ম্মের অধীন। কর্ম্ম হইতেই দুঃখ, সুতরাং কর্ম্মের বিনাশ সাধন করাই দর্শনের প্রতিপাদ্য। ন্যায় দর্শনও বলেন—ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।

কর্ম্ম না থাকিলে ফলও থাকে না। জৈনগণ বলেন যে, কর্ম্মের গতিকে আত্মাতে একপ্রকার শক্তি জন্মে, যাহার ফলে আত্মা এই সংসারে পুনঃ পুনঃ সেই সেই কর্ম্মানুযায়ী শরীর ধারণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। আর্হত সিদ্ধগণ সেই জন্য সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম পরিহার করাই চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কর্ম্ম কেবল বাহিরের ব্যাপার। শরীরের বা মাংসপেশীর কতকগুলি বিক্ষেপের নাম কর্ম্ম বইত নয়। সেই বিক্ষেপের মূলে যে আভ্যন্তর ব্যাপার আছে,

তাহার বিনাশ না হইলে শুধু কর্ম্মের বিনাশে কি হইবে? জৈনেরা সেই জন্য বলেন, চিত্ত-শুদ্ধি করিতে হইবে। কর্ম্মের বীজমাত্রও যেন না থাকিতে পারে, এমন করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা তিনটি সাধনের নাম করিলেন, তাহাদিগকে ত্রিরত্ন বলে।

সম্যগদর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ

(সর্ব্বদর্শন)

অর্থাৎ মোক্ষের তিনটি পন্থা সম্যক্ দর্শন, জ্ঞান এবং সচ্চরিত্রতা সম্যক্ দর্শন জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বুদ্ধি ও বোধির মধ্যে যে প্রভেদ, জৈনদের মতে সম্যক্ দর্শন ও জ্ঞানের মধ্যে সেই প্রভেদ। একটি Intuition অপরটি Knowledge, উভয়ই সাধন সাপেক্ষ। একটির দ্বারা মনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্ত্বের স্ফুরণ হয়, অপরটি যুক্তি তর্ক আলোচনার দ্বারা সিদ্ধ হয়।

বৌদ্ধেরা কর্ম্ম অপেক্ষা বাসনার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্ হইলেন! বাসনাই কর্ম্মের মূল। কর্ম্ম সংসারের মূল। যাবতীয় কর্ম্ম পরম্পরার মধ্য দিয়া একটী বাসনার সূত্র লম্বিত রহিয়াছে। সেই বাসনার সূত্র যতদিন বিনষ্ট না হইবে ততদিন পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হইবে। নিও-প্লেটোনিক দার্শনিকগণের মধ্যেও এইরূপ একটি তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; অপরিতৃপ্ত বাসনাই সমস্ত পৃথিবীর মূল কারণ—

The whole world that we know arose and took its shapes from,desire—Plotinus

সুতরাং বাসনাকে বর্জ্জন করিলেই ভাবোচ্ছেদ হইবে বা নির্ব্বাণ লাভ হইবে, ইহাই বৌদ্ধদিগের অভিপ্রায়।

সংকল্পং বর্জ্জয়েৎ তস্মাৎ সর্ব্বানর্থকারণম্।

—বিবেকচূড়ামণি।

এই আদর্শ যতই সুসঙ্গত হউক না কেন, প্রাকৃত জগতে ইহা অতি কঠিন ব্যাপার। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে মানব কোনও না কোন কর্ম্ম করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াহীনতার নামই মৃত্যু। সুতরাং কর্ম্ম বা বাসনার অতীত হওয়া আদৌ সম্ভবপর কি না, তাহাই সন্দেহ। এই জন্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সমন্বয় করিলেন—কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। কর্ম্ম করিতে হইবে; কর্ম্ম না করিলে চলিবে কেন? কর্ম্মের দ্বারা যে জগৎসংসার চলিতেছে। তোমার

নিজের জন্যও যদি কর্ম্মের আবশ্যকতা নাও থাকে, তাহা হইলে লোক-শিক্ষার জন্য তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। কারণ—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ।

কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহা পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কাণ্ট্ বলিলেন, আসক্তি-শূন্য না হইতে পারিলে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় না। মমতা স্নেহ, প্রণয়, স্বার্থ প্রভৃতির প্ররোচনায় যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা হীন কর্ম্ম। সুতরাং এ সকল বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধি হইতেই কর্ম্ম করিলে তাহারই চারিত্রনৈতিক উৎকর্ষ স্বীকৃত হইবে। গীতা কিন্তু এরূপ অনাসক্তির কথা বলেন নাই। কর্ম্ম করিব অথচ দয়া শ্রদ্ধা সমবেদনা প্রভৃতি হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি যাহা কর্ত্তব্যসাধনের প্রেরণা জন্মায়, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিব, ইহা সম্ভব নহে।

বিষয়েষ্বরতির্জন্তোর্মরুভূমৌ লতা যথা।— (যোগবাশিষ্ঠ)

গীতা কিন্তু ফলে অনাসক্তিই উপদেশ করিয়াছেন। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। কর্ম্মফলে যে আসক্তি, তাহাই বাসনার বীজ। আমার যাহাতে অভিরুচি, আমার যাহাতে আবেশ, আমার যাহাতে সুখ, এমন কিছু করিবার জন্যই প্রত্যেক ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা। সেই জন্য ভগবান্ বলিলেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।

ফলের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিজেকে বিযুক্ত করিতে হইলে সমস্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। যাহা কিছু করিলাম, তাহা সমস্তই শ্রীবিষ্ণুচরণে সমর্পিতমস্তু এই বুদ্ধি লইয়া করিতে হইবে। আমি স্বর্গ চাই না, ধন জন পুত্র কলত্র চাই না, ইন্দ্রিয় সুখ চাই না, সংসারের কোনও বস্তুতেই আমার কামনা নাই, শুধু "তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ মঙ্গলময় স্বামী।" আমি যেমন অবস্থায় থাকি না কেন, সুখে থাকি বা দুঃখেই থাকি, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ যে যোনিতেই আমার জন্ম হউক না, শুধু কামনা এই :—

"মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে"। (বিদ্যাপতি)

তোমার প্রসঙ্গে যেন মতি থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন, যতদিন কোনও পার্থিব কামনা লইয়া ভগবান্‌কে ভজনা করিবে, সে ভজনা কাম নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। কেবল তাঁহারই প্রীতির জন্য তাঁহাকে ভজনা করার নাম প্রেম।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

যতদিন ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি থাকে, ততদিন প্রেম অঙ্কুরিত হইতে পারে না। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি এক চার্ব্বাক ব্যতীত ভারতীয় সকল দর্শন-শাস্ত্র কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানে ও সহজাত-সংস্কার-বলে দেহতেই আত্মাভিমান হয়। অস্থিমাংসবসার সমষ্টি নানা সুখদুঃখব্যাধি-জরার আকর। যতকাল এই শরীর আত্ম-পদবাচ্য হয়, যত কাল ইন্দ্রিয় বিষয়ে 'আমার' এই অভিমান দূরীভূত না হয়, ততকাল জ্ঞানের আলোক হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না। তত কাল মুক্তি হয় না—জ্ঞান বিনা মোক্ষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? সেই জন্য বেদান্ত শাস্ত্র অবিদ্যা দূর করিয়া দিবার উপদেশ করিয়াছেন। অবিদ্যা দূর হইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না:

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। (ব্রহ্মসূত্র)

অবিদ্যার ধর্ম্ম

অবিদ্যা কাহাকে বলে?

অজ্ঞানমবিদ্যাঽহম্মতিরিত্যমরঃ। অমর-কোষে অবিদ্যার পর্য্যায় অজ্ঞান এবং অহম্মতি। অহম্মতির অর্থ যাহা আত্মা নহে তাহাতে আত্মবুদ্ধি;

"অহমিত্যস্য মননমহম্মতিরনাত্মন্যাত্মাভিমানাৎ।" এই যে অনাত্মবিষয়ে আত্মজ্ঞানরূপ ভ্রম বা অবিদ্যা ইহা বুদ্ধির ধর্ম্ম।

বিপর্য্যয়োঽজ্ঞানমবিদ্যা সা বুদ্ধিধর্ম্মঃ। (তত্ত্ব-কৌমুদী)

এই বিপর্য্যয় বা জ্ঞানের বৈপরীত্য হইতে আত্মার বন্ধন হয়।

বিপর্য্যয়াদতত্ত্বজ্ঞানাদিষ্যতে বন্ধঃ (তত্ত্ব-কৌমুদী)। ন্যায়সূত্রবৃত্তি বিপর্য্যয়ের অপর পর্য্যায় দিয়াছেন মিথ্যাজ্ঞান; অবিদ্যা শুধু জ্ঞানের অভাব নহে; পরন্তু অযথার্থ-নিশ্চয়তারূপ মিথ্যাজ্ঞান।

"বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানাপরপর্য্যায়োঽযথার্থনিশ্চয়ঃ।" অবিদ্যা যে বিদ্যা-বিরোধিজ্ঞানান্তরম্ একথা যোগশাস্ত্রের ব্যাস-ভাষ্যও স্বীকার করেন।

জৈনেরাও বলেন—

মিথ্যাজ্ঞানাবিরতি কষায়াঃ বন্ধহেতবঃ (বাচকাচার্য্য) মিথ্যাজ্ঞান, অবিরতি বা আসক্তি এবং পাপলোকের বন্ধনহেতু হয়।

এ স্থলে খৃষ্টানদিগের মুক্তিবাদ সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। কারণ খ্রীষ্টানেরাও মোক্ষবাদী। পাপবশে আত্মার অধঃপতন ঘটিয়াছে। মানবের আদিম অবস্থা হইতেই এই পাপ আশ্রয় করিয়াছে। সেই পাপের ফলে মানবাত্মার স্বর্গচ্যুতি হইয়াছে। সুতরাং পাপ হইতে মুক্ত হওয়াই আত্মার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। খ্রীষ্টানদিগের এই মুমুক্ষুত্বের সহিত হিন্দুদিগের মুমুক্ষুত্বের আংশিক সামঞ্জস্য থাকিলেও পার্থক্য যথেষ্ট। খৃষ্টানের মুক্তিবাদ আগন্তুক এক পাপোৎপত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কোনও দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রোথিত নহে। গ্রীস দেশের এক রহস্যবাদে (Orphic mysteries) আত্মার পতনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ রহস্যবাদ হইতেই এই মৌলিক পাপের কল্পনা আসিয়া থাকিবে। যাহা হউক, খ্রীষ্টানেরা মনে করেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা কিছুকাল দেহ-বিযুক্ত অবস্থায় বাস করে; পরে বিচারের দিন সমাগত হইলে আত্মা ভগবানের দরবারে হাজির হয়। সেখানে করুণাবতার যীশুখৃষ্ট তাহাদের সকলের পাপ নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিলে পরে মানবাত্মা মুক্ত হয়, এবং অনন্তকাল ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করিয়া অপার সুখের অধিকারী হয়। খৃষ্টানেরা পাপ ও মৃত্যু এই দুই তত্ত্বের অতি নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তদুপরি মুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাপ হইতে মৃত্যু এবং মৃত্যুর দ্বার দিয়া অমৃতে প্রবেশ—ইহাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল কথা।

> Like the hand which ends a dream
> Death with the might of his sunbeam
> Touches the flesh and the Soul awakes.
>
> —Browning.

খৃষ্টীয় এই মুক্তিবাদের মধ্যে আমরা প্রাচ্য আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই না। আত্মার দর্শন-স্বরূপতা ইহার প্রতিপাদ্য নহে। ইহাতে পাপতত্ত্ব আছে, অজ্ঞান-তত্ত্ব নাই। দ্বৈত-জ্ঞান আছে, অদ্বৈত-সিদ্ধি নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, আর্হত দর্শনে বন্ধের হেতু কষায় বা পাপ বলিয়া বর্ণিত আছে। "নিজ্জর" না হইলে নির্ব্বাণ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানবাদী যোগদর্শনকার বলিয়াছেন, চরিত্র-শুদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার যোগ্যতা হয় না

সত্ত্বশুদ্ধি সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয় জয়াত্মদর্শন-যোগ্যত্বানি চ। (সাধনপাদ—৪১)

শুচিতা হইতে সত্ত্বশুদ্ধি, অর্থাৎ মনের নির্ম্মলতা; মনের নির্ম্মলতা হইতে আনন্দ; তাহা হইতে একাগ্রতা; তাহা হইতে ইন্দ্রিয়জয় এবং ইন্দ্রিয়জয় হইতে বুদ্ধিসত্ত্বের আত্মদর্শনযোগ্য শক্তি হয়। রামানুজ দর্শনেও ঐ একই কথা:—

আহারশুদ্ধেঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধ্যা ধ্রুবা স্মৃতিঃ (সর্ব্বদর্শন)

এবং ধ্রুব স্মৃতি মোক্ষের উপায় বলিয়া কথিত হয়।

হিন্দুদর্শনের বৈশিষ্ট্য আত্মতত্ত্বে

খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মতত্ত্বে চরিত্র-নীতির স্থান অতি উচ্চে। মৃত্যুর চিন্তা হইতেই পরলোকের নানা প্রকার কল্পনা উদ্ভূত হইয়াছে। পরলোকবাদ ধর্ম্মতত্ত্বের প্রাণ-স্বরূপ। শোপেন্‌হাওয়ার বলেন "মৃত্যুই সমস্ত দর্শন-শাস্ত্রের জননী।" মৃত্যুকে বরণ করিতে কেহ চাহে না। সকলেই জীবনের প্রয়াসী; যোগশাস্ত্র ইহাকে অভিনিবেশ বলিয়াছেন—স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ। (সাধন-পাদ)—আমার যেন মৃত্যু কখনও না হয়, আমি যেন চিরকাল থাকি, ইহা প্রাণীমাত্রেই কামনা করে। ইহারই নাম অভিনিবেশ। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ইহাকেই বলেন—Instinct of self-preservation. ইহকালে আয়ুর বৃদ্ধি এবং পরকালে যাহাতে অনন্ত জীবনলাভ হয়, তাহার জন্য সকলেই সচেষ্ট। এই দুই কাল রক্ষা করিয়া যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনিই চতুর।

"যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।" সুতরাং মৃত্যুর চিন্তা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেও বিরল নহে।

গৃহীত্বা ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।

পাশ্চাত্য দেশে চরিত্র-নীতি এবং ধর্ম্মতত্ত্বের সম্যক্ অনুশীলন হইলেও, এ দেশের বৈশিষ্ট্য আত্মতত্ত্বে। দার্শনিক যুগের প্রথম হইতেই ভারতবর্ষে আত্মতত্ত্বের অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দর্শনে কদাচিৎ কখনও আত্মা ও মনের পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মা ও মন একই পদার্থ এইরূপ ভাবই সচরাচর দেখা যায়। মন হিন্দুদর্শনে ইন্দ্রিয় মাত্র। চক্ষু যেরূপ দর্শনের ইন্দ্রিয় বা সাধন, মন সেইরূপ জ্ঞানের ইন্দ্রিয় বা সাধন। সেই জন্য ইহাকে অন্তঃকরণ বলা হয়। জড়ের ধর্ম্মও কিছু কিছু ইহাতে আছে। ইহা বিনাশী (ন্যায়-মতে নহে)। পাশ্চাত্য দর্শন মনকে আত্মার সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া, আত্মতত্ত্বের দিকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের দর্পণস্বরূপ। ইহাতে এমন এক বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যাহার ফলে

মানবাত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। ভৌতিক উপাদানের দ্বারা ইহা গঠিত হইতে পারে না। জড়-জগতের ধর্ম্ম ইহাতে সম্ভব হয় না। জড়-জগতের যে পরিণাম তাহাও ইহার পক্ষে অপ্রয়োজ্য। জগতের ছায়াবাজির মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য, যাহাকে আশ্রয় করিলে সেই ধ্রুবজ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হয়। উহা পার্থিব জ্যোতিঃ নহে।

That light which never was on land or sea.

যিনি এই আলোক দেখিতে পান, তাঁহার নিকট সকল অজানাই জানা হইয়া যায়। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিজ্ঞাতং ভবতি। কারণ জড়-জগতের বিরাট্ গ্রন্থ তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকে, অধ্যাত্ম-জগতের নিগূঢ় তত্ত্বও তিনি দেখিবার অধিকারী ; তাঁহার—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ,
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

কিন্তু এই আত্মতত্ত্ব জানা বড়ই কঠিন। আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ। অণোরণীয়ান্। আরাগ্রমাত্র পুরুষোহন্যরাত্মা চেতনাবেদিতব্যঃ। চৈতন্যৈকরস পদার্থ আত্মা ইহাকে চৈতন্য দিয়া জানিতে পারা যায়। একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে, পরমাত্মাকে জানিলে আত্মা ও পরমাত্মার ভেদ থাকে না। The mind that wishes to behold God must itself become God. (Philo the Jew) ; আমাদের শাস্ত্রেও আছে, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে, সমানাধিকরণ্য আছে। ইহা গ্রীক্ দার্শনিকেরও মত। জীবাত্মাকে তাঁহারাও বস্তুতঃ ভগবানের অংশস্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিতেন। গীতা বলেন :—

মমৈবাংশো জীবলোকো জীবভূতঃ সনাতনঃ।

নিও-প্লেটনিক দার্শনিকেরা বলিতেন, জীবাত্মা সকল ভগবানের স্বরূপ হইতে বিস্ফুলিঙ্গের মত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং সেই কেন্দ্রের দিকে যাইতেই তাহাদের নিয়ত চেষ্টা। (Plotinus).

উপনিষৎ বলেন—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে বেদাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। (বৃহদারণ্যক)

শুধু যে জীবজগৎ, তাহা নহে। সমস্ত ভূতবর্গ সেই পরমাত্মা হইতে সত্তা লাভ করিয়াছে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব। (গীতা)

সূত্রে নিবদ্ধ মণিগণের ন্যায় সমস্ত বস্তু আমাতে গ্রথিত। সেই জন্য মধ্বাচার্য্য নিখিল-বস্তু-তন্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—এক স্ব-তন্ত্র; অপর অ-স্বতন্ত্র।

স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দ্দোষোঽশেষসদ্‌গুণঃ॥

(সর্ব্বদর্শন)

পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজা ভগবান্‌কে causa sui আখ্যা দিয়াছেন। causa sui অর্থ স্ব-তন্ত্র, স্বয়ং সিদ্ধ; কারণান্তরানপেক্ষ। স্পিনোজার মতে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর এক, বিশ্বেশ্বর হইতে বিশ্বের কোনও পৃথক্ সত্তা নাই। সমস্ত সত্তাই ঈশ্বরে পর্য্যবসিত। নিও-হেগেলিয়ান্ সম্প্রদায় বলেন, পরিণামশীল প্রকৃতির মধ্যে যে বিবর্ত্তন, তাহা সেই বিশ্ব-সত্তারই ক্রম-বিকাশ। এবং সেই বিশ্ব-সত্তা মানবাত্মায় এক চরম অধ্যাত্মতত্ত্বে পরিণতি লাভ করে; সকল ভূতের চিৎশক্তি তাঁহার আশ্রয়স্থল। সেই চিৎশক্তির পূর্ণ বিকাশ মানবের আত্মার চরম অভিব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

God is a Being with whom the human spirit is identical, in the sense that He is all which the human spirit is capable of becoming. (Green's Prolegomena)

মানবাত্মার চরম অভিব্যক্তি যে ভগবান্, এরূপ তত্ত্বের সহিত বেদান্তের সাদৃশ্য আপাত দৃষ্টিতে অতি নিকট বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যতক্ষণ আত্মা কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারা না যায়, ততক্ষণ এরূপ তত্ত্বে আমাদের তৃপ্তি হয় না। আত্মা যে এই সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক অভিনব বস্তু; ইহা যে ভৌতিক উপাদানের দ্বারা বিরচিত হইতে পারে না, এ তত্ত্বটি যেমন এদেশের মনীষিগণ বুঝিয়াছিলেন, তেমন আর কোনও দেশেই নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা হয়ত বলিবেন যে, আদিম বর্ব্বর জাতিদিগের animism হইতে আত্মা নামক পৃথক্ সত্তার কল্পনা আমাদের দর্শনে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু ঐটুকু বুঝিলেই আত্মতত্ত্বের কিছুই বুঝা হইল না। আত্মা কি? আমাদের ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মা বলিব, মনকে আত্মা বলিব, না চিৎশক্তিকে আত্মা বলিব?

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ (গীতা)

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অপেক্ষা প্রকাশশীল বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। নিশ্চয়াত্মিকা বলিয়া বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ। এবং বুদ্ধিরও উপরে যিনি সাক্ষি স্বরূপে অবস্থিতি করেন তিনিই আত্মা এই আত্মাই অন্বেষ্টব্য৷ এই আত্মাই মোক্ষধর্ম্মশীল। এই আত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব। এই আত্মার সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে—

প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময় আত্মা।

এই আত্মাই "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি শ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারই সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতা বলিয়াছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

উপনিষদের যুগ হইতে এই তত্ত্ব ভারতবর্ষে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের Cultural individuality বা শিক্ষাসাধনাগত বৈশিষ্ট্য যদি কোথাও থাকে তবে তাহা এইখানে। আমি বস্তুতন্ত্রতাকে উপেক্ষা করিতে বলিতেছি না। ইউরোপ বস্তুতন্ত্রের সাধনায় অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে। আরও নব নব আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমকিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। আমাদেরও নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করিলে, বিজ্ঞানের সাধনাকে অবহেলা করিলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হইবে, দারিদ্র্য ভোগ করিতে হইবে, পরমার্থ চিন্তনেও সুতরাং ব্যাঘাত পড়িবে৷ আমাদের শাস্ত্রেও বলিয়াছেন—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যতে

কঠোর কর্ম্ম সাধন করিয়াও বল সঞ্চয় করিতে হইবে।

কর্ম্মণা যেন কেনাপি মৃদুনা দারুণেন বা।

উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ॥

এরিষ্টটল্‌ও বলিয়াছেন যে, পূর্ণ মানবত্ব লাভ করিতে হইলে, অভাব দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হওয়া চাই।

কেহ কেহ মনে করেন, আমাদের শাস্ত্রের আত্মতত্ত্ব ও মোক্ষবাদ আমাদের দর্শনালোচনার স্রোত নিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই সকল তত্ত্বের ফলে আমরা এমন একটি সীমানায় উপনীত হইয়াছি যে, আর আমাদের পক্ষে নূতন কোনও

ভাবোন্মেষ হওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখবাদ ও অদ্বৈত-তত্ত্ব জন্মান্তর ও কর্ম্মফল আমাদের মনে কেবল অবসাদ আনিয়া দিয়াছে, জাড্য জন্মাইয়াছে, আমাদের জাতীয় উদ্বোধন দূরে অপসারিত করিয়াছে। এ কথা যে সত্য নহে তাহা ভারতবর্ষের দর্শন-চর্চ্চার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দুঃখবাদ সত্ত্বেও যে দার্শনিক মতবাদের অপ্রাচুর্য্য ঘটে নাই, তাহা নানা সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইতে জানিতে পারা যায়।

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ আমাদের জীবনে বর্ত্তমানে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এক সময়ে তাহারই পার্শ্বে, সাংখ্য ও যোগ পূর্ণ প্রতিষ্ঠার দাবী করিত। ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, বেদান্ত বলিতেছেন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম; সাংখ্য বলিতেছেন ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ নাই; বৈশেষিক দর্শনেও ঈশ্বর প্রসঙ্গ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। তদবচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্। এই সূত্রে তৎ শব্দের অর্থ 'ব্রহ্ম' হইতে পারে, কিন্তু 'ধর্ম্ম হওয়াই অধিকতর সম্ভব।

সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরতত্ত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন প্রমাণাভাবে। পাতঞ্জলদর্শনকে সময়ে সময়ে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। কিন্তু এক সময়ে যোগদর্শন ঈশ্বরকে তেমন আমল দেন নাই, এ কথাও কেহ কেহ বলেন। আমরা যে যোগসূত্র জানি তাহাতে ঈশ্বরবাদ অবশ্য সুপরিস্ফুট রহিয়াছে। কিন্তু ইহা বলিতেই হইবে যে, সমস্ত যোগদর্শনের সঙ্গে উহার ঈশ্বরতত্ত্বের সম্বন্ধ খুব বেশী নহে। ইহার জন্যই হয় ত ঐ ধারণা লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতে যোগদর্শন সেশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব অপেক্ষা অতিরিক্ত এক তত্ত্ব যোগদর্শনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বরবাদ যোগদর্শনের ষড়্বিংশ-তত্ত্ব। যাহা হউক, সাংখ্য এবং যোগদর্শনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যাই আবহমান কাল ভারতের চিন্তার ধারাকে আকৃষ্ট করে নাই।

বৌদ্ধমতও এদেশের একটি অতি প্রাচীন মত। ইহার মূল উপনিষদে মিলিলেও ইহা নিশ্চিত যে, বৌদ্ধেরা হিন্দুদর্শনের অচলয়াতন ভেদ করিয়া একটি স্বতন্ত্র পন্থা আপনাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং যাগযজ্ঞের ফলদায়কত্ব অস্বীকার করিয়াও বৌদ্ধমত যে ভারতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। পরে মহাযানী বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্ম্মমত হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৌদ্ধমতকে হিন্দুদিগের নিকট

উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই হইতেই নাস্তিক দর্শনের স্রষ্টা ঈশ্বর-বাদের বিরোধী তথাগত বুদ্ধ হিন্দুদিগের দশাবতারের মধ্যে স্থান পাইলেন। হিন্দু সমাজ, হিন্দুধর্ম্ম এবং সমস্ত দার্শনিক মতবাদ আর একবার ওলট-পালট হইয়া গেল।

অনেকে মনে করেন যে, বেদান্তের মায়াবাদ বৌদ্ধদর্শন হইতে আসিয়াছে এবং সাংখ্যমতও বৌদ্ধমত হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল। অতি দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্র সমূহের ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। সুতরাং, সাংখ্য হইতে বৌদ্ধমত অথবা বৌদ্ধ হইতে সাংখ্যমত আসিয়াছে—এ সমস্যার কোন সমাধান সম্ভবপর নহে। এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, সাংখ্য ও বৌদ্ধদের মধ্যে সাদৃশ্য খুব বেশী। সাংখ্যের সংস্কার এবং সংস্কার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ বৌদ্ধদর্শনেও আছে। সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদ এবং বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকবাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য সুপরিস্ফুট। সাংখ্য এবং বৌদ্ধ উভয়েই নিরীশ্বরবাদী এবং নির্ব্বাণের পথিক। বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ ধ্বংসবাদ নহে। উভয় মতবাদের মধ্যে এই সকল বিষয়ে সাদৃশ্য সত্ত্বেও বৈষম্যও অনেক। সাংখ্যের পুরুষবাদের চিহ্ন বৌদ্ধ মতে পাওয়া যায় না। সাংখ্য ত্রিগুণতত্ত্বেরও কোনও নিদর্শন বৌদ্ধ মতে নাই।

দর্শনে সমন্বয়-প্রবৃত্তি

এই সকল দর্শনের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, চিন্তার রাজ্যে ভারতীয়দিগের গতানুগতিকতা স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে কালোপযোগী দার্শনিকতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সহিত ছন্দ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। আধুনিক সময়ে সমন্বয়ের চেষ্টা অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হয়। সমন্বয়ের যুগ দর্শনের ইতিহাসে নিষ্ফলযুগ বলিয়া উল্লিখিত হয়। অনেকে মনে করেন, ভারতের নানা দার্শনিক মত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। অবশ্য ইহা স্থির যে, সত্য এক ; ভিন্ন ভিন্ন দর্শন সেই সত্যকে জানিবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মাত্র। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশী বলিলে অন্যায় হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দর্শন সত্যসাধনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরমাত্র, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে চেষ্টা তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না ; সত্য সন্ধানের মূল্য তাহাতে থাকে না। সেই জন্য কেহ কেহ যখন বলেন যে, ন্যায় বৈশেষিকের

প্রথম সোপান আরোহণ করিয়া, তার পরে সাংখ্য যোগের মধ্য দিয়া আমরা মীমাংসার অদ্বয়-তত্ত্বে উপনীত হই, তখন আমার মনে হয় যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত দার্শনিক স্বাধীনতার হানিকর। এই সকল দর্শনের মধ্যে যে মিল আছে, তাহাকে বড় করিয়া দেখিলে প্রত্যেক দর্শনের বৈশিষ্ট্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সত্যানুসন্ধানের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অন্তরায় আর কিছুই নহে। যুগধর্ম্মানুসারে, মানব মনের পরিণতি অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপ্রবাহ পৃথিবীর বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। চিন্তাশীলের পক্ষে, ঐতিহাসিকের পক্ষে, সেই প্রবাহের প্রত্যেকটি তরঙ্গের মূল্য আছে। পূর্ব্বমীমাংসার কর্ম্মকাণ্ডের পরে উত্তর-মীমাংসার অদ্বৈত-তত্ত্বের আবির্ভাব মানবমনের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বমীমংসার নিরীশ্বরবাদ উত্তর-মীমাংসার ব্রহ্মবাদে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে অর্থাৎ একের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপে যোগদর্শনের দ্বারা সাংখ্যের এবং ন্যায়ের দ্বারা বৈশেষিকের পাদপূরণ করিয়া লইতে হইবে; আমার বক্তব্য এই যে, ইহাতে দার্শনিক চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়।

বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, ইতিহাসের নানা পটপরিবর্ত্তনের মধ্যেও দার্শনিক চিন্তার স্রোত অবাধে বহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম অশোকের সময় মাথা তুলিয়া উঠিল, দিগ্‌দিগন্তে তাহার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িতে লাগিল। বাঙ্গালাদেশ তাহাকে বাধা দিবারও চেষ্টা করিয়াছিল, বাঙ্গালার রাজা শশাঙ্ক বোধিদ্রুম পর্য্যন্ত পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে পাল-রাজগণের সময়ে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে বঙ্গভূমি ভাসিয়া গেল, তখন নানা-স্থানে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইল, ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বৌদ্ধগণ বাঙ্গালীর দেবতাকে বোধিসত্ত্বের পার্শ্বে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। বঙ্গের অনেক স্থলে এখনও বৌদ্ধ কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র সমতটবাসী ছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পূর্ব্ববঙ্গের লোক। ইনি ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন।

তান্ত্রিকতার যুগ

বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের নিকট যখন অবাধে ঋণগ্রহণ করিতে লাগিল, তখন নানাধর্ম্মমত ও দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি হইল। আমার বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে

তান্ত্রিক মত বিস্তার এই সময় হইতে হয়। যদিও প্রবুদ্ধ ভারতের একজন লেখক কর্ত্তৃক তন্ত্রের উৎপত্তি উপনিষৎ ও বৌদ্ধযুগের মধ্যস্থলে কল্পিত হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহা সুনিশ্চিত যে তন্ত্রের প্রচার বঙ্গদেশে বৌদ্ধপ্রভাববিস্তারের পরেই হইয়াছিল। পালরাজগণ বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন। মহাযান বৌদ্ধেরা দেব-দেবীকে নির্ব্বাসন করেন নাই। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের * প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন বুদ্ধশক্তি চণ্ডিকাদেবীর উপাসনা করিতেন। (আদ্যের গম্ভীরা)। মাধ্যমিক দল হইতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিকাশ সাধিত হয়। এই সম্প্রদায় "কালচক্রযান." "মন্ত্রযান" ও "বজ্রযান" নামেও অভিহিত হয়। তন্ত্রের উপাস্য দেবতা "শক্তি"। এই আদ্যাশক্তি স্ত্রীও নহেন পুরুষও নহেন। এই শক্তি একাধারে বিদ্যা ও অবিদ্যা, পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া। ইহা দ্বৈতও নহে, অদ্বৈতও নহে।

অদ্বৈতং কেচিদ্‌বদন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতাঃ।

(কুলার্ণব-তন্ত্র)

বিশ্বের মূল কারণ, বীজ এই দ্বৈতাদ্বৈতরহিত শক্তি। এই শক্তি হইতেই মায়া, ইহা হইতেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, ইহা হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই শক্তি ভুবনেশ্বরীরূপে, জগন্মোহিনীরূপে জগৎ প্রসব করিতেছেন, আবার মহাকালী ভৈরবীরূপে সমস্ত সংহার করিতেছেন। তন্ত্রের মূল-তত্ত্ব সংক্ষেপে ইহাই। বেদান্তের অদ্বৈত-তত্ত্ব ও বৌদ্ধ শূন্যবাদের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যের ত্রিগুণতত্ত্ব এবং যোগ-দর্শনের সাধন-তত্ত্ব ইহার প্রধান উপজীব্য। অধিকাংশ তন্ত্রশাস্ত্রের সংস্কৃত ভাষা দেখিলে তাহা আধুনিক এবং বাঙ্গালী সাধকের লিখিত বলিয়া অনুমান হয়। বঙ্গদেশে তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা ইহা বলিলেই উপলব্ধি হইবে যে, এক্ষণে এরূপ কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় বঙ্গীয় হিন্দু-দিগের মধ্যে নাই, যাহা তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবিত নহে। Arthur Avalon's Introduction to Principles of Tantra দ্রষ্টব্য)। এ স্থলে সহজিয়া

* মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন বলিয়া এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম মাধ্যমিক হইয়াছিল।

অতো .ভাবাভাবান্তদ্বয়রহিতত্বাৎ সর্ব্বস্বভাবানুৎপত্তিলক্ষণা শূন্যতা মধ্যমা প্রতিপন্মধ্যমো মার্গ ইত্যুচ্যতে (Indian Logic—Dr. S. C. Acharaya)

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতি।

(বৌদ্ধগান ও দোহা)

মতের উল্লেখ করাও কর্ত্তব্য মনে করি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রসাদে মধ্যযুগে নাঢ় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ মতবাদ চলিতেছিল, তাহা আমরা "বৌদ্ধগান ও দোহা" হইতে জানিতে পারি। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই সহজিয়া সাধন বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা অন্য স্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মমত একটি উচ্চ দার্শনিক ভিত্তিতে নিহিত। তাহার সহিত সহজিয়াদের মহাসুখবাদের আদৌ মিল নাই। সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতের একটী অবান্তর ফল। তন্ত্রের পঞ্চ ম-কার সাধন হইতে সহজিয়ারা পঞ্চমটি বিশেষভাবে সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যে এইভাবের তান্ত্রিকতা গৃহীত হইয়াছিল তাহা নহে। অনেক স্থলে শক্তিবাদের সহিত বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মবাদের সুপবিত্র মিলনও দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায়, রাজা রামমোহন রায় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তান্ত্রিকতার শেষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। তিনি ভোগসুখ একেবারে বর্জ্জন করিবার উপদেশ দিতেন। নিজের জীবনেও কামিনীকাঞ্চনের সংস্রব এককালে ত্যাগ করিয়াছিলেন। রমণী দেখিলেই তিনি জগন্মাতার প্রতিকৃতি দেখিয়া মা মা বলিয়া অজ্ঞান হইতেন। নিদ্রিত অবস্থায়ও কোনও ধাতুদ্রব্য তাঁহার গায়ে ঠেকিলে শরীর আপনা আপনি সংকুচিত হইত। তান্ত্রিক শক্তি আরাধনার সহিত বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব মিলন।

নব্যন্যায়

মুসলমান রাজত্বকালে নবদ্বীপ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া উঠে। বিদ্যা শিক্ষার জন্য দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র এখানে আসিয়া ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। বাঙ্গালীর অদ্ভুত কৃতিত্ব নব্যন্যায়ে৷ কাউয়েল সাহেব বলিতেন। এই সকল তর্কশাস্ত্রের জটিলতায় ইউরোপীয়দিগের মাথা ঝিম ঝিম করে। বাস্তবিক ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চা পারিভাষিকতার কত উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নব্য-ন্যায়ের প্রবর্ত্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায় বাঙ্গালী ছিলেন কি না বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণির তত্ত্বদীধিতি নাম্নী টীকা একজন বাঙ্গালীরই লেখা। দীধিতির রচয়িতা রঘুনাথ শিরোমণি "পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি" নবদ্বীপে হরিঘোষের গোয়ালে নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করেন। ইঁহার পরেও কয়েকজন অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন দার্শনিক বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের

মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। কণাদ তর্কবাগীশ চিন্তামণির একখানি টীকা রচনা করেন, তাহার নাম তত্ত্বটীকা। কণাদ তর্কবাগীশ এই অঞ্চলের লোক ছিলেন। আমাদের জেলার (যশোর) অধিবাসী গঙ্গাধর কবিরাজের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু চিকিৎসা-বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন না; নানাশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া তিনি উপনিষৎ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতির ভাষ্য রচনা করেন। ইংরেজ রাজত্বকালের দার্শনিক ইতিহাস যিনি লিখিবেন, তিনি গঙ্গাধর কবিরাজ ও রাজা রামমোহন রায়ের নাম সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিতে বাধ্য। রাজা রামমোহন বেদান্তের ভাষ্য বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন এবং বেদান্তসার নামে একখানি সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তুলনা-মূলক ধর্ম্মমতের সমালোচনা মহাত্মা রামমোহনই প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি সকল ধর্ম্মের সার-মর্ম্মগুলি সংকলন করিয়া উপনিষৎ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা রাজা রামমোহনের অন্যতম কীর্ত্তি।

বৈষ্ণব দর্শন

রঘুনাথ শিরোমণি যে সময়ে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হয়েন, সেই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। কলিযুগের অধঃপতিত জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচার করেন। প্রেমের সহিত নাম করিলেই জীবের গতি হয়, এই তত্ত্ব তিনি আপামর সাধারণে বিলাইলেন এবং নাম প্রেমের মালা গাঁথিয়া আচণ্ডালের গলে দোলাইলেন। তাঁহার পরিকরগণ হরিনামের তরঙ্গে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই মধ্যে একজন শ্রীমদভিরাম গোস্বামী এই রাধানগরে গোপীনাথের শ্রীপাট স্থাপনা করিয়াছিলেন। অভিরাম গোপাল ব্রজলীলায় শ্রীদাম সখা ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

অভিরাম মুখ্য শাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল শাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী॥

ব্রজভাবে ভাবিত হইয়া তিনি মুরলী বাদনের ইচ্ছা করিলেন, এবং অন্য কিছু না পাইয়া এক গাছি ষোল শাঙ্গের কাষ্ঠকে বাঁশী করিয়া বাজাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাধক নির্জ্জনে তাঁহার বাঞ্ছিতকে লইয়া এই নির্জ্জন পল্লীতে অবশিষ্ট জীবন "নাম" করিয়া কাটাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন,

তিনিই এই শ্রীপাটের সান্নিধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া এই স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্তও নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। নবাব সরকারের চাকরী ত্যাগ করিয়া তিনি এই স্থানে আসিয়া নাম জপ করিয়া কাটাইতেন। রামমোহনের মাতা ফুল ঠাকুরাণী নিজে সম্মার্জ্জনীর দ্বারা শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মন্দির মার্জ্জনা করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহাকে বিষয়-কর্ম্ম দেখিতে হইত, শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ সম্মুখে রাখিয়া বিষয়-কর্ম্ম দেখিতেন। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এইরূপভাবে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীরূপগোস্বামী এই ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; পরে উহা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবগোস্বামী কর্ত্তৃক ষট্-সন্দর্ভে ও শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবতোষণী নামে টীকায় পরিপুষ্টি লাভ করে। ভাগবতের ব্যাখ্যাকর্ত্তা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও পদামৃত-সমুদ্রের সংকলয়িতা শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত দার্শনিক মতবাদের আলোচনা করিলাম, তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, এদেশে দার্শনিক চিন্তার ধারা অব্যাহতভাবে বহিয়া গিয়াছে। এই চিন্তাধারায় আত্মতত্ত্বের নব নব বিকাশ, নব নব অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই আমাদের দেশের জল বায়ু ও প্রকৃতির অনুকূল। ইহা ভারতীয়দিগের বৈশিষ্ট্য। অধুনা দর্শন অপেক্ষা বিজ্ঞানের আদর বেশী। বিজ্ঞান ইহলোকের কল্যাণসাধন করে। অধ্যাত্মতত্ত্ব পরলোকের কল্যাণ লক্ষ্য করে। আজ কাল নগদ মূল্যের আদর বেশী। তাই মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত বলেন যে, অহিংসা—যাহা ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—হিন্দুজাতির রাজনৈতিক অধঃপতনের হেতু। হইতে পারে, আমরা আমাদের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় কিছু উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু সে উদাসীনতা দর্শনের অপরাধ নহে, আমাদের দুর্ভাগ্য। আমি স্বামী বিবেকানন্দের সহিত একমত; তিনি বলিয়াছেন যে, আমাদের যদি পুনরুত্থান হয়, তবে তাহা এই আধ্যাত্ম-বিস্তার ফলেই হইবে। অস্ত্রশস্ত্রের প্রচণ্ডতা অপেক্ষা যদি অধ্যাত্ম বলেই জগৎকে সম্পূর্ণভাবে জয় করা যায়, তাহা হইলে আমাদের এখনও কিছু আশা আছে। কিন্তু চাই সেইরূপ গুরু, যিনি সমাধিপ্রণত হৃদয়ে পরমার্থচিন্তায় নিবিষ্ট হইবেন এবং সেই মৌন গুরুর পার্শ্বে উপসন্ন শিষ্যেরও সমস্ত সংশয় আপনা হইতে দূর হইয়া যাইবে।

ইতিহাস-শাখার সভাপতি
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি
ডক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী

ইতিহাস-শাখার সভাপতি—

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, মহাশয়ের

অভিভাষণ

মূর্ত্তি ও মন্দির

আপনারা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসকার শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের এই রাধানগর অধিবেশনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন। দান-পুণ্যের মত ইতিহাসের আলোচনাও নিজের বাড়ী হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত। রাধানগরের অধিবেশনে হুগলী জেলার ইতিহাসের আলোচনার সুব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসকার অপেক্ষা এরূপ আলোচনা পরিচালনের যোগ্যতর ব্যক্তির সহিত আমি পরিচিত নহি। প্রবীণ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং বন্ধুবর কুমার শরৎকুমার রায়ের সহিত যদিও আমার বরেন্দ্রের কিছু কিছু পুরাকীর্ত্তিচিহ্ন দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, রাঢ়ের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞান আমার মোটেই নাই, কাজেই এই পদগ্রহণের যোগ্যতাও নাই। তবে যে দয়ার পরবশ হইয়া আপনারা আমাকে এই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই দয়ার পরবশ হইয়া আপনারা আমার ভুল ভ্রান্তিও মার্জ্জনা করিবেন এই ভরসায়, আমার প্রতি এই উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, আমি এই পদ গ্রহণে সাহস করিয়াছি।

আজ আমরা যে মহাপুরুষের জন্মস্থানে সম্মিলিত হইয়াছি, তিনি একটী উন্নত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু, এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান গুরু। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মান্দোলনের ফলে এদেশে সাকার-নিরাকার উপাসনা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা প্রায় শতবর্ষ কাল প্রবলভাবে চলিয়া এখন অনেকটা নীরব হইয়াছে। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দে সাকার উপাসনার আর এক দিক্ লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিহাসের উপাদান এবং কমনীয় কলার নিদর্শনের হিসাবে এখন প্রাচীন দেবমূর্ত্তির বিচার হইতেছে। প্রাচীন মূর্ত্তিসংগ্রহে, প্রাচীন মূর্ত্তির বিবরণসঙ্কলনে এবং কমনীয়তাবিচারে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের দেশবাসীরা ইদানীং বিশেষ উদ্যম-উৎসাহ দেখাইতেছেন। আপাততঃ আমারও

ব্যবসা মূর্ত্তিসংগ্রহ এবং মূর্ত্তিবিচার। সুতারং অদ্য প্রাচীন ভারতের মূর্ত্তি ও মন্দির সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিব।

(১)

ঋগ্বেদ সংহিতা লইয়া ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের প্রারম্ভ। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতির সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তির জন্য ঋগ্বেদের মন্ত্র রচিত হইয়াছিল। যজ্ঞানুষ্ঠানে মূর্ত্তির কোন স্থান নাই, কিন্তু মন্দিরের স্থানে অগ্নি-গৃহের প্রয়োজন ছিল। বৈদিক যুগে সকল শ্রেণীর লোকই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন এমন কোন প্রমাণ নাই। যজ্ঞে অনধিকারী কোন কোন জাতির মধ্যে তখন মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত থাকাও সম্ভব। কিন্তু বৈদিক যুগের মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধীয় কোন নিদর্শন-বস্তু এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। সুতরাং বৈদিক যুগের ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা যায় না। অবশ্যই অনেক বেদমন্ত্রে অনেক বৈদিক দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা আছে। কিন্তু নিদর্শন-বস্তু ব্যতীত শিল্পের বিচার হইতে পারে না।

বৈদিক যুগের শেষভাগ, উপনিষদের সময় হইতে হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের দুইটী আপাত বিরোধী লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়; একটী লক্ষণ উন্নতিশীলতা, আর একটী লক্ষণ রক্ষণশীলতা। বেদের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ ভাগে স্বর্গ কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠানের এবং তপশ্চরণের বিধান আছে। উপনিষদে স্বর্গ কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞান সাধন বিহিত হইয়াছে। উপনিষদে স্বর্গ কামনা নিষিদ্ধ হইলেও যাগযজ্ঞ একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই; চিত্তশুদ্ধির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। এই প্রকার ব্যবস্থা হিন্দুর উন্নতিশীলতার সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীলতার পরিচয়প্রদান করে।

উপনিষদের পর প্রাচ্য ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। উপনিষদের কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি এবং বৌদ্ধধর্ম্মের লক্ষ্যও জন্ম-মরণের হস্ত হইতে মুক্তি। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ জীবাত্মা ও পরমাত্মার (ব্রহ্মের) অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার মত প্রকাশ করেন নাই, পক্ষান্তরে আত্মা আছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা একেবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধের উপদেশের সারকথা, অষ্টাঙ্গ সুনীতি মার্গ অনুসরণ করিলে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মকে নিরীশ্বর সুনীতি পথ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ আদর্শ সত্ত্বেও, উপনিষদের ধর্ম্ম যেমন কর্ম্মের সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারে
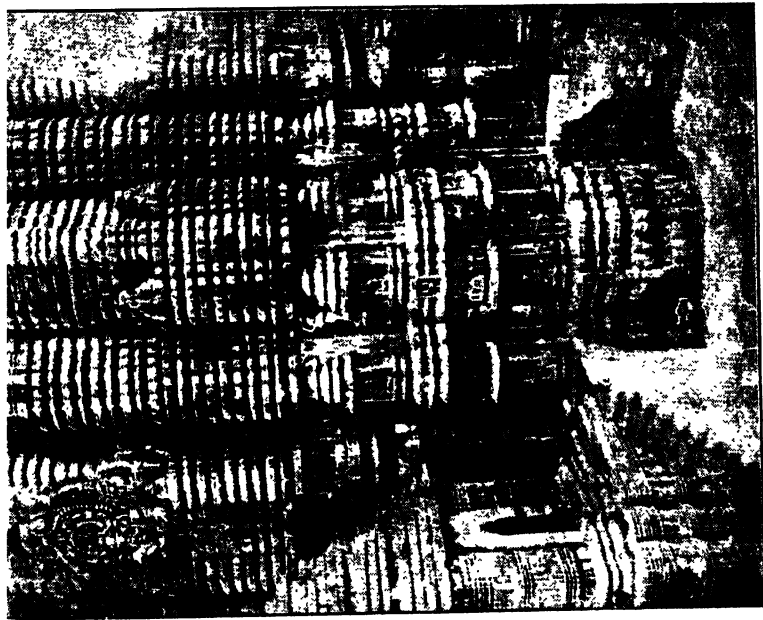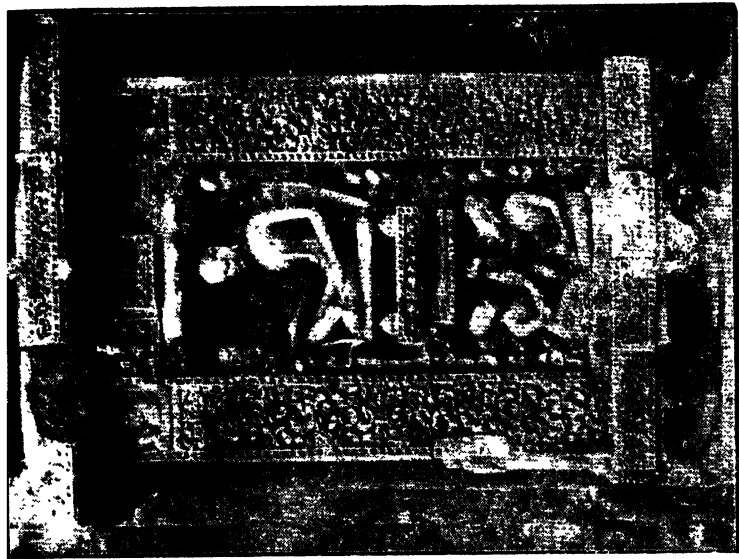
(১) লিঙ্গরাজ-মন্দির, ভুবনেশ্বর

২) লিঙ্গরাজ-মন্দির, ভুবনেশ্বর

নাই, গোড়া হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম ও জড়োপাসনার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ আগমে দেখা যায়, গৌতম বুদ্ধ প্রথমতঃ যে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই মগধে এবং বিদেহে তৎকালে জনসাধারণের মধ্যে বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল না, তখন প্রাধান্য ছিল কোন মৃত মহাপুরুষের চিতাভস্মের উপর প্রতিষ্ঠিত স্তূপের এবং যক্ষ বা যক্ষীর আবাস চৈত্য বৃক্ষের উপাসনায়। যখন বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল তখন আনন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"প্রভো (ভদন্তে)! আমরা-তথাগতের মৃতদেহের কিরূপ সৎকার করিব।"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন—

"হে আনন্দ, তথাগতের শরীর পূজা করিয়া নিজের মোক্ষের বাধা উপস্থিত করিও না। নিজের মোক্ষের চেষ্টায় তুমি আত্মনিয়োগ কর। তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ অনেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং গৃহস্থ আছেন যাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।"

এখানে বুদ্ধদেব ভিক্ষুর পক্ষে শরীর পূজা নিষেধ করিয়াছেন, শরীর পূজাকে মোক্ষের অন্তরায়স্বরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু গৃহস্থেরা যে শরীর পূজা করিবে, এ বিষয়ে যে বিধি-নিষেধের অবকাশ আছে তাহাও তিনি মনে করেন নাই। অবশ্যই আনন্দ বুদ্ধের নিষেধ বাক্য শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, বুদ্ধের দ্বারা ব্যবস্থা করাইয়া লইলেন, চক্রবর্ত্তী রাজার শরীরের ভস্মাবশেষের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া লোকে যেমন তাহার পূজা করিয়া থাকে, বুদ্ধের দেহের ভস্মাবশেষের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তেমনি করিতে হইবে। চৈত্যবৃক্ষের পূজা সম্বন্ধে মহাপরিনির্ব্বাণ-সূত্রে এবং অন্যত্র বৈশালীর লিচ্ছবীগণকে বুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন, তোমরা যদি স্বজাতির মঙ্গল কামনা কর তবে অন্যান্য সৎকর্ম্মের মধ্যে বৈশালীর উপকণ্ঠস্থিত চৈত্যবৃক্ষগুলিকে যথাবিধি পূজা করিও। মহাপরিনির্ব্বাণ-সূত্রে বা অন্যসূত্রে বুদ্ধের বচন ঠিক বিনিবদ্ধ হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে, কিন্তু শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা যে বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের অনতিকাল পরেই স্তূপ পূজা এবং বোধিবৃক্ষরূপে চৈত্যবৃক্ষের পূজার আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারহুতের এবং সাঁচীর স্তূপের বেদিকার (বেড়ার) লিপিমালা তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। এই লিপিমালা পাঠে জানা যায়, যাঁহারা চাঁদা তুলিয়া এই সকল বেড়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী।

বুদ্ধদেব শরীর বা চৈত্যপূজা নিষেধ করিয়া না থাকিলেও প্রতিমার সংস্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং সেই উপদেশ যে অনেকদিন পর্য্যন্ত কতক পরিমাণে প্রতিপালিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। পালি বিনয়পিটকের অন্তর্গত চুল্লবগ্‌গে (ক্ষুদ্রবর্গে) কথিত হইয়াছে, এক সময় বুদ্ধ রাজগৃহ নগরে বেণুবনে বাস করিতেছিলেন এবং ভিক্ষুগণের বাসের জন্য বিহার নির্ম্মিত হইতেছিল। তখন অনাচারপরায়ণ ষট্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্ত্রী-পুরুষের প্রতিভান চিত্র (প্রতিকৃতি) অঙ্কিত করিয়া বিহারের দেওয়াল ভূষিত করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "এ যে ভোগসুখরত গৃহীর মত আচরণ।" বুদ্ধ শুনিতে পাইয়া স্ত্রী-পুরুষের চিত্র অঙ্কণ নিষেধ করিয়া দিলেন এবং বিহারের শোভার জন্য মালা, লতা প্রভৃতি অঙ্কিত করিবার অনুমতি দিলেন। বিনয়পিটকের সুত্তবিভঙ্গে আছে (ভিক্ষুণী বিভঙ্গ, ৪১ পাচিত্তিয়) এক সময় বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীনগরে জেতবনে বাস করিতে-ছিলেন তখন কোশলরাজ প্রসেনজিতের উদ্যানের চিত্রাগারে অনেক মনুষ্যচিত্র (প্রতিভান চিত্র) প্রদর্শিত হইতেছিল, এবং অনেক লোক তাহা দেখিতে যাইতেছিল। এই জনপ্রবাহের সঙ্গে ষট্‌বর্গীয়া ভিক্ষুণীরাও দেখিতে গিয়াছিলেন। অমনি লোকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। শুনিতে পাইয়া বুদ্ধদেব ভিক্ষুণী মাত্রকেই চিত্রাগার দেখিতে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যখন মনুষ্য চিত্র দর্শন বা অঙ্কণ নিষেধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি যে মনুষ্যাকারে গঠিত প্রতিমা পূজাও নিষেধ করিয়াছিলেন, এ কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

(২)

স্তূপের এবং বোধিবৃক্ষের পূজা প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের মলিনতার চিহ্নস্বরূপ মনে হইলেও এই সম্পর্কেই প্রাচীন ভারতে কমনীয় শিল্প অভ্যুদিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। মৌর্য্য সম্রাট্‌ অশোকের সময়ের ভাস্কর্য্য নিদর্শনের মধ্যে অনুশাসন সম্বলিত স্তম্ভের শীর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্তম্ভের সঙ্গে উপাসনার কোনও সম্পর্ক ছিল কি না বলা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে ভাস্কর্য্য-কলার ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রপাত হয় খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দে শুঙ্গ বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, এবং এই শুঙ্গশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দের মধ্যভাগে মধ্যভারতে। সারনাথ, পাটলিপুত্র এবং বিদিশার ভগ্নাবশেষের মধ্যে শুঙ্গশিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কিন্তু এই যুগের প্রধান কীর্ত্তি, ভারহুত স্তূপের বেদিকা ও তোরণ, সাঁচীর প্রাচীন স্তূপত্রয়ের বেদিকা ও তোরণ, বোধগয়ার প্রাচীন বেদিকা এবং উড়িষ্যার উদয়গিরির গুহামন্দিরনিচয়ের কারুকার্য্য। এই সকল বেদিকার এবং তোরণের গাত্রে প্রাসাদ ও কুটীর বা কূটাগার অঙ্কিত দেখিয়া মনে হয় যে, প্রাচীনকালের কুটীরই আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যযুগের বঙ্কিম শিখরসম্পন্ন মন্দিরের মূল আদর্শ। শুঙ্গ-যুগের এই সকল বৌদ্ধ বেদিকার এবং তোরণের গাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যের মধ্যে বুদ্ধের এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। উপাস্য বস্তুর মধ্যে দেবদেবীর প্রতিমা নাই, আছে স্তূপ, চৈত্যবৃক্ষ, বোধিবৃক্ষ এবং নানা প্রকার চিহ্নযুক্ত বেদি। কিন্তু দেবদেবীর যে সকল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহা উপাস্যরূপে অঙ্কিত হয় নাই, বুদ্ধের উপাসকরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং শুঙ্গযুগের ভাস্কর্য্য পরীক্ষা করিলে দুইটী সিদ্ধান্ত মনে উদিত হয়। প্রথম, তৎকালে প্রতিমা-নির্ম্মাণ-রীতি প্রচলিত থাকিলেও প্রতিমা-পূজারীতি বোধ হয় বিশেষ প্রচলিত ছিল না; প্রতিমার পরিবর্ত্তে দেবদেবীর আশ্রয়বৃক্ষ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং মহাপুরুষের শরীরাবশেষ পূজিত হইত।

দ্বিতীয়, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার পৌরাণিক লক্ষণ সকল তখনও পরি-কল্পিত হয় নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নানাশ্রেণীর দেবতার বিবরণ আছে। তন্মধ্যে বেদের ইন্দ্রাদি দেবতা ত্রয়স্ত্রিংশ নামে স্থান লাভ করিয়াছে। শুঙ্গযুগের ভাস্কর্য্যে এই সকল দেবতা মনুষ্যাকৃতি, একটী মস্তক এবং দুইটী হস্তবিশিষ্ট, এবং পুরাণোক্ত বাহনের চিহ্নবিহীন। বৈদিক এবং পৌরাণিক দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের মূর্ত্তি বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে পুনঃপুনঃ অঙ্কিত হইয়াছে। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত প্রথম দেখা যায় শক-কুষাণ যুগের মথুরার একখানি বৌদ্ধ চিত্র-ফলকে, এবং ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখাদি পৌরাণিক লক্ষণ অঙ্কিত হইয়াছে মধ্যযুগের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে। পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত মূর্ত্তির মধ্যে শুঙ্গভাস্কর্য্যে একমাত্র দেখা যায় শ্রীমূর্ত্তি। শ্রী "পদ্মস্থা পদ্মহস্তা চ গজোৎক্ষিপ্তঘটপ্লুতা" আকারে শুঙ্গযুগের বেদিকায় এবং তোরণে পুনঃপুনঃ অঙ্কিত হইয়াছে। ফুশে বলেন, এই মূর্ত্তি এখনও শ্রীমূর্ত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ইহা খুব সম্ভব গৌতম বুদ্ধের জন্মের সাঙ্কেতিক চিত্র। ফুশের সিদ্ধান্ত স্বীকার করা কঠিন। কিন্তু শুঙ্গযুগের শ্রীর মূর্ত্তিতে পৌরাণিক লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার প্রতিমায় পৌরাণিক লক্ষণের অভাব সপ্রমাণ করে, শুঙ্গযুগে এই সকল প্রধান দেবতার মূর্ত্তিকল্পনায় পৌরাণিক লক্ষণ প্রবেশ লাভ করে নাই। শুঙ্গরাজগণের

সমসময়ের পঞ্চালের একজন রাজা অগ্নিমিত্রের মুদ্রার অগ্নিমূর্ত্তি এই কথার সাক্ষ্য দান করে। অগ্নিমিত্রের মুদ্রায় অগ্নির মূর্ত্তির পার্শ্বে অগ্নির পৌরাণিক বাহনের কোন চিহ্ন নাই. এবং স্কন্ধের উপর মস্তকের স্থানে প্রজ্বলিত হুতাশন শিখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

শুঙ্গযুগের বৌদ্ধ ভাস্কার্য্যে দেবদেবীর মূর্ত্তি উপাস্য দেবতার আকারে গঠিত হয় নাই ; এই সকল মূর্ত্তিতে দেবভাবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। এই সকল মূর্ত্তি মনুষ্যাকৃতি এবং মানুষভাব পূর্ণ। শুঙ্গশিল্পীর অঙ্কিত মনুষ্যাকৃতি স্বভাব সঙ্গত নহে। শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। বস্তুর রসোদ্দীপনী শক্তির নাম সৌন্দর্য্য। মনুষ্যের আকৃতি স্বভাবতঃ সুন্দর। শুঙ্গশিল্পিগণের মনুষ্যাকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে ঔদাসীন্য-দোষের বিষয় বিবেচিত হইতে পারে: কিন্তু এক্ষেত্রে এইরূপ দোষারোপ সঙ্গত নহে। স্বভাবতঃ যাহা সুন্দর তাহার অবিকৃত প্রতিকৃতি অবশ্য সুন্দর হইবে। কিন্তু এরূপ নকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি যদি শিল্পের উদ্দেশ্য হয়, তবে শিল্প না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই, কেন না মূল বস্তু দেখিয়া সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যাইতে পারে। স্বাভাবিক পদার্থে যে সৌন্দর্য্য বা রসোদ্দীপনী শক্তি অনুভূত হয় না, সেই ভাবরসের অবতারণার জন্য শিল্পের সৃষ্টি। বাহন ভিন্ন এই ভাবরসের অবতারণা অসম্ভব। সঙ্গীতে এই ভাবরসের বাহন স্বর, কাব্যে এই ভাবরসের বাহন শব্দ, স্থাপত্যে এই ভাবরসের বাহন স্বাভাবিক আকৃতি। কিন্তু কোথায় সেই বাহন স্বভাবের অবিকল নকল হইবে, আর কোথায় তাহা ইঙ্গিত মাত্র প্রদর্শিত হইবে, উদ্দেশ্যের হিসাবে এই বিচার করিবেন শিল্পী। যদি বাহনকে অবিকল স্বভাব-সঙ্গত না করিলে রসোদ্দীপনের ব্যাঘাত না হয় তবে শিল্পী তাহা স্বভাব-সঙ্গত করিবার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়াও পারেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া শিল্পী ভারহুতের বেদিকা এবং সাঁচীর তোরণ বৌদ্ধ আখ্যায়িকার চিত্রের দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন "জাতকমালা"কার আর্য্যশূর তাহা এই দুইটী শ্লোকে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"শ্রীমন্তি সদ্গুণপরিগ্রহমঙ্গলানি
কীর্ত্ত্যাস্পদান্যনবগীতমনোহরাণি।
পূর্বপ্রজন্মসু মুনেশ্চরিতাদ্ভুতানি
ভক্ত্যা স্বকাব্যকুসুমাঞ্জলিনার্চ্চয়িষ্যে।

শ্লাঘ্যৈরমীভিরভিলক্ষিতচিহ্নভূতৈ-
রাদেশিতো ভবতি যৎসুগতত্বমার্গঃ।
স্যাদেব রুক্ষমনসামপি চ প্রসাদো
ধর্ম্ম্যাঃ কথাশ্চ রমণীয়তরত্বমীয়ুঃ॥

"শ্রীসম্পন্ন, সদ্‌গুণময়, মঙ্গলময়, প্রশংসার্হ, অনিন্দ্য মনোহর শাক্যমুনির পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের চরিতকথানিচয় ভক্তিসহকারে স্বরচিত কাব্যকুসুমাঞ্জলির দ্বারা অর্চ্চনা করিব।"

"এই সকল কীর্ত্তিকলাপ বুদ্ধত্বলাভের পথের চিহ্ন স্বরূপ; (এই সকল কীর্ত্তি কথার দ্বারা) সেই পথ উপদিষ্ট হইল। (এই কাব্য) কঠিন-হৃদয় ব্যক্তিদিগকেও প্রসন্ন করিতে পারে। (ইহা) ধর্ম্মবিষয়ক আখ্যায়িকানিচয়ের রমণীয়তা সম্পাদন করিতে পারে।"

যে সকল শিল্পী ভারহুতের বেদিকায় এবং সাঁচীর তোরণে বুদ্ধের জন্ম জন্মান্তরের মনোহর কাহিনী সকল অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল নির্ব্বাণের পথের এই সকল চিহ্নের রমণীয়তা সম্পাদন। কারু-কার্য্যের হিসাবে এই সকল চিত্র নির্দ্দোষ না হইলেও, এই সকল চিত্রে শিল্পী যে রমণীয়তা অর্থাৎ দর্শকের চিত্তকে রসার্দ্র করিবার শক্তি সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন একথা অস্বীকার করা যায় না।

(৩)

শুঙ্গরাজ্যের অধঃপতনের অনতিকাল পরেই যে প্রাচ্য ও মধ্যভারতে প্রাচীন শিল্পের ধারা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শতাব্দে নির্ম্মিত যে কয়খানি মূর্ত্তি এযাবৎ সাঁচীতে সারনাথে, এবং শ্রাবস্তীতে পাওয়া গিয়াছে তাহা মথুরার লাল পাথরের দ্বারা মথুরার কারখানায় নির্ম্মিত। দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্ররাজ্যে শুঙ্গশিল্পের ধারা আরও দুই শতাব্দীর অধিককাল অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রবহমাণ ছিল, এবং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে অমরাবতীর মর্ম্মরে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যে উন্নতির চরম সীমায় পঁহুছিয়াছিল। মথুরায় শুঙ্গশিল্পধারা একেবারে লুপ্ত না হইলেও খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে শকক্ষত্রপগণের অধিকারে নবাভ্যুদিত গ্রীকৃশিল্পের সহিত গুরুতর সংসর্গে আসিয়া প্রাচীন শিল্প নব কলেবর ধারণ করিয়াছিল। মথুরার শক-কুষাণযুগের শিল্পের সম্বৎ সহ লিপিযুক্ত অনেক নিদর্শন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিলে মনে হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে মথুরায় যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেব-দেবী গড়নের

একটী বৃহৎ কারখানা খোলা হইয়াছিল। কিন্তু এই কারখানায় তৈয়ারি দেব-দেবীর মূর্ত্তি কলের তৈয়ারি জিনিষের মত প্রাণহীন ভাবরসবিহীন শুষ্ক পাথর। সুতরাং শিল্পরসের অবতারণার হিসাবে মথুরায় শক-কুষাণ-যুগের শিল্পিগোষ্ঠীকে নিপুণ পাথরমিস্ত্রী ছাড়া আর বেশী কিছু, অর্থাৎ সৃষ্টিক্ষম প্রকৃত শিল্পী বলা যায় না। তথাপি মথুরার প্রাচীন শিল্পীদিগের একটী কীর্ত্তি তাঁহাদিগকে ভারত-শিল্পের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে। এই কীর্ত্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য দেব-দেবীর প্রচলিত মূর্ত্তির আকৃতির উদ্ভাবন। মথুরার কারখানার বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির সহিত গান্ধারের মূর্ত্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মনে করেন বুদ্ধমূর্ত্তি উদ্ভাবিত হইয়াছিল গান্ধারে এবং মথুরার শিল্পীরা তাহা অনুকরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ-মূর্ত্তি যেখানেই উদ্ভাবিত হইয়া থাকুক, জৈন মূর্ত্তিনিচয় যে উদ্ভাবিত হইয়াছিল মথুরায় শক-কুষাণযুগের কারখানায় একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন না আর কোথাও এত প্রাচীন জৈন মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। খুব সম্ভব পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্ত্তি গড়নও প্রথমতঃ মথুরায় এই যুগেই আরম্ভ হয়। মথুরার এই যুগের একখানি বৌদ্ধ চিত্রফলকে ঐরাবত সহ ইন্দ্রের মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মথুরা হইতে আনীত এবং কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত লাল পাথরের একটী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি এবং একটী জটামুকুট ত্রিশির (অর্থাৎ চথুর্মুখ) মহাদেব মূর্ত্তির ভগ্নাংশ শক-কুষাণ-যুগের তৈয়ারি বলিয়া মনে হয়। মথুরা মিউজিয়মে রক্ষিত লালপাথরের দ্বারে একখানি পার্শ্ব ফলকের পশ্চাতে একটী অসম্পূর্ণ লিপি আছে। পাথরখানি চিরিয়া দুফালা করায় এই লিপির প্রত্যেক পংক্তির অর্দ্ধাংশ লুপ্ত হইয়াছে। এই লুপ্তাংশ পূরণ করিয়া আমি স্থানান্তরে দেখাইয়াছি, এই লিপিতে কথিত হইয়াছে যে, মহাক্ষত্রপ সোডাসের রাজত্বকালে একব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের মহাস্থানে (অর্থাৎ কৃষ্ণের জন্মস্থানে) একটী চতুঃশালা, তোরণ, এবং বেদিকা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালের রীতি অনুসারে এই তোরণ এবং বেদিকা অবশ্যই কারুকার্য্য এবং ভাস্কর্য্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল, এবং এই ভাস্কর্য্যের মধ্যে পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্ত্তি এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকার চিত্র থাকাও সম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শক-কুষাণ-যুগে মথুরায় সহসা পৌরাণিক দেবদেবীর এবং জৈন ও বৌদ্ধ মহাপুরুষগণের ও দেব-দেবীর মূর্ত্তির গড়ন আরম্ভ হওয়ার কারণ

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর, এই শক-কুষাণ-যুগেই আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চিমার্দ্ধে মূর্ত্তিপূজা-রীতি প্রবলতা লাভ করিয়াছিল। ইহার পুর্ব্বে মূর্ত্তি গঠিত হইত; বোধ হয় স্থানে স্থানে তাহা পূজিত হইত; কিন্তু তখন যেন মূর্ত্তিপূজা প্রবলতা লাভ করে নাই, প্রবল ছিল স্তূপ, চৈত্য, বৃষ, সিংহ, গরুড়াদি ধ্বজ, এবং স্বস্তিক ত্রিশূলাদি চিহ্নের পূজা। শুঙ্গভাস্কর্য্যে যে এই সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শুঙ্গ-রাজগণের সম-সময়ের দেশীয় রাজগণের মুদ্রার চিত্রও এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূল। দেবদেবী, যক্ষ, নাগ, এবং বুদ্ধ, তীর্থঙ্কর প্রভৃতিতে লক্ষ্য করিয়াই অবশ্য চৈত্য ও চিহ্নাদির পূজা হইত। সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রতিমা পূজা প্রবল ছিল না বলিয়াই হয়ত দেবদেবীর আকৃতি সম্বন্ধে কল্পনা-জল্পনা প্রবলতা লাভ করিবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু শক-কুষাণ-যুগে পৌত্তলিক বিদেশীয়গণের সংসর্গগুণে সম্ভবতঃ মথুরায় মূর্ত্তিপূজা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শক এবং পহ্লব রাজগণের মুদ্রায় যে সকল দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে তন্মধ্যে কোন কোনটী হিন্দু দেবদেবী বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় কদফিসস্ প্রমুখ কুষাণ সম্রাট্গণের মুদ্রায় পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্ত্তি সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় কদফিসস্ শৈব ছিলেন এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দের তৃতীয় পাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুষাণরাজগণ মূর্ত্তির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের মুদ্রায় নাম সহ অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া যায়। তাঁহারা নিজেদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেন সম্ভবতঃ সম-সময়ে রোমের সম্রাট্গণের অনুকরণে প্রজা সাধারণের পূজার জন্য। মথুরার নিকটবর্ত্তী মট্ নামক স্থানে কয়েকজন কুষাণ সম্রাটের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে অনুমান হয় কুষাণ-প্রভাব আর্য্যাবর্ত্তে মূর্ত্তিপূজা প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

(৪)

মথুরায় শক-কুষাণ যুগের শিল্পিগণ মূর্ত্তির কায়া মাত্র গড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই কায়াতে সজীবতা এবং রসোদ্দীপনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন মধ্য এবং প্রাচ্য ভারতের গুপ্তযুগের শিল্পিগণ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত গুপ্তসম্রাটের পদানত হইয়াছিল। এই শতাব্দে রাষ্ট্রীয় একতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী মহত্তর ব্যাপার ঘটিয়াছিল; আর্য্যাবর্ত্তে প্রাচীন অর্ব্বাচীন, দেশীয় বিদেশীয়, সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষার সমন্বয়ের ফলে যাহা এখন হিন্দু সভ্যতা নামে পরিচিত তাহা আবির্ভূত হইয়াছিল। কুষাণসম্রাট্গণের সময়েই বোধ হয় এই সমন্বয়ের সূত্রপাত

হয়। কুষাণ-যুগে যে এই ব্যাপার কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল শেষ কুষাণ সম্রাটের বাসুদেব নামেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক কার্ণ (ভট্টকর্ণ) দেখাইয়াছেন, ভগবদ্গীতায় উপদিষ্ট ভক্তিতত্ত্বের সহিত মহাযানসূত্রে সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীকে নিবদ্ধ উপদেশের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কুষাণ-গুপ্তযুগে ভক্তির প্রচার শিক্ষা-দীক্ষা সমন্বয়ের নিশ্চয়ই বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। যখন প্রাচীন জ্ঞানমার্গ এবং বৌদ্ধ-নীতিমার্গ প্রবল ছিল তখন সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা নিম্ন অধিকারী তাঁহারাই কেবল ধর্ম্মতৃষ্ণার তৃপ্তি-সাধনের জন্য শিল্পের আশ্রয় লইত। কিন্তু ভক্তি সাকার ধ্যানকে সাধক-সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে পহুঁছাইয়া উচ্চাঙ্গের শিল্পের অভ্যুদয় সাধিত করিয়াছিল। মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ কল্পনা ; ঈশ্বর কল্পনা এবং ঐশ্বরিক ভাবকে নয়নমনের গোচর করান মনুষ্যের শিল্পের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। গুপ্ত-যুগের ভক্তগণ মথুরার কারখানায় উদ্ভাবিত কায়া লইয়া সেই মহান্ লক্ষ্য সাধনের জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মহাব্রত সফল হইয়াছিল। ভারতের শিল্পী দেবভাব প্রকাশে যতটা সফলতা লাভ করিয়া গিয়াছেন পৃথিবীর আর কোন দেশের আর কোন যুগের শিল্পী ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্তযুগে যে মন্দির ও মূর্ত্তিনির্ম্মাণরীতি অর্থাৎ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রায় সহস্র বৎসর জীবিত ছিল। এই সুদীর্ঘ কালের আর্য্যাবর্ত্তের শিল্পের ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করাও এখানে অসম্ভব। এখানে কেবল দুই একটী উদাহরণ দিয়া উহার অন্তর্নিহিত রস-ধারার আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

এই মধ্যযুগের স্থাপত্যের পরিণতি শিখর বা মঞ্জরীবিশিষ্ট মন্দিরে। মন্দিরের নিম্নভাগ গর্ভগৃহ এবং উপরিভাগ শিখর নামে পরিচিত। গর্ভগৃহ গবাক্ষহীন ; উহার ভিতরে আলোক প্রবেশের একমাত্র পথ সম্মুখের দ্বার। সুতরাং আধ আঁধারে অথবা প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে ভিন্ন গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য বস্তু বা প্রতিমা দর্শনের উপায় নাই। আঁধার অজ্ঞেয়তা-সূচক, আধ আঁধার রহস্য সূচিত করে। মনুষ্যের প্রকৃত আরাধ্য বস্তু অজ্ঞেয় নয় কিন্তু অতীন্দ্রিয় এবং রহস্যাবৃত গর্ভ-গৃহের অভ্যন্তরের আধ-আঁধার সর্ব্বদাই উপাসককে এই তথ্য স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভারতীয় মন্দিরের নির্ম্মাণপদ্ধতির আর একটা বিশেষত্ব, উপরিভাগের ভার বহনের জন্য খিলানের পরিবর্ত্তে সমান্তরালভাবে প্রস্তর ফলক বা ইষ্টক সাজান

হয়। হিন্দুরা যে প্রাচীনকালে খিলানের ব্যবহার জানিতেন তাহার প্রমাণের অভাব নাই। খিলান অতি প্রাচীনকালে ব্যাবিলনে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। গ্রীক্ শিল্পীরা ব্যাবিলনের নিকট হইতে অনেক বিষয় ধার করিয়া থাকিলেও খিলান গ্রহণ করেন নাই। তাহার কারণ, খিলান তাঁহাদের ভাবের এবং রুচির সহিত খাপ খায় নাই। হিন্দুরাও সেই নিমিত্তই মন্দিরে খিলান ব্যবহার করেন নাই। খিলান ঠেলাঠেলি, প্রতিযোগিতা, অধৈর্য্য সূচিত করে। আর ভার বহনের জন্য সমান্তরালভাবে সাজান প্রস্তরফলক বা ইষ্টক সূচিত করে শান্তভাব, সংযম, তিতিক্ষা। স্থাপত্যের অন্তর্নিহিত ভাব-বিষয়ে এতদূর পর্য্যন্ত গ্রীক এবং হিন্দুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হিন্দুর মন্দিরের উচ্চশিখর প্রকাশ করে হিন্দুহৃদয়ের অন্য একটী ভাব,—গর্ভ-গৃহস্থ আরাধ্য বস্তু লইয়া তৃপ্ত না থাকিয়া আকাশব্যাপী অনন্তের অন্তে পহুঁছিবার জন্য ঊর্দ্ধমুখী প্রবল আকাঙ্ক্ষা। গথিক্ গির্জ্জার শিখর সূক্ষ্মাগ্র খিলানের পৃষ্ঠারূঢ় হইয়া এই আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্রভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু গথিক্ আকাঙ্ক্ষার এই তীব্রতার সহিত যেন অসহিষ্ণুতা জড়িত আছে। হিন্দুর মন্দিরের শিখরে এই ঊর্দ্ধমুখী আকাঙ্ক্ষার সহিত সংযম এবং তিতিক্ষার সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে।

হিন্দুর প্রাচীন স্থাপত্য হিন্দু সভ্যতার স্বভাবগত আর একটী লক্ষণ প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য শিল্পশাস্ত্রে মন্দির-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিস্তর নিয়ম আছে। সেই নিয়মগুলি পাঠ করিলে মনে হয় হিন্দুর স্থাপত্য নির্জীব নকলনবিশী; ইহাতে শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি-নিয়োগের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু যে সকল প্রাচীন মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় স্থাপত্যে হিন্দুর উদ্ভাবনী শক্তি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। যে সকল মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে তাহাদের আকারে অনেক বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়; এবং মন্দিরের শোভা-সম্পাদক ভাস্কর্য্যে ত বৈচিত্র্যের সীমাই নাই।

আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যযুগের মন্দিরের মধ্যে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ১নং চিত্রে এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে আরম্ভ করিয়া শিখরের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মন্দিরের পীঠ (plinth) নাই। গর্ভ-গৃহের প্রাচীর প্রাঙ্গণ হইতে একেবারে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। শিখর যদিও বঙ্কিম ভাবেই গড়া হইয়াছে, মন্দিরের উচ্চতা নিবন্ধন শিখরের বঙ্কিম ছাঁদ শীঘ্র লক্ষিত হয় না; মনে হয় যেন শিখরটি কাত হইয়া উঠিয়াছে। অথচ

প্রকৃত প্রস্তাবে শিখর ঈষৎ বাঁকা হওয়ায় সেই কাত ভাব চক্ষুর পীড়াদায়ক হয় না। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের আমলকের দিকে তাকাইলে বোধ হয় কেহ যেন দেহ মন প্রাণ উর্দ্ধে টানিয়া তুলিতেছে। এই বিরাট্ রেখ-দেউলের রেখা ছাঁদ যেমন মনোহর, ইহার সকল অংশই তেমন মানানসহি।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের বহির্ভাগের কারুকার্য্য এবং ভাস্কর্য্য সুন্দরও বটে এবং দেখায়ও সুন্দর। অনেক মন্দিরের কারুকার্য্য সুন্দর হইলেও সুন্দর দেখায় না। তাহার কারণ কারুকার্য্যের বাহুল্যবশতঃ কোন অংশই ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না বা উপভোগ করা যায় না। লিঙ্গরাজ মন্দিরের কারুকার্য্যে এইরূপ চক্ষুর পীড়াদায়ক বাহুল্য নাই। মন্দিরের গাত্রে যে পার্শ্ব-দেবতার মূর্ত্তি, অষ্টদিক্‌পালের মূর্ত্তি এবং ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির চারিদিকে মনোহর লতাকর্ম্ম আছে। কিন্তু লতাকর্ম্মের বাহিরে খানিকটা যায়গা কারুকার্য্যহীন সাদা থাকায় এই প্রতিমা এবং লতাকর্ম্ম ভালরূপে দেখা যায়। ২নং চিত্র লিঙ্গরাজ মন্দিরের গাত্রের এইরূপ একটী দৃশ্য। গুরুদেব শিষ্যগণকে উপদেশ দানে রত। এমন স্বভাবসম্মত সৌম্য মূর্ত্তি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

(৪)

হিন্দুর দেবতা-কল্পনার প্রধান বিশেষত্ব, হিন্দুর দেবতা একাধারে উপাস্য এবং উপাসক। ঋগ্মন্ত্রে আছে যজ্ঞভাগী দেবতারা নিজেরা যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। যজুর্ব্বেদ-মতে স্বয়ং প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাভারত পুরাণাদিতে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে, শিব মহাযোগী, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি প্রয়োজন মত তপশ্চরণ করিয়া থাকেন। মধ্যযুগের দেবদেবী-মূর্ত্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শনে এই উপাস্য উপাসকের ভাবের সুন্দর মধুর মিলন দেখা যায়। দেবতার প্রতিমার কায়ায় উপাস্য দেবতার লক্ষণ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়াছে গভীর ধ্যানমগ্ন উপাসকের ভাব। এক সঙ্গে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, "কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগ্ন।"

মধ্যযুগের হিন্দু শিল্পীরা নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান মূর্ত্তিতে এই ধ্যানের বা যোগের ভাব প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, অনেক মূর্ত্তিতে ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেও তাঁহারা এই ভাব ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং অনেক মূর্ত্তিতে অন্য প্রকার ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন। এবার আমার

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী খিচিং, তাম্রশাসনোক্ত খিজ্জিঙ্গকোট্টের ভগ্নাবশেষ খননের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের বর্ত্তমান অধিপতির পূর্ব্ব-পুরুষ বশিষ্ঠ-গোত্রীয় ভঞ্জবংশীয় প্রাচীন নৃপতিগণ, সম্ভবতঃ দশম একাদশ শতাব্দে খিচিংএর ঠাকুরাণীর বর্ত্তমান মন্দিরের সন্নিহিত ভগ্নস্তূপে পরিণত মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ভগ্নস্তূপে কুড়াইয়া বা খনন করিয়া যে সকল প্রতিমার ভগ্নাংশ পাইয়াছি উদাহরণ স্বরূপ তাহার কয়েকটী চিত্র এখানে প্রকাশ করিব।

কূর্ম্মপুরাণের অন্তর্গত ঈশ্বরগীতায় কথিত হইয়াছে, এক সময় সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, কপিল, কণাদাদি মুনিগণ নর-নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে উপদেশ চাহিয়াছিলেন। তখন নরঋষি অন্তর্হিত হইলেন এবং নারায়ণ তাপসবেশ পরিত্যাগ করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিলেন। এমন সময় শশাঙ্কশেখর শিব আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং নারায়ণের অনুরোধ অনুসারে ঋষিগণের নিকট জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। উপসংহারে শিব বলিলেন—

"সোঽহং প্রেরয়িতা দেবঃ পরমানন্দ-সংশ্রিতঃ।
নৃত্যামি যোগী সততং যস্তদ্বেদ স যোগবিৎ॥"

"(জগৎ) প্রেরয়িতা (পরিচালক), পরমানন্দময়, যোগী (যোগাভ্যাসরত) সেই আমি সর্ব্বদা নৃত্য করিয়া থাকি ;—যে তাহা জানে সে যোগবিৎ।" তার পর—

"এতাবতুক্ত্বা ভগবান্ যোগিনাং পরমেশ্বরঃ।
ননর্ত্ত পরমং ভাবমৈশ্বরং সম্প্রদর্শয়ন্।"

"এই বলিয়া যোগিগণের পরমেশ্বর ভগবান্ (শিব) ঐশ্বর ভাব দেখাইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।"

৩ নং চিত্রে দেখা যাইবে একখানি নটরাজ প্রতিমার উপরের অংশ এবং পাদপীঠ কোন প্রকারে জোড়া দিয়া ফটো তোলা হইয়াছে। প্রতিমার দেহের অধিকাংশ ভাগই এখনও পাওয়া যায় নাই। তথাপি এই ভগ্নাংশ দেখিয়াই মনে হয় পুরাণের বর্ণনা যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নটরাজের মুখমণ্ডলে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধজাত যোগানন্দ সমাধির ভাব চমৎকার প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ; কমনীয় দেহখানি ধীর গম্ভীরভাবে নৃত্যের ছলে বিশ্বলীলার অভিনয় করিতেছে। তামিল দেশের সুপ্রসিদ্ধ নটরাজ মূর্ত্তিতে গতিশীলতা প্রবলতর।

থিচিংএর মূর্ত্তিতে গতির ও স্থিতির, জ্ঞানের ও কর্ম্মের, সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে।

৪ নং চিত্র খিচিংএ প্রাপ্ত একখানি মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির নিম্নভাগ বড় অসাবধানে খোদিত হইয়াছে, বোধ হয় আনাড়ির হাতের কাজ। কিন্তু উপরার্দ্ধ বড় সুন্দর। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে মহিষমর্দ্দিনীর স্তবে উক্ত হইয়াছে—

"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবী বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥"

"হে দেবি, একা তোমাতেই চিত্তে কৃপা এবং সমরনিষ্ঠুরতা একত্র দেখা যায়; তুমি ত্রিভুবনের বরদায়িনী।"

এই মূর্ত্তির মুখমণ্ডলে পুরাণোক্ত ভাব সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবী যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে এই নিষ্ঠুর অসুর বিনাশ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। প্রাচীন গ্রীক্ ভাস্করেরা যখন হিরেক্লস কর্ত্তৃক সিংহ-বিনাশের চিত্র বা অন্য কোন অনুরূপ ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তখন নিধনকারী দেবতার মুখমণ্ডল কতকটা সৌম্য করিয়াছেন। কি প্রাচীন গ্রীসে কি ভারতবর্ষে দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরবিনাশের চিত্রে গীতার—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"

এই আদর্শই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রীক্ ভাস্কর্য্যে হত্যাকারীর মুখে কৃপা প্রকাশিত হয় নাই।

৫ নং চিত্র খিচিংএর লুপ্ত বড় মন্দিরের নাগমূর্ত্তি; বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কি দেখিতেছে!

৬ নং চিত্রে আর একটী নাগ আরাধ্য দেবতার গলে মালা পরাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। মুখমণ্ডল আনন্দে ঢল ঢল।

যে মন্দিরের শোভা-সম্পাদনের জন্য খিচিংএর (মহিষমর্দ্দিনী ছাড়া) এই কয়েকটী এবং আরও অনেক দেব-দেবীর এবং নাগনাগীর মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল তাহা আকারে ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বর বা রাজারাণীর মন্দিরের অপেক্ষা বড় না হইলেও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় ছিল। যে কিছু ভগ্নাংশ আমরা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা অবলম্বন করিয়া চিত্রেও যে এই মন্দিরের পূর্ণাবয়ব দেখাইতে পারিব এমন সাহস করি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই মন্দিরের গর্ভ-গৃহের বহির্ভাগের অলঙ্কারে অসাধারণ কলা-কৌশল এবং সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়াবাড়ির এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতার নিদর্শন অপেক্ষাকৃত

বিরল। যে জিনিষটা দেখিতে ভাল লাগে সেই জিনিষটাকে অতিপ্রকাশিত বা অতি স্ফীত করিয়া দেখান শিল্পে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পরিচায়ক। অলঙ্কারের বাহুল্যও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার নিদর্শন। খিচিংএর বড়মন্দিরের কারুকার্য্যে এই ইন্দ্রিয়পরায়ণতা লক্ষিত হয় না, সকল অঙ্গই সংযতভাবে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। এই মন্দিরের শিখরে অতি অল্প কারুকার্য্য ছিল। যে স্থানে অলঙ্কার সহজে দেখা যায় না সেই স্থানকে অলঙ্কৃত করা বিড়ম্বনা মাত্র; উচ্চ মন্দিরের শিখর কারুকার্য্যখচিত করা বৃথা পরিশ্রম। লিঙ্গরাজের মন্দির-শিখরও প্রায় অলঙ্কার-শূন্য। মন্দিরের সৌন্দর্য্যের ভিত্তি গঠনের ছাঁদ এবং মানানসহি অঙ্গাবয়ব; যে অলঙ্কার সেই ছাঁদ এবং মানানকে দর্শকের অগোচর করিয়া রাখে সেই অলঙ্কার স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে যত সুন্দর এবং সরস হউক না কেন, মন্দিরের হিসাবে কদর্য্য।

(৬)

সুন্দর মন্দিরের এবং মূর্ত্তির দর্শন ও মনন যেমন রসবোধ-বৃত্তির প্রস্ফুরণের সহায়তা করে, তেমনি কার্য্যকরী বৃত্তির প্রস্ফুরণেরও সহায়তা করে। লিঙ্গরাজের মত মহান্ মন্দির গড়িতে ও সাজাইতে যে অসামান্য ধৈর্য্য, সাবধানতা এবং শ্রমশীলতার দরকার হইয়াছিল তাহা পুনঃপুনঃ স্মরণ করিলে স্মরণকর্ত্তার অভ্যাসগত জড়তা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা কতক পরিমাণে শিথিল না হইয়া পারে না। অন্য জাতির এই প্রকার কীর্ত্তি দেখিলে অনেক সময় নৈরাশ্যের উদয় হইতে পারে; কিন্তু নিজের জাতি নিজের জাতির মহতী কীর্ত্তি হৃদয়ে আশার সঞ্চার না করিয়া পারে না। উড়িষ্যা কতটুকু দেশ। প্রকৃত প্রস্তাবে উড়িষ্যা কয়দিনের জন্যই বা একেবারে স্বাধীন রাজ্য ছিল। উড়িষ্যার রাজাকে হয় গৌড়াধিপতির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইত, নয়ত তেলুগুভাষী দক্ষিণ কলিঙ্গের রাজার পদানত হইতে হইত। গঙ্গবংশীয়েরা দক্ষিণ কলিঙ্গ হইতে আসিয়া উড়িষ্যা জয় করিয়া থাকিলেও, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহারা উড়িয়াদিগের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যেমন প্রাচীন গ্রীসের কাছে রোম সাম্রাজ্যকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও শক, তুখার, হুণ প্রভৃতি আক্রমণকারীদিগকে প্রাচীন হিন্দুদিগের অনুগত হইতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইতিহাসে দেখা যায় বাহুবলে যাহা অসাধ্য, শিক্ষা-দীক্ষার বলে অনেক সময় তাহা সাধ্য; শিক্ষা-দীক্ষার বলে স্বরাজ্য কেন সামাজ্য লাভ করাও যাইতে পারে।

যখন মহাত্মা রাজা রামমোহন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তখন হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা মূল হইতে বিচ্যুত হইয়া অধঃপতনের চরম সীমায় পহুঁছিয়াছিল। তিনি যেমন একদিকে বেদান্তদর্শন, উপনিষদাদির মূলের আলোচনা পুনরুজ্জীবিত করিয়া শিক্ষা-দীক্ষাকে মূলের দিকে টানিয়া নিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তেমন আর একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের সহায়তা করিয়া উনবিংশ শতাব্দের শিক্ষাদীক্ষাকে সময়ের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষাবিধানের প্রকৃত বিধাতা হইয়াছিলেন তাঁহারা বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, অতীতের দিকে চাহিয়া, এদেশের লোকের ধাত হিসাব করিয়া বিধি-ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিহিত শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, বিদ্যার্থীকে ইংরেজী ভাষা এবং সঙ্গে সঙ্গে এক আধটুকু সংস্কৃত বা আরবী, ফার্সি শিখান, এবং জ্ঞানরাজ্যের কতকগুলি আবশ্যকীয় খবর গিলান। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ বিকাশ-সাধন সে কথা যেন তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ শিক্ষার ফলে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষার বিরুদ্ধে এখন দেশব্যাপী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে যেন শিক্ষা জিনিসটার উপরই বীতরাগ হইয়াছেন। অনেকে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য,—জাতীয় শিক্ষা কি? এ সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা মনে হয় তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিয়া এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আমাদের মনে হয়, যে শিক্ষা জাতিগত আত্মজ্ঞান দান করে তাহাই জাতীয়-শিক্ষা। আমাদের জননী জন্মভূমি আমাদিগের স্বভাবে কোন কোন দোষগুণের বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকারী-সূত্রে কি প্রকার মতি-গতি শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়াছি, যে শিক্ষার দ্বারা তাহার সঠিক জানিয়া লওয়া যায় তাহাই জাতীয়-শিক্ষা। যে যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ণমাত্রায় আত্মশক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই কুষাণ-গুপ্তযুগের সাহিত্য, শিল্প, এবং দর্শন আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত। এই যুগেই রামায়ণ মহাভারত বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে; অশ্বঘোষ, আর্য্যশূর, কালিদাস, ভারবি, ভবভূতির কাব্য রচিত হইয়াছে; বৌদ্ধ-দর্শন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; ষড়দর্শনের প্রচলিত ভাষ্য সঙ্কলিত হইয়াছে; এবং হিন্দু আর্য্য-শিল্প জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। শিল্পে সমাজের বাহ্য এবং অন্তর্জীবনের চিত্র পূর্ণমাত্রায় প্রতিবিম্বিত হয়, এবং দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্বও দৃষ্টিগোচর হয়।

এই শিক্ষাসংস্কারে ইউরোপের দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণীয় এবং কতক পরিমাণে অনুসরণীয়। ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষার জন্ম হইয়াছিল গ্রীসে খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দে। তারপর মেসিডনীয়েরা সেই শিক্ষা-দীক্ষার বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন; রোম তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইউরোপের মধ্যযুগে খৃষ্ট ধর্ম্মের অনুচর ইহুদীয় সঙ্কীর্ণতা তাহাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। এই দুর্দ্দশা হইতে ইউরোপ মুক্তিলাভ করিয়াছে কি উপায়ে? খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে ইটালী প্রবর্ত্তিত "রিনায়সান্স" বা নব-শিক্ষা অর্থাৎ গ্রীসের পুনরুজ্জীবিত প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষা ইউরোপকে মুক্তিদান করিয়াছে। আমাদেরও মুক্তির জন্য কুষাণ-গুপ্তযুগের শিক্ষা-দীক্ষার পুনরুজ্জীবন আবশ্যক। কিন্তু এই পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করিবে কে? যাঁহারা দেশের নায়ক, দেশের ব্যবস্থাপক, তাঁহারা গণের হিতসাধনে এত ব্যস্ত যে জনে জনের উন্নতি না হইলে যে, গণের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নহে একথা হিসাব করিবার তাঁহাদের যেন অবসরই নাই। সুতরাং এই পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে বাঙ্গালা সাহিত্যকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলার শিক্ষা-দীক্ষায় যে প্রাণের চাঞ্চল্য অধিকমাত্রায় দেখা যায় তাহার কারণ বাঙ্গালা সাহিত্য। বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর ভরসা।

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয়ের

অভিভাষণ

আলোচ্য বিষয়ে কোন কথা বলার পূর্ব্বে আমার প্রতি এবারের বিজ্ঞান-শাখার পরিচালনের ভারার্পণ জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। অযোগ্য হস্তে গুরুভার পড়িলে যাহা হইয়া থাকে এস্থলেও তাহাই ঘটিয়াছে। আপনাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমার দীন নিবেদন আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

নূতন বাঙ্গালার সকল সাধনার আদিপ্রবর্ত্তক এবং বিশেষ ভাবে সরল

বাঙ্গালা গদ্য লিখন-প্রণালীর প্রথম পথ-প্রদর্শক[১] ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রচলনের প্রধান উদ্যোক্তা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষেরা নববাঙ্গালার আদিতীর্থে আজ সাহিত্যসেবীদিগকে একত্রিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা সকলেই তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। লাঙ্গলপাড়ার রামমোহনের পিতৃভবন, রঘুনাথপুরে রামমোহন রায়ের নিজস্ব আবাসস্থল, এই উভয় পল্লীই তাঁহার জন্মস্থান রাধানগরের পারিপার্শ্বিক গ্রাম। সম্মিলনের ত্রিরাত্রপ্রবাসী তীর্থ-যাত্রীরা এই তিন গ্রামে অভ্যর্থনা-সমিতির অতিথি হইতে পারিয়াছেন বলিয়া নিজদিগকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছেন।

বিজ্ঞানে ভারতবাসীর পৈতৃক সম্পদ্ সামান্য নহে। কিন্তু অধুনা এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ১৬০২ খৃঃ অঃ পর এদেশে কোন প্রকার বিজ্ঞান বিষয়ে মৌলিক গবেষণা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া জানা নাই[২]।

এই বিলুপ্ত বিজ্ঞানালোচনার ধারা এদেশে পুনঃ প্রচলনের জন্য ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে (১৮২৩ খৃঃ অঃ শেষ ভাগে) রাজা রামমোহন রায় তাঁহার দেশবাসীদের পক্ষ হইতে তখনকার গবর্ণর জেনেরেল লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট যে আবেদন-পত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন আপনারা সকলেই সেই পত্রের কথা অবগত আছেন। অনুবাদ না করিয়া ঐ পত্র হইতে কয়টী ছত্র এই স্থানে উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। লুপ্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার পুনরুদ্ধারে রাজার আগ্রহ ও ব্যগ্রতা মুখবন্ধরূপে সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার কার্য্যের সহায় হউক।

"* * * * I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote. It will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics

(১) মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় তাঁহাদের বাড়ীতে বাঙ্গালা গদ্যে শতাধিক বর্ষের ও প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থের কথা স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। শুনিয়াছি উহার ভাষা ও মর্ম্ম এত দুর্ব্বোধ্য যে উহাকে গদ্যের আদি-আদর্শ না বলিলেও চলে।

(২) "The decline of scientific knowledge among Hindus does not date back from a remote period, the last of the annotations on scientific works which are characterised by skill, acuteness, intelligence, and judgment is daled 1620 A. D." *Civilisation in Ancient India* (1903), p. 57.

Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences * * which may be accomplished by employing a few gentlemen of talent and bearning, educaied in Europe and providing colleges furnished with necessary books, instruments and other apparatus * * * * to instruct in those useful sciences in which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above inhabitants of other parts of the world.

বাঙ্গলা গদ্যের ও বাঙ্গালার বিজ্ঞানের সেই আদিপ্রবর্ত্তক মহাত্মার জন্মস্থানে দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আমরা তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণের সুযোগ গ্রহণ করিতেছি।

অনেকেই বিশ্বাস করেন "বিজ্ঞান" কথাটা ইংরেজী "Science" শব্দের খাঁটি নামান্তর। বাঙ্গালার প্রচলিত সাহিত্যে এ শব্দটী এই অর্থে কে, কোথায় প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। ১৩০৪ সালের সাহিত্য-পারিষৎ-পত্রিকায় "জ্ঞান শব্দের উপরে উপসর্গের প্রয়োগ" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে প্রাচীন প্রয়োগ-তত্ত্ব সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত করা হয় নাই।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-দর্শনাদিতে "বিজ্ঞান" শব্দের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

"মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানশিল্পশাস্ত্রয়োঃ" (অমর, ১ম কাণ্ড, ধী বর্গ)। ভরতমল্লিক "শিল্পশাস্ত্র" বলিতে চিত্র, ব্যাকরণাদি চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যার কথা ধরিয়া লইয়াছেন।"

পঞ্চদশীর টীকায় বিজ্ঞান "নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

গীতার টীকায় রামানুজ "বিজ্ঞান" বলিতে বিবিক্তাকার বিষয়জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত চিৎ, অচিৎ বস্তুর জ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে "বিজ্ঞান" শব্দে "নিখিল ইন্দ্রিয়ার্থ-বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এ সব সংস্কৃতমূলক ব্যাখ্যায় প্রবেশ করিবার আমার কোন অধিকার না থাকিলেও মোটামুটি ইহা সাহস করিয়া বলা যায় যে, ইংরাজীতে "Science" বলিতে যাহা বুঝায় প্রাচীন সংস্কৃতে ব্যবহৃত "বিজ্ঞান" কথাটি তাহার পরিভাষা রূপে ব্যবহার করিতে কোনওরূপ আপত্তির কারণ নাই।

ইংরেজীতে জ্ঞান শিক্ষার শাস্ত্রগুলিকে মোটামুটি "Science" এবং "Art" এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। যে সব শাস্ত্র সত্যের সাধনায়, সত্যের অনুশীলনে, সত্য নিরূপণে নিযুক্ত সেগুলিকে "Science," আর যে শাস্ত্রগুলি সৌন্দর্য্যের আরাধনা, রূপের সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যের চর্চ্চায় নিযুক্ত সে গুলিকে "Art" নামে অভিহিত করা হয়।[৩]

বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপে পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, শব্দশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই, গণিত জ্যোতিষাদির সহিত "Science"র অন্তর্গত। আর "Art" বলিতে কাব্য, সাহিত্য, চিত্র, স্থপতি-বিদ্যা, ভাস্কর-বিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য নাট্য প্রভৃতি চিত্তবিনোদনকারী সুকুমার কলা-শাস্ত্র সমূহকে বুঝায়। রস ও রূপ-তত্ত্ব "Art"এর অধিকারে। রসাত্মক বাক্য লইয়া কবি কাব্য রচনা করেন, চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি রূপ সৃষ্টির লীলা-খেলা লইয়া লালিত্যের ও আনন্দের অবতারণা করেন, এই সবই "Art" এর অঙ্গীভূত।

বিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা দাঁড়াইতেছে তাহাতে শব্দের দ্ব্যর্থতা সত্যানুসন্ধানের ও সত্য নিরূপণের বিশেষ প্রতিবন্ধক। একটি শব্দের দুই অর্থ—বা একই অর্থে দুইটি শব্দ সত্য নির্দ্ধারণে বিশেষ পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্যই বিজ্ঞান-বিভাগে পরিভাষা লইয়া সর্ব্বদা উৎকণ্ঠার উৎপত্তি। সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সম্মিলন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনে বিশেষ উদ্যোগী ও এ কার্য্যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে আপনাদের নিকট আমার একটি বিশেষ নিবেদন আছে, আর এই আলোচনার উপপত্তির জন্য আমাকে কতক গুলি বাহুল্যের অবতারণা করিতে হইতেছে বলিয়া সঙ্কোচ বোধ করিতেছি।

বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এখন লিখিত ও প্রকাশিত হইতেছে, সুখের কথা সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারগণ ও প্রবন্ধকারগণ ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির অনুবাদ করার সময় অনেক নূতন নূতন শব্দের উদ্ভাবন করিতেছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক শব্দ চয়ন-প্রণালীর যে বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি রহিয়াছে তাহা জানিবার তাহাদের সুবিধা হয় নাই বলিয়া বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালা ভাষায় নানারূপ বিপ্লবের সৃষ্টি হইতেছে। ইহাদের নূতন শব্দ-চয়নের প্রণালী নানারূপ, অধিকাংশ স্থলে আক্ষরিক, কতকগুলি শাব্দিক, আর কতকগুলি মূল শব্দের আর্থিক অনুবাদ। প্রাচীন সংস্কৃতে কোনও বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রতিরূপ থাকার সম্ভাবনা ইঁহাদের

(৩) অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Science এবং Art এর বিভাগের সঙ্গে আমাদের এই পার্থক্যের সংজ্ঞা টিকিবে না

মনে উদয় হইতে চায় না। দুই একটী উদাহরণ দিলে বোধ হয় আমার কথাটা একটু পরিষ্কার হইতে পারে। ইংরেজ রাজত্বে "Forest Territory" সরকারী খাস। উহার অনুবাদ কেহ কেহ করিয়াছেন 'বনভূমি'। অনুবাদের দোষ ধরিতেছিনা, তবে একথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বহু প্রাচীন দেশ-প্রচলিত শব্দটি জানা থাকিলে এই নূতন শব্দের উদ্ভাবনা হইত না। পূর্ব্বে হিন্দুরাজত্ব সময়ে ইহার নাম ছিল "আটবিক প্রদেশ"। হরিষেণ-কৃত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে প্রয়াগে অশোক-স্তম্ভে উহা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মুসলমান শাসন সময়ে এইরূপ বিভাগের নাম ছিল "জঙ্গল মহাল"। আরও দুই একটা উদাহরণ দিতে ইচ্ছা হইতেছে, আশা করি, আপনাদের অপ্রীতিকর হইবে না। প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় উচ্চ প্রাইমারীর জন্য ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী এক বিজ্ঞান-পাঠ বাহির করিয়াছিলেন। উহার শব্দসম্ভার পাঠশালার ছেলেদের মুখস্থ করিতে হয়। এই বইয়ের অনুবাদিত শব্দগুলির একটা নমুনা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে চাই। এই বইয়ে "Weather Cock" এর বাঙ্গালা করা হইয়াছে "আবহাওয়া নির্ণয়কারী মোরগ"। এরূপ হাস্যকর উদ্ভাবিত শব্দের সংখ্যা অনেক। মনে রাখিবেন, ইহা প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য গ্রন্থ। "আবহাওয়া" আমাদের দেশ-প্রচলিত একটি উর্দ্দু কথা। আমরা জানিতাম উহার অর্থ "জলবায়ু"। কোনও অপরিচিত স্থানের জলবায়ু কিরূপ সেই অর্থেই "আবহাওয়া" কথার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল। "জলবায়ুর" ইংরেজী তথা "আবহাওয়ার" ইংরেজী আমরা জানিতাম "climate"। ইংরেজী climate এবং weather সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থ বোধক শব্দ, আপনারা সকলেই তাহা জানেন। আমরা "আবহাওয়া" অর্থে climate বুঝিতাম, আর আমাদের ছেলেদের মুখস্থ করিতে হইতেছে "আবহাওয়া অর্থে—weather। "আবহাওয়ার" এইরূপ অপপ্রয়োগ সাধারণ ব্যবহারে আসিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রে "weather report" "আবহাওয়ার" শিরোনাম লইয়া বাহির হইয়া ভাষার আবিলতা বৃদ্ধি করিতেছে। এসবের সংস্কারের একটা স্থায়ী চেষ্টা ও আয়োজনের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক ভাষা সঙ্কলনে এই সতর্কতার আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহা আপনাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এরূপ আর একটা শব্দের নূতন বিকৃত উদ্ভাবনের কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। শব্দটি "Dyarchy"র অনুবাদ। কাগজওয়ালারা ইহার তরজমা করিয়াছেন "দ্বৈত্বশাসন"! উচ্চারণ-

সাদৃশ্যে "দ্বৈত্ব-শাসন" অনেকটা "দৈত্বশাসনের" মতন শুনায়। তাই মনে হয় বুঝি মহাত্মা গান্ধীর "Satanic Government" কথার সঙ্গে সমতা রাখিয়া উপহাসচ্ছলে সমভাবে উচ্চারিত দ্ব্যর্থসূচক শব্দের উদ্ভাবন হইয়াছে। আর একজন ঐ শব্দের (Dyarchyর) বাঙ্গালা করিয়াছিলেন "দ্বিধা-বিভক্ত-শাসনতন্ত্র"। পদটি দীর্ঘ হইলেও অর্থবোধক ও সংজ্ঞা-জ্ঞাপক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক 'দৈনিক বসুমতী' ভিন্ন অন্য কোনও সংবাদ-পত্রে বা গ্রন্থে উহার ব্যবহার দেখি নাই। আরও একটি শব্দের কথা এখানে উল্লেখ করিব। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার পাতঞ্জল ভাষ্যে "প্রাকৃতিক আপূরণ" বলিয়া একটি পদের উল্লেখ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ ব্যাখ্যা অতি স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। আমরা এখন "Fossil" বলিতে যাহা বুঝি, শঙ্কর তাহাকেই "প্রাকৃতিক আপূরণ" বলিয়াছেন। অথচ fossilএর বাঙ্গালা করার জন্য একটি নূতন শব্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে "জীবাশ্ম"। আমরা নূতন শব্দ কিরূপ অনভিজ্ঞের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করাইতেছি তাহার আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। আপনারা সকলেই ধ্রুব নক্ষত্রের কথা জানেন। ইহার পারিপার্শ্বিক দুইটি নক্ষত্রমণ্ডল সকলেরই বিশেষ পরিচিত। বিষ্ণুপুরাণে (২য় অধ্যায়, ১২শ কল্প, ২৬ ও ২৭ শ্লোক) এই দুই নক্ষত্র মণ্ডলের বিশেষ বিবরণ রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত তথাদৃষ্ট ছোট মণ্ডলটি ধ্রুব নক্ষত্রের অধিক সন্নিহিত দেখায়। উহার নাম "শিশুমার"। আর কিঞ্চিদধিক দূরস্থিত বৃহত্তর নক্ষত্র-মণ্ডলটির নাম "সপ্তর্ষি-মণ্ডল" বলিয়া পুরাণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। "সপ্তর্ষি-মণ্ডল" (সপ্ত+ঋষি) অনেক সময় সপ্তঋক্ মণ্ডলরূপে লিখিত হইয়াছিল। ঋকের অর্থ ভল্লুক। লাটিন ভাষায় এই মণ্ডল দুইটির নাম ও পরিচয় গৃহীত হওয়ার সময় তাহাদের নাম হইল Ursa Major এবং Ursa Minor। এই নাম দুইটি আনুবাদিক ভুল থাকিলেও কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, ভারতীয় জ্যোতিষ হইতেই এই মণ্ডলদ্বয়ের নাম ও পরিচয় লাটিন জ্যোতিষ শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছিল। ইংরেজী তরজমায় ইহাদের সংজ্ঞা ও পরিচয় দাঁড়াইয়াছে "Great Bear" এবং "Little Bear"। আর আমাদের দেশে ছেলেদের জন্য যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পাঠ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিতেছেন তাঁহারা এই দুই নক্ষত্র-মণ্ডলের নাম দিতেছেন "বড় ভল্লুক" ও "ছোট ভল্লুক।" ইহাকেই বলে ভাগ্য-বিপর্য্যয়। দেখুন আমাদের সেই চিরপরিচিত "শিশুমার" কি আশ্চর্য্য অবরোহণ-প্রণালীতে আমাদের শিশু-বিজ্ঞান-সাহিত্যে "ছোট ভল্লুক"রূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক শব্দ ও সংজ্ঞা উদ্ভাবনের কতকগুলি নিয়ম-প্রণালী আছে। ঐ গুলিকে "নামবাদ" (Rules of Nomenclature) বলা হইয়া থাকে। এই নিয়মের একটা প্রধান সিদ্ধান্ত হইতেছে "পূর্ব্ববাদ" (Law of Priority)। একই অর্থে বহু শব্দ প্রচলন রোধ করার জন্ত এই সিদ্ধান্তটির বিশেষ প্রয়োজন। এই নিয়মটির কথা মনে রাখিলে পরিভাষা-সঙ্কলন অতি সহজ কাজ বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদিগকে একটু বিব্রত হইতে হইবে। বিজ্ঞানের বিশিষ্ট আলোচনা আমাদের দেশে ইয়োরোপীয়ের সংশ্রবের (তাহা গ্রীকীয়ই হউক বা ইংলণ্ডীয়ই হউক) পূর্ব্বে ছিল না বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা অতিশয় ভ্রান্ত, একথা বলিলে একটুও অন্যায় হইবে না। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের বহুল বিলোপ সাধিত হইয়া থাকিলেও প্রক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রাদিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে নানা বৈজ্ঞানিক সম্ভার রহিয়াছে, তাহার পরিমাণ উপলব্ধি করাও কঠিন।

"কালপুরুষ" (Orion.) একটি সর্ব্বপরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল। আপনারা সকলেই উহা লক্ষ্য করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা বলেন ঋক্‌বেদে উহা "প্রজাপতি" নামে অভিহিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় পাশ্চাত্য জ্যোতিষের যে সব গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তাহাতে এই "প্রজাপতি" নামটি পাওয়া যায় নাই। এই "প্রজাপতি" নামের অন্তরালে অনেক তত্ত্ব হয়ত লুক্কায়িত আছে। নামটি না জানায় তাহার সন্ধান হয় না। রোহিণীনক্ষত্রের নামও ঋগ্বেদে রহিয়াছে। বীজগণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের ভূরিভূরি গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান। আর যে সব মূল বৈজ্ঞানিক সংহিতা গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে তাহাদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রচলিত পুরাণ, ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য ন্যায় (Logic)এর বাঙ্গলা গ্রন্থ লিখিতে গিয়া কত অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবধি নাই। অথচ সেদিন মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের এক অধিবেশনে তাঁহার "হিন্দু ও বৌদ্ধ" বক্তৃতায় উল্লেখ করিলেন "Syllogism" সংস্কৃত "অবয়ব" শব্দের প্রতিরূপ। অধ্যাপক Crystalএর নিকট পাঠ নিতে গিয়া প্রথম শুনিয়াছিলাম ব্রহ্মগুপ্ত বীজ-গণিতের আদি আবিষ্কারক। এখন জানা যাইতেছে ব্রহ্মগুপ্তেরও বহুপূর্ব্বে বীজ-গণিতের অতি সূক্ষ্ম সমস্যা "কুট্টক" (Integers) ইত্যাদির সমাধান শ্রীধর পদ্মনাভ প্রভৃতির দ্বারা আলোচিত হইয়াছে। নূতন করিয়া এখন যিনি বাঙ্গলায় পাশ্চাত্য

পদ্ধতিতে বীজগণিত লিখিতে চান তাঁহাকে এই সব প্রাচীন গ্রন্থের শব্দ-সম্পদের আলোচনা না করিয়া নূতন পরিভাষা চয়ন করিলে চলিবে কেন? বীজ-গণিতের যে অবস্থা অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাই। চিত্র-বিদ্যা, স্থাপত্য-বিদ্যা ব্যাবহারিক শিল্প, চিকিৎসা-শাস্ত্র এই সমস্ত বিভাগেই রাশি রাশি গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান। ঐ সব বিভাগে "মানসারের" ন্যায় সুবৃহৎ গ্রন্থ এইরূপ শব্দ-ভাণ্ডারে পূর্ণ। সেগুলি ভুলিয়া বা না বুঝিয়া নূতন নূতন শব্দ আবিষ্কার করা কি বাতুলের কার্য্য হইবে না? আমাদের অনেকেরই ধারণা উদ্ভিদ্-বিদ্যা বিভাগে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের একেবারে লোপাপত্তি ঘটিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের বিপুল ভেষজ-ভাণ্ডার ছাড়িয়া দিলেও যে শব্দ-সম্পদ্ এই বিভাগের জন্য বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। আধুনিক উদ্ভিদবেত্তারা হয়ত ভাবেন নাই যে, মনু পর্য্যন্ত উদ্ভিদাদির সুন্দর শ্রেণীবিভাগ করিয়া নামকরণ করিয়া গিয়াছেন (মনু—১ম অধ্য, ৪৬-৪৮ শ্লোক)। রসায়ন-শাস্ত্রে রসেন্দ্র-চিন্তামণি, রস-রত্নাকর প্রভৃতি বিভাগীয় বিশিষ্ট গ্রন্থ ব্যতীতও তন্ত্রে, পুরাণে কত পরিভাষা রহিয়াছে। জীব-বিদ্যাবিদেরা হয়ত শুনিলে কৌতূহলী হইবেন যে টিনিয়া, সলিয়ামের (Taenia Solium) অদ্ভুত জীবন-প্রবাহ ও বিবর্ত্তন বিবরণ অথর্ব্ব বেদে বর্ণিত রহিয়াছে। আর অনেকে মনে করেন, সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই গূঢ় জীবনকাহিনী, এমন কি ইহার নামকরণের জন্যও অথর্ব্ব-বেদের নিকট ঋণী। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এরূপ কত দৃষ্টান্তের সন্ধান পাইয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণের জন্য আমরা সকলে আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করিতেছি। সুশ্রুত বিষ-চিকিৎসা ব্যপদেশে, সর্প, মক্ষিকা, কীট, কৃমির শ্রেণী-বিভাগের যে সব বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছে তাহা দেখিলে সহজেই মনে হয় যে, ঐ সব শ্রেণী-বিভাগ বিশেষ বিশেষ মৌলিক জীব-বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাদি হইতে গৃহীত। এই সব শব্দের নির্ঘণ্ট না করিয়া জীব-বিদ্যার পরিভাষা সঙ্কলন করিতে বসিলে চলিবে কেন? বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভবপর করিতে হইলে বিশুদ্ধ পরিভাষা-সঙ্কলন যেরূপ অত্যাবশ্যক, যে-কোনও পরিভাষা বিশুদ্ধ করিতে হইলে পূর্ব্ব রচিত ও প্রচলিত শব্দসমূহের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা ততোধিক আবশ্যক। আমাদের প্রথম প্রয়োজন হইতেছে প্রাচীন সংস্কৃত-শাস্ত্রে যে সব বৈজ্ঞানিক শব্দ রহিয়াছে তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা। নতুবা নূতন উদ্ভাবিত উদ্ভট শব্দের আমদানীতে বাঙ্গালার শিশু-বিজ্ঞান-সাহিত্য বৃথা বাগ্‌জালে আচ্ছন্ন ও মুহ্যমান হইয়া পড়িবে। সাহিত্য-

পরিষৎ এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু আমার মনে হয়, এই সম্মিলন-ক্ষেত্রই ইহার প্রকৃত বিধায়ক হওয়া উচিত।

এ সম্বন্ধে আমার যে নিবেদন আছে তাহার প্রণালী নির্দ্ধারণ জন্য যথা-সময়ে আপনাদের নিকট একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, এবং তাহারই পূর্ব্বাভাবরূপে আরও দুই চারিটি কথা এই অভিভাষণে আলোচনা করিতে চাই। আমার মনে হয়, সম্মিলনের কার্য্যকরী শক্তি তিন দিনের বক্তৃতার উৎসবে ও আদর আপ্যায়নে শেষ না হইয়া একটা বর্ষব্যাপী কার্য্য-প্রণালীর সমাধানের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আর পরিভাষা-সঙ্কলন, পরিভাষার আলোচনা ও সংস্কার তাহার একটা প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে সম্মিলন চারি শাখায় বিভক্ত। সাহিত্য, দর্শন, পুরাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান। পুরাতত্ত্বও যে বিজ্ঞানেরই শাখা, তাহা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। এই সব প্রত্যেক বিভাগেই ভাষা-সম্পদ্ নূতন নূতন শব্দ-সম্ভারে দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। আমার মনে হয়, প্রতি বৎসরে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে নবরচিত শব্দমালার একটা নির্ঘণ্ট বর্ষব্যাপী চেষ্টায় প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি বিভাগে বর্ষকালের জন্য এক একটি ছোটখাট সমিতি নিযুক্ত হওয়া উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এরূপ একটি কার্য্যকরী-সমিতি গঠনের প্রস্তাব এবারকার অধিবেশনে উপস্থিত করিব। সাহিত্য-পরিষদের সহায়তায় আপনাদের নিযুক্ত সেই সমিতি বর্ষব্যাপী চেষ্টায় আগামী বর্ষে যতগুলি নূতন বাঙ্গালা শব্দ নূতন প্রকাশিত গ্রন্থে, সাময়িক ও সংবাদপত্রে নূতন ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া সমিতির সভ্যগণ মনে করিবেন, শব্দকর্ত্তার নাম ও প্রকাশিত গ্রন্থ বা পত্রের পরিচয়সহ তাঁহারা ঐ সব শব্দের একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া বর্ষশেষে আগামী সম্মিলনের কার্য্যকরী সভায় সেই নির্ঘণ্ট তাঁহাদের মন্তব্যসহ উপস্থিত করিবেন। তখন ঐ সব নূতন শব্দের বৈধতা, ব্যবহার-শুদ্ধতা, প্রাচীন পর্য্যায়ের শব্দাদির সহিত সমালোচিত হইবে; এবং ঐ নির্ঘণ্ট আলোচিত মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্মিলনের বার্ষিক বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। আমি কেবল বিজ্ঞান-শাখার জন্যই এই ব্যবস্থার বিশেষ আবশ্যকতা বোধ করিতেছি। গোড়াতেই বলিয়াছি সত্যানু-সন্ধান, সত্য-নিরূপণই বিজ্ঞানের কার্য্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য। এ বিভাগে সৌন্দর্য্যের রূপ ও স্রষ্টার শ্লথভাব ব্যঞ্জনে স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব। আমার মনে হয়, এইরূপ একটা বার্ষিক নির্ঘণ্টের আলোচনার সাহায্যে আমরা আর

কিছু করিতে না পারিলেও ছেলেদের "ছোট ভল্লুক" ও "আবহাওয়া নির্ণয়কারী মোরগের" ন্যায় হাস্যজনক শব্দাবলীর কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করার বিড়ম্বনার কতকটা প্রতিরোধ জন্মাইতে পারিব।

এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যে বিশেষ গুরুতর ও কঠিন তাহা আমি অস্বীকার করিতেছি না। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক-পরিভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে বিপুল প্রাচীন সংস্কৃত প্রভৃতি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই। এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে বঙ্গের শাস্ত্রকুশল পণ্ডিতকুলের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার বিজ্ঞানবিদ্‌দের আর গত্যন্তর নাই। এ সব প্রমাণ করিতে উদাহরণের অভাব হয় না। পক্ষান্তরে আলোচনা করিতে গেলে এমন সব শব্দ বাহির হইয়া পড়ে, যাহাতে একেবারে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা ত সকলেই জানিতাম "Gunpowder"এর বাঙ্গালা বারুদ আর সেই জিনিসটা চৈনিক। ইহাই ত আমাদের সকলের ধারণা। অথচ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতেরা বলেন, "ঔর্ব্বাগ্নি" উহার প্রাচীন সংস্কৃত কথা ও দেশ-প্রসিদ্ধ নাম। শুধু কথার কথা নহে, পণ্ডিত নন্দকুমার কবিরত্ন তাঁহার 'নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা'তে 'নীতি-চিন্তামণি' হইতে উহার প্রস্তুতের প্রণালী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"দগ্ধেধং শোরকঞ্চৈব পার্ব্বত্যবীর্য্যমেব চ।
একীকৃত্যাংশভাগেন ক্রমাদ্ধা সা ভবেদিতি॥"
"দারুণো হুতভুক্তেন দহ্যতে সলিলাদিকম্।"

শুধু বারুদ নয়, মনু ছয় প্রকার দুর্গের বর্ণনা করিয়াছেন। (৭ম, অধ্যায়—৭০, ৭৫ এবং ৭৬ শ্লোক) আর "শতঘ্নী" বলিতে কি কামান বুঝিতে হইবে? মহাভারতে, রামায়ণে উহার উল্লেখ আছে। আর শ্রীকৃষ্ণ শল্যের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় দ্বারকাকে সুরক্ষিত রাখিয়া গিয়াছিলেন।

"ঔর্ব্বাগ্নিং প্রোথিতং কৃত্বা শতঘ্নীং গুড়কৈর্যুতাং।"

হরিবংশ।

তবে "প্রবাদ" অপ্রামাণ্য, শাস্ত্রের "শ্লোক" সে ত প্রক্ষিপ্ত—ইহাই আমাদের ঐতিহাসিকদিগের সিদ্ধান্ত। মাটি খুঁড়িয়া তুলিতে না পারিলে বর্ত্তমান পুরাতত্ত্বে কোনও কথা গ্রহণ-যোগ্য হয় না সৌভাগ্যক্রমে তাহাও হইয়াছে। Sir Arthur Cautley গঙ্গার জল-প্রণালীর খোদাই কার্য্যে সমতলের ৭০ ফিট্ নীচে হস্তিনাপুরের ভগ্নাবশেষ পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ছোট কামানের মতন একটা যন্ত্র পাওয়া গিয়াছিল। উহাই কি "শতঘ্নী"?

কামানকে শতঘ্নী না বলিতে চাও উত্তম, কিন্তু শতঘ্নী বলিতে যে কামানের পূর্ব্বানুকৃতি বুঝাইত তাহা না মানিলে চলিবে কেন?

গতবর্ষে নৈহাটী সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখায় পঠিত আমার একটি প্রবন্ধে "আর্য্য" ও "দ্রাবিড়" এই দুইটি কথা নিয়া লোক-তত্ত্বের লেখকেরা যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় দিতেছিলেন তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলাম। এই দুইটাই অতি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ। ম্যাক্সমূলার কুক্ষণে হিরাটের নিকটবর্ত্তী আরিয়ানা প্রদেশের নাম হইতে Aryan শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রুতি-সমতার জন্য আজ প্রাচীন "আর্য্য" শব্দ তাহার প্রতিশব্দ দাঁড়াইয়াছে। "দ্রাবিড়" বলিতে বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণবর্ত্তী মহারাষ্ট্র প্রভৃতি পাঁচটি প্রদেশকে বুঝাইত। আজ দ্রাবিড় এক কল্পিত আর্য্যজাতির সংজ্ঞা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর এই দুই কল্পিত জাতির কাল্পনিক মিশ্রণে "আর্য্য দ্রাবিড় সঙ্কর" "মোন্‌গল দ্রাবিড় সঙ্কর" প্রভৃতি অদ্ভুত ও কাল্পনিক মিশ্রবর্ণের নাম-সংখ্যা বাড়াইতেছে। গত বর্ষেই নিবেদন করিয়াছিলাম, এই সমস্ত অনিষ্ট নিবারণের একমাত্র উপায় লোক-তত্ত্ব পাঠে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্ম-নিয়োগ। প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিলে এ সব বাগ্‌জাল ও ভাষার আবর্জ্জনা আর বাড়িতে পারিবে না। আর একটা বিপদ ঘটিতেছে, আমাদের হেলেনিক্ (Hellenic) ও পারসিক-* মোহ হইতে। আমাদের ভিতর এখনও অনেকেরই যুক্তি-প্রণালী রাশিচক্রের কল্পিত ঐতিহাসিক-তত্ত্বে ঘূর্ণায়মান। কোনও কোনও সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আলেক্‌জেণ্ডারের ভারত-অভিযানের সময় ভারতীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা গ্রীক্‌দের নিকট হইতে রাশিচক্রের নাম ও রূপ শিক্ষা করিয়া ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। অমনই মাপ-কাটি লইয়া তাঁহারা সমস্ত শাস্ত্র ও প্রাচীন গ্রন্থ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। আর যাঁহাতক ভারতীয় কোনও পুথি বা প্রস্তাবে রাশিচক্রের নাম বা গন্ধ পাওয়া গেল, অমনি স্থির হইল, তাহা ৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। পুনঃ পুনঃ এই মাপ কাটির অলীকতা প্রদর্শিত হইলেও সেই হেলেনিক্ মোহ তাহাদের ঘুচিতেছে না। Sir William Jones হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক মনস্বী প্রাচীন গ্রন্থাদির সময় নিরূপণের এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তমূলক প্রণালী দূর করিতে লেখনী ধারণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

Epping, Strassmaien এবং Jensen প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উৎকীর্ণ ইষ্টক-

* যথা Parsipolitan Polish.

ফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, খৃঃ পূঃ চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে একেডিয়ান পঞ্জিকাতে ও তৎপর সেমেটিকেরা এবং বেবিলোনিয়ান ও আসিরিয়ানেরা ভারতীয় রাশিচক্রের ব্যবহার করিয়াছেন। * ভারতীয় শাস্ত্রে হেলেনিক্ প্রভাব দেখাইয়া এদেশে অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। আশা করি, স্রোত ঘূরিয়া এখন গ্রীক্ ও রোমক সভ্যতার ইতিহাসে ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবের পরিচয় সম্বলিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের প্রচার দেখিতে পাইব। সম্মিলন একটা বর্ষব্যাপী কার্য্যের সূচনা ও পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতে না পারিলে উহা কালে একটা তেরাত্রের বারওয়ারিতে পরিণত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। গভীর গবেষণাযুক্ত প্রবন্ধ পাঠের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সম্মিলন সাহিত্যসেবী সাধারণের জন্য যে একটা আদর-আপ্যায়নের সামাজিক মিলন-ক্ষেত্র, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। এই আরাম ও আনন্দদায়ক বার্ষিক উৎসব ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে বর্ষব্যাপী সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একটা হিসাব নিকাষের বন্দোবস্ত রাখিলে বঙ্গভাষার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার একটা খতিয়ান দাঁড়াইতে পারে। বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা প্রস্তুত পক্ষে সম্মিলনের ঐরূপ বার্ষিক নির্ঘণ্টের সঙ্কলন ও আলোচনার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা আছে কি না, আপনারা যথাসময়ে তাহার মীমাংসা করিবেন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

* Ancient Calendars and Constellations by E. M. Plunkel, pp. 102-5.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

পঞ্চদশ অধিবেশন

রাধানগর—১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

কার্য্য-বিবরণী

প্রথম দিবস—৬ই বৈশাখ ১৩৩১ ১৯এ এপ্রিল ১৯২৪, শনিবার

অপরাহ্ণ ৩৷৹ ঘটিকা।

অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি, সম্পাদক এবং সদস্যগণ সঙ্কীর্ত্তন সহকারে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সহিত সভা-মণ্ডপে প্রবেশ করেন এবং অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া মঙ্গলাচরণ করেন। পরিশিষ্ট—ঝ।

২। শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গকে সম্বর্দ্ধিত করেন। পরিশিষ্ট—ঝ।

৩। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গোস্বামী মহাশয় কতিপয় সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আশীর্ব্বাদ করেন। পরিশিষ্ট—ঝ।

৪। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য-বিরচিত সংস্কৃত কবিতা, কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় পাঠ করেন। পরিশিষ্ট—ঝ।

৫। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ উপস্থিত হইতে অক্ষম হইয়া যে লিখিত 'স্বাগত-সম্ভাষণ' প্রেরণ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে স্বাগত-আবাহন জ্ঞাপন করিয়া সম্বর্দ্ধিত করিলেন এবং সাহিত্য-সম্মিলনের সফলতাকল্পে শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় প্রভৃতি ভূস্বামী ও অন্যান্য যে সকল ব্যক্তিগণ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় মহাশয় অসুস্থতাবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে মুদ্রিত "সাদর-সম্ভাষণ" প্রেরণ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই সময়ে তাহা পাঠ করেন। (পরিশিষ্ট

ঝ দ্রষ্টব্য)। তৎপরে তিনি রাধানগরের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তত্রত্য খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার অভিভাষণের উপসংহার করেন।

৬। তৎপর অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই হ মহোদয়কে সম্মিলনের সাধারণ সভাপতিপদে বরণ করিবার প্রস্তাব করিলে এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দ আনন্দের সহিত তাহা সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নিম্নোক্ত মহোদয়গণকে সাহিত্যাদি চারি শাখার সভাপতি পদে বরণ করিলেন—

(ক) সাহিত্য-শাখা—সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর

(খ) দর্শন-শাখা—সভাপতি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

(গ) ইতিহাস-শাখা—সভাপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা—সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি

৭। সভাপতি বরণের পর উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইল। (পরিশিষ্ট—ঝ)

৮। এই সময় রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্য ১৯এ এপ্রিল মহাকবি লর্ড বাইরনের শত-বার্ষিক মৃত্যুদিন। ১৮২৪ সালের ১৯এ এপ্রিল তারিখে তিনি পরলোক-যাত্রা করিয়াছিলেন। আজ ঠিক তাহার ১০০ একশত বৎসর পরে সেই ১৯এ এপ্রিল তারিখে তাঁহার মৃত্যু তিথিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে। এই অধিবেশনের, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সসম্মানে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গগত কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

৯। সাধারণ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অনাগত ব্যক্তিগণের সহানুভূতিসূচক পত্রের বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন।

১। মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্‌ মহাতাব বাহাদুর।

২। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি—বাঁকুড়া।

৩। „ প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

৪। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
৫। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
৬। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
৭। „ ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।
৮। „ মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।
৯। „ সতীশচন্দ্র মিত্র।
১০। „ ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।
১১। „ কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি।
১২। „ অটলবিহারী ঘোষ।
১৩। „ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন।
১৪। „ কিরণচন্দ্র দত্ত।
১৫। „ রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
১৬। „ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর।
১৭। „ শশধর রায়।
১৮। „ বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৯। „ হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন।
২০। „ শরৎকুমার মিত্র।
২১। „ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২২। „ বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২৩। „ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
২৪। „ মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা।
২৫। „ কৃষ্ণচরণ সরকার।
২৬। মৌলভী কাজি আকরাম হোসেন।
২৭। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।
২৮। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার।
২৯। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৩০। „ শ্রীজীব শর্ম্মা।
৩১। „ সুরেন্দ্রনাথ বল।

১০। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

১১। মৌলবী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ মহাশয় স্বরচিত "এই সে নগর?" নামক কবিতা পাঠ করেন। পরিশিষ্ট—ঝ।

১২। সাহিত্য-শাখার সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি কিছুক্ষণ পাঠ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে, তাঁহার অনুরোধে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল মহাশয় কিছু অংশ পাঠ করেন। পরিশেষে অবশিষ্ট অংশ শ্রীযুক্ত জলধর বাবু নিজেই পাঠ করেন।

১৩। দর্শন-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

১৪। ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

১৫। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

১৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় নৈহাটী সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং পরিচালন-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্য-চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

১৭। ইহার পর মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল মহাশয় "মহাত্মা রামমোহন" নামক স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। পরিশিষ্ট—ঝ।

১৮। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের রচিত "ওগো জাগ রাধানগরী" শীর্ষক কবিতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পাঠ করিলেন। পরিশিষ্ট—ঝ।

১৯। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ-বিরচিত একটি কবিতা শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় পাঠ করিলেন। পরিশিষ্ট—ঝ।

২০। শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত "রামমোহন সপ্তক" নামক কবিতা শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা মহাশয় পাঠ করেন। পরিশিষ্ট—ঝ।

অতঃপর সন্ধ্যা ৭।।০ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

তৎপরে সন্ধ্যা ৭।৪৫ টার সময় সম্মিলন-মণ্ডপে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হয়।

দ্বিতীয় দিবস

শাখা-সভার অধিবেশন

৭ই বৈশাখ, ১৩৩১, ২০এ এপ্রিল, ১৯২৪ রবিবার প্রাতে ৭ টার সময় সম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, সম্মিলন-মণ্ডপের অনতিদূরে স্থানীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির একটী প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি তৎপরে প্রদর্শনীক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলে বেলা ৯॥০ টার সময় সম্মিলন-মণ্ডপের বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য, দর্শন ইতিহাস ও বিজ্ঞান—এই চারি শাখা-সভার অধিবেশন হয় এবং যথাক্রমে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়গণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত শাখা-সভায় পঠিত ও পঠিত বলিয়া গৃহীত প্রবন্ধের তালিকা যথাস্থানে প্রদত্ত হইল।

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ও সরসীমোহন রায়ের সাহায্যে স্থানীয় বিখ্যাত লাঠিখেলা প্রদর্শিত হয়। উপস্থিত প্রতিনিধিগণ তদ্দর্শনে বিশেষ পরিতোষ লাভ করেন।

দ্বিতীয় দিবস

সাধারণ অধিবেশন

৭ই বৈশাখ, ২০এ এপ্রিল, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন এবং আলোচনান্তে গত দিবসের বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অনুমোদিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব—মঙ্গলাচরণ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—বর্ষমধ্যে মৃত নিম্নলিখিত দেশবিশ্রুত সাহিত্যিকগণের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং

তাঁহাদের পরিবারবর্গের শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন। এই শোক-প্রস্তাব উক্ত মৃত ব্যক্তিগণের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হইবে।

১। অশ্বিনীকুমার দত্ত
২। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর
৪। ললিতচন্দ্র মিত্র
৫। উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন
৬। কবিরাজ হরিনাথ বিদ্যারত্ন
৭। রাখালরাজ রায়
৮। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। দামোদর দাস বর্ম্মন্
১০। সূর্য্যকুমার অগস্তি
১১। যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

তৃতীয় প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন 'রমেশ ভবন' নির্ম্মাণকল্পে সমস্ত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই সম্পর্কে রমেশ-ভবন কমিটির ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, গত বৎসরের প্রস্তাব অনুসারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরের সহিত সংলগ্ন হইয়া "রমেশ-ভবন" নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। কেবল মেজের পাথর বসান বাকী আছে। এই কলাভবন বা মিউজিয়াম নির্ম্মানের জন্য প্রায় ৩২০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এখনও কন্‌ট্রাক্টরের প্রায় ১২০০০৲ টাকা দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণের এই টাকা পরিশোধের জন্য সমস্ত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সমর্থক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ প্রস্তাব—হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তথ্যাদিপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমনভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে অনুরোধ করিয়াছেন।

পঞ্চম প্রস্তাব—বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহু সংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও যাযাবর (সার্কুলেটিং) পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গের সমস্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি ও ইউনিয়নকে এবং ইংরাজী স্কুল ও কলেজ-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত সংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র দ্বারা অনুরোধ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সম্মিলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি নিম্ন, কি উচ্চ, সকলপ্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের রীতিমত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এবং ইংরাজি ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা হওয়া উচিত। বি এ শ্রেণীর পাঠ্য-মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষা-বিজ্ঞান সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত এবং বি এ পরীক্ষায় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইস্‌লামীয় দর্শন পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

(খ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন এবং ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় দিতে পারিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(গ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বঙ্গভাষায় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানা বিদ্যা-বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হউক।

(ঙ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(চ) দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধার-সাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এম্ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, সভ্যতা (Indian Antiquities and Culture) প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলন আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ও সায়ান্স ফ্যাকাল্টীর সদস্যগণ, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত যাবতীয় বিষয়ের অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় অনুষ্ঠিত হইবে এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা হইবে—এইরূপ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এই সম্মিলন সানন্দে অনুমোদন করিতেছেন এবং এই প্রস্তাব অবিলম্বে গ্রহণ করিয়া, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এবং সেনেট সভাকে অনুরোধ করিতেছেন। এই সম্মিলন আশা করেন যে, উচ্চতর পরীক্ষাসমূহেও যাহাতে এই বিধি সত্বর প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। এই সম্মিলন বিশ্বাস করেন যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বি. এ, এম্ এ প্রভৃতি উচ্চ পরীক্ষা বঙ্গভাষাতেই গৃহীত হইবে—এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করেন, তবে সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্‌গ্রন্থ অচিরকাল মধ্যে বহুলপরিমাণে বঙ্গভাষায় রচিত হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষায় এম্ এ পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সম্মিলন আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

উপরি উক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট্ ও সেকেণ্ডারি বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট এবং আসাম গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সচিবের নিকট প্রেরিত হউক। গত সম্মিলনের নির্দ্দেশ অনুসারে ১৪শ সম্মিলনের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া উক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারি বোর্ড অব এডুকেশন এবং আসাম গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সচিবের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

সপ্তম প্রস্তাব—এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, বাঙ্গালা দেশে কৃষিবিষয়ক পত্রিকা অধিক পরিমাণে সাধারণের বোধগম্যরূপে যাহাতে প্রচারিত হয়, এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও মৌলিক গবেষণা করিয়া পুস্তকাদি প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।

এই সম্পর্কে বিশেষ কোনও কার্য্য হয় নাই। যাহাতে কার্য্য শীঘ্র অগ্রসর হয়, তজ্জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক এবং গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের (এগ্রিকালচার ডিপাঃ) কর্তৃপক্ষের সহিত পত্রব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী।
সমর্থক— „ চারুচন্দ্র মিত্র।

অষ্টম প্রস্তাব—এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, বিভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য একটি করিয়া সমিতি গঠিত করা হউক। মেদিনীপুর জেলায় এই কার্য্য করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার উপর ভার অর্পিত হউক এবং তত্তদ্দেশবাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহাতে এইরূপ সমিতি প্রত্যেক জেলায় গঠিত হয়, তাহার ভার সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর অর্পিত হউক ও প্রতি বৎসর সম্মিলনের অধিবেশনে এই সমিতিগুলিকে তাহাদের কার্য্যবিবরণ উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (মেদিনীপুর)
সমর্থক— „ নরেন্দ্র দেব (কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হারাধন রায় মহাশয়ের সমর্থনে হুগলীজেলার প্রতি উপরোক্ত কার্য্যভার অর্পিত হইল। সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে তাঁহারা তাঁহাদের কৃত কার্য্যের বিবরণ উপস্থিত করিবেন।

এই সম্পর্কে পরিচালন-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ কর্তৃক জীবন-চরিত, কিংবদন্তী ও প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহকার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

নবম প্রস্তাব—প্রত্যেক জেলায় ঐতিহাসিক তথ্য ও পুরাতত্ত্ব

সংগ্রহের জন্য জেলা বোর্ডগুলি শিক্ষা সংক্রান্ত সাহায্য (Grant) হইতে অথবা আবশ্যক হইলে এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট হইতে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ হইতে প্রতি বৎসর কতক টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখুন; এই কার্য্যে শিক্ষা দিবার জন্য অন্ততঃ প্রতি বৎসর দশ জন করিয়া ছাত্র গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নির্দ্দেশ মত যাহাতে প্রতি বৎসর শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। এতদ্ব্যতীত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা হউক, যেন তাঁহারা স্ব স্ব জেলায় প্রত্নতত্ত্ব এবং পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়ে সত্বর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে অনুরোধ পত্র পাঠান হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার।
সমর্থক— „ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে পরিচালন-সমিতির সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, এই সকল অনুরোধপত্র পাঠান হইয়াছে। ফলাফল আগামী সম্মিলনে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।

দশম প্রস্তাব—বঙ্গদেশে যে সকল মেডিক্যাল স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তৎসমুদয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করা হউক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন গবর্ণমেণ্টকে এই ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

পরিচালন-সমিতির সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, এই অনুরোধ করা হইয়াছে।

একাদশ প্রস্তাব—মানমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হাওড়ায় সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই সম্মিলন সেই প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদন করিতেছেন। তৎসম্বন্ধে সত্বরে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য শাখা-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক এবং এই সংবাদ কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে জ্ঞাপন করা হউক।

এই প্রসঙ্গে পরিচালন-সমিতির সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, গত সম্মিলনের নির্দ্দেশক্রমে এই সম্বন্ধে সত্বরে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য শাখা-সমিতিকে অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং এই সংবাদ কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ বাহাদুরকে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। মহারাজ বাহাদুর এই সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য যথাসময়ে জানাইবেন বলিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আগামী বর্ষের মধ্যে এ বিষয়ের চূড়ান্ত বিবরণ উপস্থিত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

দ্বাদশ প্রস্তাব—কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক এবং তজ্জন্য একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হউক। এই সম্মিলন আরও প্রকাশ করিতেছেন যে, যেন কোন কারণে এই স্থান রেলওয়ে কোম্পানী কর্তৃক কবলিত না হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।
সমর্থক—„ হরিসাধন পাইন।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব—বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার জন্য স্মৃতি-সমিতির হস্তে ৺ বঙ্কিম বাবুর দৌহিত্র শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিম বাবুর বৈঠকখানা ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিম বাবুর সূতিকাগারের জমির অংশ দান করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করায় এই সম্মিলন শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দু বাবুর এবং শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর নিকট বঙ্গের সাহিত্যিক-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর ভার অর্পণ করা হউক।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব—এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিতেছেন যে, অতঃপর মোক্তারী পরীক্ষা বঙ্গভাষায় প্রচলনের সমুচিত ব্যবস্থা করা হউক।

এই সম্পর্কে পরিচালন-সমিতির সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, উক্ত উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অনুরোধ করা হইয়াছে।

পঞ্চদশ প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, বর্ত্তমানে যে সকল ব্যক্তিগণকে লইয়া সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত আছে, বর্ত্তমান বর্ষে তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া উক্ত সমিতি গঠিত হউক।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা সম্মিলন-সাধারণ-সমিতির সদস্যরূপে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের মধ্য হইতে অনধিক ৬০ জনকে লইয়া উক্ত সমিতি গঠিত হউক।

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই প্রস্তাবে আপত্তি করেন এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাহা সমর্থন করেন। যে নিয়মে পরিচালন সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

পরিশেষে আলোচনান্তে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলা হইতে দুই জন করিয়া ৫২ জন এবং কলিকাতা হইতে ১২ জন—মোট ৬৪ জনকে আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন-সাধারণ-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত করা হউক। (তালিকা পরে দেওয়া হইল)।

ষোড়শ প্রস্তাব—এই সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনের সভাপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর্ বিজয়চন্দ্ মহ্তাব বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণে প্রতি বৎসরে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান এই চারি বিভাগে যে চারিটি পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত এবং কি ভাবে উহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।

পরিচালন-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, এই সম্পর্কে কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। স্থির হইল যে, মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করা হউক।

সপ্তদশ প্রস্তাব—আসাম গবর্ণমেণ্ট, বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়কে তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত মাসিক ২৫৲ হিসাবে সাহিত্যিক-বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জন্য এই সম্মিলন বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং আসাম গবর্মেণ্টের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই সম্পর্কে পরিচালন-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, উক্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

অষ্টাদশ প্রস্তাব—বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তির জন্য এই সম্মিলন বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত স্বদেশভূষণ দাশ
সমর্থক— " ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঊনবিংশ প্রস্তাব—১৩৪০ বঙ্গাব্দে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের তিরোভাবের পর শত বর্ষ পূর্ণ হইবে। অতএব এখন হইতে নয় বৎসর পরে অর্থাৎ উক্ত ১৩৪০ বঙ্গাব্দে এই রাধানগরে পুনরায় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার
সমর্থক— " স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বিংশ প্রস্তাব—আগামী সাহিত্য-সম্মিলনের সময় বঙ্গদেশের সমস্ত পাঠাগার হইতে প্রতিনিধি আহ্বান করিয়া বঙ্গীয় পাঠাগার-সম্মিলনী গঠন করিবার ব্যবস্থার জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সমর্থক— " পাঁচকড়ি সরকার

একবিংশ প্রস্তাব—সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিকে একটী স্থায়ী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-শাখা-সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করা হউক। এই শাখা-সমিতি প্রতি মাসে যে সকল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাঁহাদিগের মন্তব্য সহ সম্মিলনের প্রতি বার্ষিক অধিবেশনে সেই নির্ঘণ্ট আলোচনার জন্য উপস্থিত করিবেন।

প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী
সমর্থক— " রমাপ্রসাদ চন্দ

দ্বাবিংশ প্রস্তাব—রাধানগরে রামমোহন স্মৃতি-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমগ্র ভারতব্যাপী সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী এবং স্বর্গীয় মহাত্মার গুণমুগ্ধ ও অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই সাহায্য করিবার জন্য এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক— " ললিতমোহন সিংহ

ত্রয়োবিংশ প্রস্তাব—ভবিষ্যতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালার বাহিরের প্রধান প্রধান বিদ্যালয় সমূহ হইতে প্রতিনিধি আহ্বান করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করা হউক।

প্রস্তাবক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল সরকার
সমর্থক— „ রমাপ্রসাদ চন্দ

চতুর্ব্বিংশ প্রস্তাব—এই সম্মিলন, গুজরাট সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কান্তিলাল এম ধোলাকিন
সমর্থক— „ সতীন্দ্রসেবক নন্দী

পঞ্চবিংশ প্রস্তাব—অতঃপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের যাবতীয় কার্য্যে যথাসম্ভব স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিবার জন্য এই সম্মিলন, পরিচালন-সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক— „ অজিতকুমার মল্লিক
অনুমোদক— „ গৌরমোহন রায়
„ ললিতমোহন সিংহ
„ কৃষ্ণপদ দাস

ষড়বিংশ প্রস্তাব—হুগলী জেলার ইতিহাস লিখিবার জন্য উক্ত জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন কিংবদন্তী ও মন্দির প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহ করা হউক এবং উক্ত কার্য্যের জন্য একটী সমিতি গঠন করিবার ভার পরিচালন-সমিতির উপর অর্পিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী
সমর্থক—সভাপতি।

অতঃপর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্মিলনের পক্ষ হইতে, এই সম্মিলনের উদ্যোক্তা, সাহায্যদাতা এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় মহাশয়কে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাত-পত্নী শ্রীযুক্তা গোলাপ সুন্দরী দেবী মহোদয়াকে তাঁহাদের অকৃত্রিম আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত স্তর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই সময় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত রমা-প্রসাদ চন্দ মহাশয় সম্মিলনের আগামী অধিবেশন মুন্সীগঞ্জে আবাহন করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু উক্ত স্থানের পরিচয় প্রদান করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মুন্সীগঞ্জে (রামপালের উপকণ্ঠে) আগামী বর্ষে সম্মিলনকে আহ্বান করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই নিমন্ত্রণ গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত কান্তিলাল এম ধোলাকিন মহাশয় প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় উপরোক্ত ধন্যবাদ সকল অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে ত্রুটি স্বীকার করিলেন এবং জমিদার শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় মহাশয়ের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত শ্রীযুক্ত সরসীমোহন রায় মহাশয়ের লিখিত পত্র পাঠ করিলেন। (পরিশিষ্ট ঝ দ্রষ্টব্য)। তৎপরে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ বাবু সম্মিলনের অধিবেশনার্থ স্থান প্রদান করিবার জন্য 'রামমোহন মেমোরিয়াল কমিটির' কর্ত্তৃ-পক্ষকে, প্রতিনিধিগণের স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য স্থানীয় ও কলিকাতা হইতে সমাগত ডাক্তারগণকে ও ডাক্তারী ছাত্রগণকে, ঔষধাদি প্রদান করিবার জন্য বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌এর কর্ত্তৃপক্ষকে ও সম্মিলনের নানা-বিধ কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য স্থানীয় পল্লী-সমিতিকে, প্রতিনিধিগণের সেবা করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণকে এবং গমনাগমনের ও পানীয় জলের ব্যবস্থায় সাহায্য করিবার জন্য কমিশনার শ্রীযুক্ত জে এন্ গুপ্ত মহাশয়কে, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস এন রায় মহাশয়কে সব-ডিবিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়, ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড ও লোকাল বোর্ডএর কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ভগবানের নিকট প্রতিনিধিগণের মঙ্গল ও স্বাস্থ্য কামনা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দান ও বিদায় গ্রহণ করিলে সম্মিলনের কার্য্য সমাপ্ত হইল।

সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি

নদীয়া—

১। মৌলবী মোজাম্মেল হক,

২। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার,

হুগলী—

৩। „ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী,

৪। „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়,

খুলনা—

৫। „ সতীশচন্দ্র মিত্র,

৬। „ প্রফুল্লচন্দ্র রায়,

যশোহর—

৭। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র,

৮। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ,

বরিশাল—

৯। „ সুকুমার দত্ত,

১০। „ দেবকুমার রায় চৌধুরী,

ফরিদপুর—

১১। মৌলভী মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী,

১২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর,

হাওড়া—

১৩। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

১৪। „ পাঁচকড়ি সরকার,

ঢাকা—

১৫। „ চিত্তরঞ্জন দাস,

১৬। „ ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,

২৪ পরগণা—

১৭। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী,

১৮। শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী,

বর্দ্ধমান—

১৯। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক,
২০। " কৃষ্ণপদ দাস,

বীরভূম—

২১। " হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,
২২। " মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী,

বাঁকুড়া—

২৩। " অনিলবরণ রায়,
২৪। " রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি,

মেদিনীপুর—

২৫। " ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
২৬। " রামময় মণ্ডল,

মুর্শিদাবাদ—

২৭। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী,
২৮। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার,

রংপুর—

২৯। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
৩০। " বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

ময়মনসিংহ—

৩১। " কেদারনাথ মজুমদার,
৩২। " রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী,

দিনাজপুর—

৩৩। " কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়,
৩৪। " যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,

পাবনা—

৩৫। " রাধারমণ সাহা,
৩৬। " বসন্তকুমার চৌধুরী,

রাজসাহী—

৩৭। " কুমার শরৎকুমার রায়,

৩৮। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি,

মালদহ—

৩৯। " কৃষ্ণচরণ সরকার,

৪০। " ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী,

বগুড়া—

৪১। " হরগোপাল দাস কুণ্ডু,

৪২। " প্রভাসচন্দ্র সেন,

জলপাইগুড়ি

৪৩। " শান্তিধন রায়,

৪৪। " যোগেশচন্দ্র সান্যাল,

ত্রিপুরা—

৪৫। " চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ,

৪৬। " সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

চট্টগ্রাম—

৪৭। " ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী,

৪৮। " শশাঙ্কমোহন সেন,

দার্জ্জিলিং—

৪৯। " নিরঞ্জন সেন,

৫০। শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দাস,

নোয়াখালী—

৫১। শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ,

৫২। " সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র,

কলিকাতা

৫৩। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

৫৪। " কিশোরীমোহন গুপ্ত

৫৫। " ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী

৫৬। " যতীন্দ্রনাথ বসু,

৫৭। " রায় জলধর সেন বাহাদুর,

৫৮। " হেমন্তকুমার সরকার,

৫৯। " কান্তিলাল এম ধোলাকিন

৬০। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ,

৬১। " নরেন্দ্র দেব,

৬২। " জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

৬৩। " স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,

৬৪। " চারুচন্দ্র মিত্র

এতদ্ভিন্ন বঙ্গের বাহিরের শাখা-পরিষদের সম্পাদকগণ।

সাহিত্য-শাখার অধিবেশন

৭ই বৈশাখ, ১৩৩১

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর

স্থান—সম্মিলন-মণ্ডপ

সাহিত্য-শাখায় পাঠের জন্য ১৩টী কবিতা এবং ২২টী প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ৯টী কবিতা এবং ১০টী প্রবন্ধ মনোনীত হয় নাই। অবশিষ্ট ৪টী কবিতা ও ১২টী প্রবন্ধ পাঠের জন্য নির্ব্বাচিত হয়।

নিম্নলিখিত কবিতা এবং প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়।

(ক) কবিতা—

১। রাজা—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব

২। শব-সাধনা—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন দাস ঘোষ

৩। অনাহারে একাদশী—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রিয় চৌধুরী

৪। রাধানগরের বন্দনা-গীতি—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

(খ) প্রবন্ধ—

১। রাজর্ষি রামমোহনের রচনা-রীতি—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র

পাঠক—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

২। সাহিত্য ও জাতি গঠন—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এমএ, বিএল, এমএলসি

৩। সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল

৪। হরফের মামলা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ

৫। চণ্ডীদাস—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

৬। আরামবাগ সব্-ডিবিশনের অভাব অভিযোগ ও প্রতীকার প্রার্থনা—
—শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ শেঠ

৭। মাতৃভাষা—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল

৮। সাহিত্যে লৌকিক ধারা—শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি লিট্
পাঠক—শ্রীযুক্ত রামচরণ নাথ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহোদয় "প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ঝ—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি সময়াভাবে পঠিত না হওয়ায় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল—

১। সাহিত্যে সমালোচনার স্থান—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম এ

২। মেঘনাদবধে লক্ষণ—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র আয়কত এম এ. বি এল,

৩। সোমরস—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ভাগবত-শাস্ত্রী
সাংখ্য-পুরাণ-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

৪। বিস্যুদের দোষ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

তৎপরে সভাপতি এবং প্রবন্ধলেখক ও প্রবন্ধ-পাঠকগণকে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

দর্শন-শাখার অধিবেশন

৭ই বৈশাখ, ১৩৩১

সভাপতি—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এমএ, এম এল এ

স্থান—রামমোহন স্মৃতি-মন্দির

সর্ব্বসমেত এই শাখায় পাঠের জন্য ১৫টী প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। অধিকংশ প্রবন্ধই সম্পূর্ণ পঠিত হয় এবং কতকগুলির সার-মর্ম্ম মাত্র পঠিত হয়।

প্রবন্ধ—

১। যোগদর্শনের চিত্ত—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম এ. বি এল্
পাঠক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

২। ভক্তি-বাদ—শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
পাঠক—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভগবত-রত্ন এম এ।

৩। শূন্যতা নাগার্জ্জুনের বজ্রচ্ছেদিকা—ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্

পাঠক—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চৌধুরী

৪। বৈষ্ণব দর্শন—ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম এ, পিএচ্ ডি

পাঠক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ

৫। জৈন কথা—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল

৬। গীতার উপাস্যদেবতা (সারাংশ)—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বিদ্যারত্ন

এই সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বৌদ্ধধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়।

৭। বঙ্গদেশে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম এ

৮। ভারতীয় দর্শনের অব্যক্ত ইতিহাস—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

পাঠক—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল

৯। মায়া—শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি এ,

পাঠক—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল্

১০। কর্ম্মবাদ ও একেশ্বরবাস—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম এ

পাঠক—শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য

১১। পুরুষ-তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত হরিপদ গুপ্ত

পাঠক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

১২। সংক্ষিপ্ত দর্শন সমালোচনা—শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ

পাঠক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩। স্মৃতি ও ন্যায়মতে ধর্ম্মের রহস্য—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

পাঠক—শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল সরকার এম এ, বিএল

১৪। জন্মান্তরবাদ—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল

পাঠক—শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল সরকার এম্ এ, বি এল

১৫। দর্শন কথা—শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে, প্রবন্ধ-লেখক, পাঠক ও বক্তৃগণকে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

ইতিহাস-শাখা

৭ই বৈশাখ, ১৩৩১

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ

স্থান—রাধানগর সম্মিলন-মণ্ডপ

এই শাখায় পাঠের জন্য সর্ব্বসমেত নিম্নলিখিত ২০টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। সকল প্রবন্ধই পঠিত হইবে স্থির করা হয়। প্রত্যেক প্রবন্ধ পাঠের পর সাধারণকে আলোচনা করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। আলোচনার বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি অতি সংক্ষেপে প্রবন্ধের নামের সঙ্গে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পঠিত প্রবন্ধগুলির নাম ও তাহার আলোচনা

১। খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজ—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পইরা।

২। আর্য্যজাতির পুরাবৃত্ত—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি।

৩। হিন্দুর প্রাচীনত্ব—শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

৪। হিন্দুর রাজনীতি শাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব—কুমার ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পিএইচ ডি।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার এম এ মহাশয় প্রবন্ধটী পাঠ করার পর, সভাপতি মহাশয় মণ্ডলের ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন।

৫। প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদ—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম এ।

৬। জৈন মূর্ত্তিতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ, বি,এল।

শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বিএল মহাশয় এই প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৭। মূর্ত্তিতত্ত্বে অগ্নি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

৮। বঙ্গে শিল্পবিকাশ—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি এ। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় প্রবন্ধটী পাঠ করার পর, সভাস্থলে এই বিষয়ে অর্দ্ধঘণ্টা কাল আলোচনা হয়। দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ মহাশয় ঐ প্রবন্ধ সমালোচনা কালে বলেন যে, সেন রাজাদের সময় বঙ্গের শিল্প-কলার যে অবনতি হইয়াছিল, একথা তিনি স্বীকার করেন না। পক্ষে

তিনি শিল্প-কলা আবিষ্কার করিবার জন্য 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি' কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দেন।

মৌলবী মোজাম্মেল হক্ মহাশয় বলেন যে, মুসলমান শাসনকালে মুসলমানগণ মন্দিরাদি ভাঙ্গেন নাই—নানারূপ প্রাকৃতিক কারণে বঙ্গের শিল্প-কলা লোপ পাইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় পরে অতি সুন্দরভাবে শিল্প-কলার বিকাশের ধারা বুঝাইয়া দেন ও প্রসঙ্গক্রমে ময়ূরভঞ্জের নবাবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলির নামোল্লেখ করেন।

৯। সিপাহী বিদ্রোহে কলিকাতা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

১০। মহাবীর ও বুদ্ধের কাল-নির্ণয়—ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্।

প্রবন্ধ-পাঠক শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, ডাঃ বড়ুয়া প্রচলিত মত হইতে বিশেষ দূরে যান নাই।

১১। বঙ্গে রাজপুত--শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ।

১২। হরকোয়াদের গোষ্ঠী প্রথা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ।

শ্রীযুক্ত বিমান বাবু এই প্রবন্ধটীর সারাংশ ও নূতন তথ্য পাঠ করিয়া শুনান। সকলেই শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ের সাহিত্য-প্রীতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হন—কেন না তিনি সুদূর সুইজারল্যাণ্ড হইতে এখানে প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছেন।

১৩। নাথ যোগি-সমাজ, ধর্ম্ম ও আখ্যার উৎপত্তি ও বিশেষত্ব—ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু এই প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করেন।

১৪। ইউরোপযাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন।

১৫। চণ্ডীদাস—মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

সভাপতি মহাশয় লেখক মহোদয়ের দুই একটী সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে না পারায়, প্রতিবাদ করেন।

১৯। বামড়া রাজ্যের রাজা রাজীবলোচন রায় ও তদ্বংশীয়গণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সাহানা বি-এল

১৭। দিল্লীর শেষ বাদশাহ ও তৎসাময়িক দিল্লী—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

১৮। বাঙ্গলার ইতিহাসের কয়েকটী সমস্যা—শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী এম্এ

এই ইংরাজী লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় রাঢ়ের শিল্প-তত্ত্ব ও সম্পদ্ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সহিত একমত হইয়া বলেন যে, রাঢ়ই বাঙ্গলার অনেক বিষয়ের গুরু।

১৯। গড়বেতার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী

২০। গৌড়ে ব্রাহ্মণ্যশক্তি— " হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত গৌরমোহন রায় মহাশয় এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন।

প্রবন্ধ-লেখক ও পাঠকগণকে সভাপতি মহাশয় ধন্যবাদ দিলেন, এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। এই শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম-এ মহাশয় তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

বিজ্ঞান শাখা

৭ই বৈশাখ, ১৩৩১

সভাপতি—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি(এডিন) এফ আর এস ই

স্থান—সম্মিলন-মণ্ডপ

এই শাখায় পাঠের জন্য প্রাপ্ত ১২টি প্রবন্ধের মধ্যে একটি সাহিত্য-শাখায় দেওয়া হয় ও ২টি অমনোনীত হয়। অবশিষ্ট নিম্নলিখিত ৯টির মধ্যে প্রথম ৬টি সম্পূর্ণ পঠিত হয়, ৩টির সারমর্ম্ম পঠিত হয় এবং শেষটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

১। পরমাণু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ স্নেহময় দত্ত ডি এস্ সি (লণ্ডন), ডি আই সি, পি আর এস্।

পাঠক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ,

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর জব্বলপুর কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল দে এম-এ মহাশয় প্রবন্ধটি ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে relativity কাহাকে বলে তাহা সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেন।

২। বহুমূত্র—শ্রীযুক্ত ডাঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ বসু এম বি, এফ সি এস্।

পাঠক—শ্রীযুক্ত রামরূপ মিত্র।

৩। প্রাচীন ভারতে তাড়িত বার্ত্তা—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় নিম্নোক্ত তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন—

৪। ম্যালেরিয়া নিবারণার্থে মৎস্যের চাষ—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্‌সি, এফ জেড্ এস।

৫। শিশু-মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়—শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম এ, এম ডি।

৬। বলবর্দ্ধিত জমাটের কার্য্য (Re-inforced-concrete work)—

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

৭। উদ্ভিদের আত্ম-কাহিনী—শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী। লেখক কর্ত্তৃক সার-মর্ম্ম পঠিত হয়।

৮। দক্ষিণ-মেরু অভিযান-কাহিনী—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সার-মর্ম্ম পাঠ করেন :

৯। আয়ুর্ব্বেদে সদৃশ-বিধান—শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ,ডি লিট্,।

অতঃপর বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির মন্তব্যানুসারে বৎসরে যে সকল বৈজ্ঞানিক শব্দ সাময়িক পত্রে বা পুস্তকে ব্যবহৃত হইবে, তাহার নির্ঘণ্ট করিয়া ঐ সকল শব্দের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তাহা স্থির করিবার জন্য যে শাখা-সমিতি গঠিত হইবে, তাহার সভ্যগণের নাম বিজ্ঞান-বিভাগ মনোনীত করিবেন। তদনুসারে স্থির হইল যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হউন।—

১। আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই, ডি এস্‌সি, পিএচ্ ডি।

২। ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর এস ই।

৩। শ্রীযুক্ত মাখনলাল দে এম্ এ।

৪। „ ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্‌সি, এফ জেড্ এস।

৫। „ ডাঃ স্নেহময় দত্ত ডি এস্‌সি (লণ্ডন), ডি আই সি, পি আর এস।

৬। „ রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ বাহাদুর।

৭। „ গিরিশচন্দ্র বসু এম এ, এফ সি এস্।

৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম ডি।

৯। „ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি এ।

১০। „ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্।

১১। „ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস।

১২। „ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।

১৩। মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন খান বাহাদুর বি এল।

১৪। শ্রীযুক্ত রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর এম ডি।

১৫। „ ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র এম এ, পিএচ্ ডি।

১৬। „ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম এ, এল এম এস।

১৭। „ আশুতোষ দত্ত এম্ এ।

১৮। বিজ্ঞান-শাখার সেই বৎসরের সভাপতি।

১৯। „ সম্পাদক।

২০। „ সহকারী সম্পাদক।

পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বৎসরের জন্য বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি, সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন--

(ক) সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পিএচ্ ডি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

সমর্থক— „ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

(খ) সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ।

(গ) সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত এম এ।

সমর্থক— „ রামরূপ মিত্র।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক এবং পাঠকগণকে এবং সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং শ্রীযুক্ত মাখনলাল দে এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

(দ্বিতীয়াংশ)

পরিশিষ্ট

অভ্যর্থনা-সমিতির

কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা

পৃষ্ঠপোষক—জমীদার শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায়

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল

সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই

মিঃ জে এন্ গুপ্ত, আই সি এস্, এম এ (কমিশনার, বর্দ্ধমান বিভাগ)

রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর এম এ, বি এল

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল (হুগলী জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান)

মহান্তমহারাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গিরি

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মিত্র বি এল

মৌলভি জোবেদালি মোল্লা

মোল্লা এনামল হক্

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়, (সব-ডিভিসনাল অফিসার, আরামবাগ)

„ জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, বি এল

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, এম এল সি
„ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম এ ব্যাকরণতীর্থ } সাধারণ বিভাগ

বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকগণ—

শ্রীযুক্ত সরসীমোহন রায়
„ যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় } অভ্যর্থনা বিভাগ

„ বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল (সাহিত্য-শাখা)

„ মন্মথমোহন বসু এম এ (ইতিহাস-শাখা)

„ বিজয়গোপাল সরকার এম এ, বি এল (দর্শন-শাখা)

„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ (বিজ্ঞান-শাখা)

„ মন্মথনাথ রায় কাব্যতীর্থ (স্থানীয় কার্য্য পরিচালন বিভাগ)

সহকারী সম্পাদকগণ— শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর } সাধারণ বিভাগ

কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এম এল সি

সহকারী কোষাধ্যক্ষ	শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় বি এল শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল
হিসাব-পরীক্ষক—	শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু
স্বেচ্ছাসেবক অধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী এম এ, বি এল
ঐ সহযোগী	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় কাব্যতীর্থ

রায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল দে বাহাদুর	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিরত্ন
ক্ত অমরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	,, রমণীমোহন গোস্বামী
নগেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী	,, মহিমচন্দ্র বটব্যাল
হরেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী	,, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
নির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী	,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
বগলাচরণ বিশ্বাস	,, বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
নরেন্দ্রকুমার ভূরিশ্রেষ্ঠ	মোল্লা আতাউল হক্
নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত আঙ্গিরস আঢ্য
কিশোরীমোহন দত্ত	,, ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী
পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	,, বিনোদবিহারী রায়
নারায়ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্	,, বিষ্ণুপদ রায়
যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	,, গতিকৃষ্ণ বসু
জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ	,, সৌরেন্দ্রমোহন দে
জ্ঞানেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী	,, পুলিনচন্দ্র রায়
ডাঃ সারদাপ্রসাদ ভঞ্জ	,, অমূল্যনাথ বিশ্বাস
মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্ এস্	,, হরিধন কুণ্ডু
রামরূপ মিত্র	,, চন্দ্রমাধব সামন্ত
যোগেন্দ্রনাথ ভঞ্জ	,, সতীশচন্দ্র মিত্র
হারাধন রায়	,, গোপীনাথ গুপ্ত
,, ত্রিপুরাচরণ রায়	শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ

সন ১৩৩০ সালের ১৩ই মাঘ তারিখের সাধারণ অধিবেশনে ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার বিভিন্ন অধিবেশনে নিম্নোক্ত মূল সভাপতি ও শাখা-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন :—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সাহিত্য-শাখার সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর
দর্শন-শাখার সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র
ইতিহাস-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ
বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী

দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রথম নির্ব্বাচিত ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। প্রথম নির্ব্বাচিত সাহিত্য-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয় সময়াভাববশতঃ কার্য্য করিতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল মহাশয় সাহিত্য-শাখার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

(খ)

কার্য্যনির্ব্বাহক শাখা-সমিতির সভ্যগণ

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মিত্র
" যতীন্দ্রনাথ বসু
" কিশোরীমোহন গুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ
" হরিধন কুণ্ডু
" বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায়
" মন্মথমোহন বসু
" মন্মথনাথ রায়
" গতিকৃষ্ণ বসু

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী
" বিজয়গোপাল সরকার
" নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" কিশোরীমোহন দত্ত
" সুরেন্দ্রনাথ কর
" শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ
" সূর্য্যকুমার পাল
" হারাধন রায়

(গ)

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ

১। জমিদার শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায়
২। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু
৩। শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
৪। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (হাইকোর্টের বিচারপতি)
৫। মিঃ জে, এন, গুপ্ত (কমিশনার বর্দ্ধমান বিভা)
৬। শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর
৭। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (হুগলী জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান)
৮। শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
৯। মোল্লা এনামেল হক্
১০। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আরামবাগ)

১১। শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এল্ সি
১২। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মিত্র বি এল্
১৩। রায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল দে বাহাদুর
১৪। রাজা শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ লাহা সি আই, ই
১৫। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এটর্ণি-এট-ল
১৬। মৌলবী জোবেদালী মোল্লা
১৭। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ
১৮। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
১৯। মোল্লা আতাউল হক্
২০। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল, এম্ এল্ সি
২১। „ ত্রিপুরাচরণ রায়
২২। „ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু
২৩। „ রাধারমন সিংহ
২৪। „ কে, সি, বসু
২৫। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ব্যারিষ্টার
২৬। „ পণ্ডিত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিরত্ন
২৭। „ মহান্তমহারাজ সতীশচন্দ্র গিরি
২৮। „ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম এ
২৯। „ মন্মথনাথ রায়
৩০। „ ধর্ম্মদাস সামন্ত
৩১। „ এস, এন রায় আই সি এস) ম্যাজিষ্ট্রে
৩২। „ চন্দ্রকুমার পাল
৩৩। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায়
৩৪। „ শরৎকুমার আঢ্য
৩৫। „ ফকিরচন্দ্র পাল
৩৬। „ হরিপদ রায়
৩৭। „ নির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী
৩৮। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী
৩৯। „ সতীশচন্দ্র টাট
৪০। „ বঙ্কুবিহারী পণ্ডিত
৪১। মৌলভী খোন্দকার গোলাম হাফেজ
৪২। শ্রীযুক্ত ক্ষুধিরাম শেঠ
৪৩। „ কুঞ্জবিহারী বসু
৪৪। „ প্যারীমোহন বটব্যাল
৪৫। „ বিপিনবিহারী সিংহ
৪৬। „ সুরেন্দ্রনাথ দে
৪৭। „ জহরলাল লাহা
৪৮। „ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
৪৯। „ নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
৫০। „ অনুকূলচন্দ্র দে
৫১। „ যতীন্দ্রনাথ মান্না জমিদার
৫২। „ হারাধন রায়
৫৩। „ শরৎচন্দ্র পাল
৫৪। „ প্রবোধচন্দ্র মিত্র
৫৫। „ কিশোরীমোহন দত্ত
৫৬। „ যোগেন্দ্রনাথ নন্দী
৫৭। „ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৫৮। „ সতীশচন্দ্র সোম
৫৯। „ লক্ষীকান্ত সেনগুপ্ত
৬০। „ সুরেন্দ্রনাথ রায়
৬১। „ শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী
৬২। „ শীতলচন্দ্র বসু

৬৩। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ দত্ত

৬৪। „ সতীশচন্দ্র দে

৬৫। „ দিবাস্পতি ভট্টাচার্য্য

৬৬। „ সূর্য্যকুমার পাল

৬৭। „ নরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত

৬৮। রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর

৬৯। শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র রায়

৭০। „ চারুচন্দ্র রায়

৭১। „ অতুলচন্দ্র দে

৭২। „ হরিপদ মিত্র

৭৩। „ হরিসত্য ভট্টাচার্য্য বি এল

৭৪। „ রজনীকান্ত সেন

৭৫। „ যোগেন্দ্রনাথ ভঞ্জ

৭৬। „ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৭। „ নারায়ণদাস বটব্যাল

৭৮। „ গতিকৃষ্ণ বসু

৭৯। „ বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায়

৮০। „ চন্দ্রমাধব সামন্ত

৮১। „ রামগোপাল পণ্ডিত

৮২। „ সৌরীন্দ্রমোহন দে

৮৩। „ নরেন্দ্রনাথ ভূরিশ্রেষ্ঠ

৮৪। „ বেচারাম ভট্টাচার্য্য

৮৫। „ উপেন্দ্রনাথ কর

৮৬। „ যজ্ঞেশ্বর মিত্র

৮৭। „ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

৮৮। „ কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়

৮৯। „ বগলাচরণ বিশ্বাস

৯০। „ প্রিয়নাথ গরাই

৯১। „ পঞ্চানন রায়

৯২। শ্রীযুক্ত হারধন কুণ্ডু

৯৩। „ অনাথনাথ মিত্র

৯৪। „ গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস

৯৫। „ বিজয়গোপাল সরকার

৯৬। „ সতীশচন্দ্র বিশ্বাস

৯৭। „ প্রফুল্লচরণ দত্ত

৯৮। „ পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৯৯। „ আভাসচন্দ্র বসু

১০০। অনাদিচরণ নিয়োগী

১০১। রায় বিহারিলাল মিত্র

১০২। প্রফুল্লকমল বসু

১০৩। „ রমণীমোহন বসু

১০৪। ত্রিপুরাচরণ হাজরা

১০৫। হরিপদ পালধী

১০৬। „ হরিশ্চন্দ্র সরকার

১০৭। „ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

১০৮। „ ডাঃ রামনারায়ণ রায়

১০৯। „ হরিবিলাস রায়

১১০। „ আঙ্গিরস আঢ্য

১১১। „ জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ

১১২। „ যামিনীমোহন কর

১১৩। „ প্রভাসচন্দ্র রায়

১১৪। „ নকরচন্দ্র আটা

১১৫। „ দেবেন্দ্রনাথ চ্যাং

১১৬। „ চারুচন্দ্র সিংহ

১১৭। „ মহিমচন্দ্র বটব্যাল

১১৮। „ যামিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

১১৯। „ গোপেন্দ্রনাথ বসু

১২০। „ সরসীমোহন রায়

১২১। „ প্রসন্নকুমার শেঠ

১২২। শ্রীযুক্ত ডাঃ সারদাপ্রসাদ ভঞ্জ
১২৩। " হেমচন্দ্র ঘোষ
১২৪। " গোপীনাথ গুপ্ত
১২৫। " যতীশচন্দ্র ঘোষ
১২৬। " বীরেন্দ্রনাথ বসু
১২৭। " সতীশচন্দ্র ঘোষ
১২৮। " কবিরাজ হরিপদ গুপ্ত
১২৯। " সত্যেন্দ্রনাথ পাইন
১৩০। " ভূতনাথ সরকার
১৩১। " বঙ্কিমচরণ মল্লিক বি এল
১৩২। " নরেন্দ্রনাথ সেন
১৩৩। " নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৩৪। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩৫। মৌলবী তোশোদ্দক্ হোসেন
১৩৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যনাথ বিশ্বাস
১৩৭। " অমরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩৮। " সতীশচন্দ্র চৌধুরী
১৩৯। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ
১৪০। ডাঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দত্ত
১৪১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় কাব্যতীর্থ
১৪২। " বলরাম রায় চৌধুরী
১৪৩। " পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪৪। " বৈদ্যনাথ দত্ত
১৪৫। " ললিতরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
১৪৬। " মোহিনীমোহন গোস্বামী
১৪৭। " ঈশানচন্দ্র মণ্ডল
১৪৮। " সতীশচন্দ্র মিত্র
১৪৯। " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়
১৫০। " কেনারাম কুণ্ডু
১৫১। অধরচন্দ্র পালধী
১৫২। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
১৫৩। " বিষ্ণুপদ রায়
১৫৪। " মৃগেন্দ্রনাথ বসু
১৫৫। " ডাঃ রামরূপ মিত্র
১৫৬। " নলিনীরঞ্জন ঘোষ
১৫৭। " রমণীমোহন গোস্বামী
১৫৮। " বিহারচন্দ্র আঢ্য
১৫৯। অমরেন্দ্রনাথ বসু
১৬০। " বিনোদবিহারী রায়
১৬১। " সচ্চিদানন্দ সেন গুপ্ত বিএল
১৬২। " রাধিকাপ্রসাদ শেঠ
১৬৩। " নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৬৪। " শশিভূষণ দত্ত
১৬৫। " রজনীকান্ত গুপ্ত
১৬৬। " অমৃতলাল কুণ্ডু
১৬৭। " প্রভাকর মুখোপাধ্যায়
১৬৮। " পঞ্চানন বসু (১)
১৬৯। " সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
১৭০। " নারায়ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
১৭১। " অংশুপ্রকাশ মল্লিক
১৭২। " যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
১৭৩। " বঙ্কিমচন্দ্র কর
১৭৪। " শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী
১৭৫। " হরেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী
১৭৬। " মহেন্দ্রনাথ রায়
১৭৭। "
১৭৮। " চণ্ডীচরণ নন্দা
১৭৯। " পঞ্চানন বসু (২)

১৮০। মৌলভী সেখ আবদুল সরকার
১৮১। শ্রীযুক্ত মনোজকুমার বসু
১৮২। „ অতুলচন্দ্র ঘোষ
১৮৩। „ কিরণচন্দ্র দত্ত
১৮৪। „ কৈলাসচন্দ্র দাস
১৮৫। „ বিজয়কুমার সিংহ
১৮৬। „ কনকপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
১৮৭। শ্রীযুক্ত মণিলাল চুণীলাল হীরালাল শ্রীমল
১৮৮। „ নগেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী
১৮৯। „ ব্রজনাথ রায়
১৯০। „ পঞ্চারাম লাহা
১৯১। „ মোহিনীমোহন রায়
১৯২। „ শিবনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
১৯৩। „ বিনোদবিহারী হজারা

(ঘ)

প্রতিনিধিগণ

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
২। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ
৩। „ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
৪। „ কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ
৫। „ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
৬। „ রায় জলধর সেন বাহাদুর
৭। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
৮। „ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
৯। „ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
১০। „ রায় বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর
১১। „ শীতলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
১২। „ ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৪। „ কৃষ্ণপদ দাস
১৫। „ ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৬। „ রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
১৭। „ নন্দলাল দাস
১৭। „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
১৮। „ অক্ষয়কুমার কুণ্ডু
১৯। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু
২০। „ সত্যেন্দ্রিয় চৌধুরী
২১। „ নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
২২। „ মন্মথনাথ কুমার
২৩। „ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন
২৪। „ সত্যপ্রসন্ন ঘোষ
২৫। „ হরলাল মজুমদার
২৬। „ অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য
২৭। „ যুগলকিশোর চট্টোপাধ্যায়
২৮। „ রামময় মণ্ডল (চন্দ্রকোণা)
২৯। „ রাধারমণ সাহা (পাবনা)
৩০। „ গৌরমোহন রায় (হাওড়া)
৩১। „ অজিৎকুমার মল্লিক
৩২। „ স্বদেশভূষণ দাস
৩৩। „ রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী (ময়মনসিংহ)
৩৪। „ সত্যসাধন রায়
৩৫। „ হরিসাধন পাইন
৩৬। „ হীরালাল পাত্র

৩৭। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ

৩৮। „ মাখনলাল দে

৩৯। „ জগচ্চন্দ্র ভৌমিক

৪০। „ প্রিয়নাথ মিত্র

৪১। „ বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

৪২। „ সতীন্দ্রসেবক নন্দী

৪৩। „ কান্তিলাল এম ধোলাকিন

৪৪। „ ললিতমোহন সিংহ

৪৫। „ সূর্য্যকুমার ঘোষাল

৪৬। „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

৪৭। „ আশুতোষ দত্ত

৪৮। „ ফণিভূষণ মজুমদার

৪৯। „ বিবেকরঞ্জন মজুমদার

৫০। „ শুইরাম দত্ত

৫১। „ পাঁচকড়ি সরকার

৫২। „ সন্তোষকুমার অধিকারী

৫৩। „ রাজেন্দ্রনাথ সিংহ

৫৪। „ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (মেদিনীপুর)

৫৫। „ ব্রজমাধব রায় ঐ

৫৬। „ তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

৫৭। „ ভূপেন্দ্রনাথ বসু

৫৮। „ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

৫৯। „ হরেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী

৬০। „ মাখনলাল হালদার

৬১। „ শশিভূষণ সিংহ

৬২। „ ফণিভূষণ ঘোষ

৬৩। „ এস্ এন রায়

৬৪। শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল

৬৫। „ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন (হেতমপুর)

৬৬। „ যতীন্দ্রনাথ বসু

৬৭। „ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম এ

৬৮। „ ফণিভূষণ ঘোষ

৬৯। „ কিশোরীমোহন গুপ্ত

৭০। „ হেমচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা)

৭১। „ কিরণচন্দ্র দত্ত „

৭২। „ অঘোরনাথ সাহানা বি এল (আরামবাগ)

৭৩। „ হারাধন রায় (নন্দনপুর)

৭৪। „ সুখেন্দ্রলাল মিত্র

৭৫। „ গঙ্গাধর সেন

৭৬। „ পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

৭৭। „ সুধীরচন্দ্র ঘোষাল

৭৮। „ সুরেন্দ্রনাথ কর

৭৯। „ নৃপেন্দ্রনাথ বসু

৮০। „ দেবেন্দ্রনাথ নন্দী

৮১। „ ললিতমোহন রায় চৌধুরী

৮২। „ রমণীমোহন বসু

৮৩। „ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় (নন্দনপুর)

৮৪। „ ভূতনাথ সরকার „

৮৫। „ অনাদিচরণ নিয়োগী „

৮৬। „ চারুচন্দ্র রায় „

৮৭। „ মৃগেন্দ্রনাথ বসু

৮৮। „ গঙ্গারাম লাহা (রাজহাটী

৮৯। „ ললিতমোহন মিত্র (সেনহাট)

৯০। „ মন্মথনাথ রায় (উবিদপুর)

৯১। শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
৯২। " বঙ্কুবিহারী পণ্ডিত
৯৩। " ছুখিরাম শেঠ
৯৪। " কুঞ্জবিহারী বসু
৯৫। " যতীন্দ্রনাথ মান্না (শিবপুর)
৯৬। " প্রবোধচন্দ্র মিত্র
৯৭। " মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
৯৮। " যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৯। " সতীশচন্দ্র সেন
১০০। " সুরেন্দ্রনাথ রায়
১০১। " শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী
১০২। " রাজা হৃষীকেশ লাহা
১০৩। " শীতলচন্দ্র বসু
১০৪। " অমূল্যচরণ দত্ত
১০৫। " ত্রিপুরাচরণ রায়
১০৬। মোল্লা আতাউল হক
১০৭। শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য
১০৮। " রজনীকান্ত সেন গুপ্ত
১০৯। " গতিকৃষ্ণ বসু
১১০। " বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায়
১১১। " চন্দ্রমাধব সামন্ত
১১২। " দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
১১৩। " বিজয়গোপাল সরকার (লতিবপুর)
১১৪। মিঃ কে, সি, বসু
১১৫। শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র আটা
১১৬। রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর
১১৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী
১১৮। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চ্যাং
১১৯। " চারুচন্দ্র সিংহ
১২০। " মন্মথমোহন বসু এম্ এ (দশঘরা)
১২১। " জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ কলিকাতা
১২২। " ত্রিপুরাচরণ হাজরা
১২৩। " সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১২৪। " অমরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৫। " অমরেন্দ্রনাথ রায়
১২৬। " কার্ত্তিকচন্দ্র বসু
১২৭। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়
১২৮। " শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসু
১২৯। " শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী
১৩০। " মহেন্দ্রনাথ রায়
১৩১। মৌলভী সেখ আবদুল সরকার
১৩২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গিরি
১৩৩। " বিজয়চন্দ্র সিংহ
১৩৪। " কনকপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
১৩৫। " শ্রীযুক্ত মণিলাল, চুণীলাল, হীরালাল শ্রীমল
১৩৬। " বিদুরচন্দ্র আঢ্য
১৩৭। " যতীন্দ্রনাথ আঢ্য
১৩৮। " সতীশচন্দ্র বর্ম্ম
১৩৯। " শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী
১৪০। " শরৎচন্দ্র পাল

(ঙ)

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিত্র
২। " হরেকৃষ্ণ মিত্র
৩। " ডাক্তার রামরূপ মিত্র
৪। " অনিলকুমার বসু
৫। " হরিদাস রায়
৬। " সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়
৭। " প্রবোধচন্দ্র মিত্র
৮। " সুধীরচন্দ্র পাত্র
৯। " দেবেন্দ্রনাথ সিংহ
১০। " বীরেন্দ্রনাথ হাজরা
১১। " সুকদেব মুখোপাধ্যায়
১২। " লক্ষ্মীনারায়ণ কোঙার
১৩। " গোলকবিহারী ভট্টাচার্য্য
১৪। " অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
১৫। " নরেন্দ্রনাথ বসু
১৬। মৌলভী সেখ্ মণ্ডলা বক্স
১৭। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ফরিকেল
১৮। " মাণিকলাল কর
১৯। " বঙ্কিমচন্দ্র নিয়োগী
২০। " ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
২১। " রাজেন্দ্রনাথ মঙ্গল
২২। " সতীশচন্দ্র মাজী
২৩। " ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২৪। " ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
২৫। " রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬। " দেবীদাস মুখোপাধ্যায়
২৭। শ্রীযুক্ত মদনসাধন বটব্যাল
২৮। " ধরণী বটব্যাল
২৯। " অমরেন্দ্রনাথ হাজরা
৩০। " কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়
৩১। " প্রভাসচন্দ্র বাইরি
৩২। " কালীপদ মাইতি
৩৩। " সত্যনারায়ণ দত্ত
৩৪। " ধরিত্রী পণ্ডিত
৩৫। " নারায়ণ সরকার
৩৬। " রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৭। " প্রফুল্লকুমার বসু
৩৮। " যুগলকৃষ্ণ সিংহ রায়
৩৯। " পঞ্চানন বটব্যাল
৪০। " বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৪১। " সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪২। " বিনয়কৃষ্ণ মিত্র
৪৩। " পঞ্চানন পণ্ডিত
৪৪। " কিশোরীমোহন ভূরিশ্রেষ্ঠ
৪৫। " ভোলানাথ রায়
৪৬। " কমলকৃষ্ণ মিত্র
৪৭। " বলরাম আগমবাগীশ
৪৮। " শরৎকুমার রায়
৪৯। " সনৎকুমার রায়
৫০। " বলাইলাল ভট্টাচার্য্য
৫১। " মৃগেন্দ্রনাথ বসু
৫২। " নবনীকুমার বিশ্বাস

(চ)

আয়-ব্যয় বিবরণ

জমা—

১। সাধারণের নিকট ও অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের নিকট প্রাপ্ত——১৭২৫৲

২। প্রতিনিধিগণের প্রবেশিকা ২৲ হিঃ——২৮০৲

৩। সম্মিলনের নিকট সাহায্য প্রাপ্তি——১৪৲

৪। সম্মিলনের উদ্বৃত্ত সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি বিক্রয় বাবদ——৩৪।০

২০৫৩।০

মোট জমা——২০৫৩।০

মোট খরচ——১৮৬০।৫

উদ্বৃত্ত ১৯২৸/১৫

খরচ—

১। ডাকটিকিট, টেলিগ্রাম, মনিঅর্ডার ফিঃ ইত্যাদি বাবদ——৮৭।০

২। ট্রেন, ষ্টীমার, পাল্কি ও মুটে ভাড়া ট্রাম ও গাড়ী ভাড়া——৩১৩৸৵১০

৩। সম্মিলনের বিভিন্ন কার্য্যের জন্য কলিকাতার গাড়ী ভাড়া——১৭৪৸০

৪। মণ্ডপ নির্ম্মাণ জমিদার শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় মহাশয়ের মণ্ডপের জন্য ৩০০৲ টাকা দেওয়া বাদে অবশিষ্ট খরচ——১৫০৲

৫। সাজসরঞ্জাম ও আলোক ও ডেকরেশন——৩৮৬৵১০

৬। পথে ও মণ্ডপে প্রতিনিধিগণের আহার্য্য ইত্যাদি——১৯৬৴১০

৭। পথে ও মণ্ডপে স্বেচ্ছা-সেবকগণের আহার্য্য ইত্যাদি——১২৮৸/১০

৮। কর্ম্মচারীর ও পত্রবাহকের বেতন——৫০৸/০

৯। মুদ্রণ——৪২।৵০

১০। ফটোগ্রাফার——৮৬৲

১১। প্রদর্শনীর খরচ——৯০।০

১২। অন্যান্য খুচরা খরচ——৮৫৵১০

১৩। ষ্টেশনারী——৬৮।/১৫

১৮৬০।৫

উল্লিখিত খরচ ব্যতীত জমিদার শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় মহাশয় সম্মিলনের মণ্ডপের জন্য, প্রতিনিধিগণের আহারাদি ও যানবাহনাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য

প্রায় ৪০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী শ্রীযুক্তা গোলাপ-সুন্দরী দেবী মহোদয়াও আহারাদির ব্যবস্থা ও নগদ ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
কোষাধ্যক্ষ

শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত
সম্পাদক

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু
হিসাব-পরীক্ষক

১লা মার্চ্চ, ১৯২৫ সাল

(ছ)

চাঁদাদাতৃগণ

যাঁহারা অভ্যর্থনা-সমিতির ভাণ্ডারে অন্যূন ১০৲ দশ টাকা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা ও সাহায্যের পরিমাণ :—

১।	শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু	২৫০৲
২।	শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবী	২০০৲
৩।	রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা বাহাদুর	১৫০৲
৪।	শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ হাজরা	১৫০৲
৫।	,, যতীন্দ্রনাথ বসু	১০০৲
৬।	,, সতীশচন্দ্র গিরি	১০০৲
৭।	,, স্তর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	১০০৲
৮।	মৌলবী আতাউল হক্	৫০৲
৯।	কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়	২৫৲
১০।	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী	২৫৲
১১।	,, বিদুরচন্দ্র আঢ্য	২৫৲
১২।	,, মহেন্দ্রনাথ রায়	২৫৲
১৩।	,, প্রবোধচন্দ্র মিত্র	২৫৲
১৪।	,, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৫৲
১৫।	,, সতীশচন্দ্র সেন	২৫৲
১৬।	,, ত্রিপুরাচরণ রায়	২৫৲
১৭।	মিঃ এস্ এন্ রায়	২৫৲

১৮।	শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র আটা	২০৲
১৯।	মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	২০৲
২০।	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসু	২০৲
২১।	,, বিজয়চন্দ্র সিংহ	১০৲
২২।	,, কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী	১০৲
২৩।	,, মণিলাল চুণিলাল হীরালাল শ্রীমল	১০৲
২৪।	,, জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	১০৲
২৫।	,, যতীন্দ্রনাথ মান্না	১০৲
২৬।	,, অমূল্যচরণ দত্ত	১০৲
২৭।	,, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১০৲
২৮।	,, চারুচন্দ্র সিংহ	১০৲
		১৪৬৫৲

(জ)

রাধানগর শিল্প-প্রদর্শনী

প্রদর্শিত দ্রব্যের বিবরণ ও প্রদাতৃগণ—

১। কুমড়া ২টি, প্রত্যেকটি সাড়ে বার সের ওজন। প্রদাতা—মৌলবী জোবেদ আলী মোল্লা, ধরমপুর।

২। তামাক পাতা খুব বড় রকমের—প্রদাতা— ঐ

৩। তরমুজ। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মুখোপাধ্যায় (রঘুনাথপুর)।

৪। লাউ। পঁচিশসের ও আধমন পর্য্যন্ত। প্রদাতা—সিরাজুল হক (সাবলসিংপুর)।

৫। কাগজ ও ব্লটিং ৪ চারি রকম—কাগজি বলিয়া এক জাতি আছে। কাগজ প্রস্তুত করাই উহাদের ব্যবসা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহাদের প্রস্তুত কাগজের বেশী দাম বলিয়া বাজারে তেমন চাহিদা না থাকাতে উহা অন্য কাজের হইয়াছে, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সাগর হাজরা, দেওয়ানগঞ্জ।

৬। ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, জাঁতি। মূল্য বাজার অপেক্ষা সস্তা বলিয়া মনে হয়। প্রদাতা— ঐ

৭। ঘড়া ছয় প্রকার। ঘড়ার মধ্যে অনেক কারিগরী ছিল। ডোঙ্গোলের তৈয়ারী। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। ছোট ঘটী। ঘটীর ধাতু অনেকটা এলুমিনিয়মের মত। কৃষ্ণনগরে তৈয়ারী। প্রদাতা— ঐ

৯। রেশম। দুই রকম। দেওয়ানগঞ্জের প্রস্তুত। পূর্ব্বে দেওয়ানগঞ্জে রেশমের কাজ খুব বেশী ছিল। আপাততঃ আছে, কিন্তু খুব দুরবস্থা। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সাগর হাজরা।

১০। দুইদিক চরকার ধুতি, আট রকম। বড়ডোঙ্গল "গান্ধী আশ্রমে" প্রস্তুত। ১৩২৯ সালে বন্যার সময় 'হুগলী জেলা রাষ্ট্রীয়-সমিতির' চেষ্টায় একটি রিলিফ-কমিটি খোলা হইয়াছিল এবং কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সাগর হাজরা, প্রফুল্ল সেন ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়গণ এখানে সাহায্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসেন। পরে দুঃস্থ গ্রামবাসীদের চরকা দেওয়া হয়, এখন উহা খুব কার্য্যকরী হইয়াছে। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সাগর হাজরা

১১। সাড়ী, দুই রকম। ঐ ঐ ঐ

১২। জামার কাপড়, দশ রকম। ঐ ঐ ঐ

১৩। তোয়ালে, চারি রকম। ঐ ঐ ঐ

১৪। গায়ের কাপড়। ঐ ঐ ঐ

১৫। Acitate of Iron—বড়ডোঙ্গল "গান্ধী আশ্রমে" প্রস্তুত। প্রাদাতা— ঐ

১৬। প্রদর্শনীতে খাঁটী খদ্দর বুনিয়া দেখান হয়।

১৭। চরকার সুতা, পাঁচ রকম। 'দুয়াদণ্ড খাদি কেন্দ্র' হইতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন কর্ত্তৃক প্রেরিত।

১৮। প্রদর্শনীর মণ্ডপে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেন মহাশয়ের উদ্যোগের বার জন বালক সুতা কাটিয়া দেখাইতেছিলেন।

১৯। সূক্ষ্ম কাজকরা রেকাব—বড়ডোঙ্গলের প্রস্তুত। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অমূল্য হাজরা।

২০। আবলুস কাঠের রুল, দুইটি।

২১। বেলুন, দুই রকম।

২২। কমল, দুই রকম।

২৩। হুকার নলিচা, পাঁচ রকম। বদনগঞ্জে প্রস্তুত প্রদাতা শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী চন্দ্র।

২৪। কেঠের কাপড় ও চাদর। বদনগঞ্জে প্রস্তুত। প্রদাতা—বদনগঞ্জের পোষ্ট মাষ্টার।

২৫। কাগজের ফুল। অবিকল স্বাভাবিক গেঁদা ফুলের মত হইয়াছিল। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র সরকার, কৃষ্ণনগর।

২৬। ভাল উলের ও সুতার কাজ। প্রদাতা—শ্রীমতী কাত্যায়নী বসু, কুমারহাট।

২৭। উলের কাজের শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি। প্রদাতা—শ্রীমতী ফুটন্তবালা দাসী খামারগোর।

২৮। কুশীর কাজ। প্রদাতা—শ্রীমতী লীলাবতী দাসী, সোনাটিকরী।

২৯। তালপাতার পাখা। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ফণীলাল মিত্র, রাধানগর।

৩০। সূক্ষ্ম কাজকরা চাঙ্গারী। প্রদাতা—শ্রীকেদার ডোম, পোল।

৩১।৩২। ধান, চাল, জিরে ইত্যাদির মালা। প্রদাতা—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী ও শ্রীমতী দক্ষবালা দেবী, মাধবপুর।

৩৩। সুতার বোনা আসন। প্রদাতা—শ্রীমতী নন্দরাণী মজুমদার, লাঙ্গলপাড়া।

৩৪। চন্দনের ঝিনুকের মালা। প্রদাতা—শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী রায়, লাঙ্গলপাড়া।

পরিশিষ্ট—ক

মঙ্গলাচরণ

সম্যাতা মহতী সভা শুভকরী সাহিত্য-সম্মেলনী
যস্যাঃ পঞ্চদশাধিবেশনমিদং ভাব্যং হি সাহিত্যিকৈঃ॥
নানাদেশনিবাসিনো গুণবতাং শ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠা জনাঃ
আয়াতাঃ সমলঙ্কৃতাং বুধবরাঃ কুর্ব্বন্তি যাং সোৎসবং॥
ভক্তাভীষ্টপ্রদশ্চিরং করুণয়া ধ্যানাস্পদং যোগিনাং
সারাসারবিচারহীনমনসাং তর্কেণ লভ্যো ন যঃ।
পায়াত্তাং সততং সভাং শুভকরীং শ্রীগোপীনাথপ্রভুঃ
সর্ব্বাংস্তান্ গুণিনস্তথা বুধজনান্ যে চাত্র চাভ্যাগতাঃ॥

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট—খ

স্বাগতঃ-সম্ভাষণ

শাস্ত্রী শ্রীলহরপ্রসাদ ইতি যো বিখ্যাত এতদ্‌ভবে
সোঽয়ং নো নয়নাগ্রতো নবসভাপাণিগ্রহো রাজতে।
দৃষ্টেমং বরভূসুরং সুরগণঃ সম্পূজ্য পাদাম্বুজম্
স্বর্গান্মর্ত্ত্যগতং গুরুং সুরপতের্মন্যামহে গীষ্পতিম্॥
শাস্ত্রং গৌতমভাষিতং সুকঠিনং গূঢ়ার্থগুপ্তাঙ্গকম্
ছাত্রাণাং সুখবোধকং ভবতু বৈ সঞ্চিন্ত্য চৈবং মুদা।
সর্ব্বং তদ্ধ্যনূদিতবানয়মহো বঙ্গীয়-ভাষাক্ষরৈঃ
ধন্যং ধন্যমতঃ সুপুণ্যযশসাং নাস্ত্যস্য সীমান্তরম্॥

ভো ভো ভবন্তমধুনা বয়মত্র বিদ্বন্! পারং গতং সকলশাস্ত্রমহার্ণবস্য।
উচ্চৈস্তমং বুধবরং হ্যভিনন্দয়ামো দোষান্ হরন্ হরসমঃ কুরু নঃ প্রসাদম্॥

সাহিত্যার্ণবতোয়সারমমলং সংহৃত্য ভাবাক্ষরৈঃ
সেনঃ শ্রীর্জলধরো রায়োঽত্র বাহাদুরঃ।
প্রাগাসীচ্ছ্রুতমস্য কীর্ত্তিবিপুলং সৎকর্ম্ম লোকাস্যতো
নায়ং নো সদসি স্থিতো বুধবরঃ প্রীতিং পরাং যচ্ছতি॥
ঐতিহ্যে নিখিলে প্রমাণনিপুণো শ্রীলপ্রসাদো রমা
শ্চন্দ্রোঽয় স্বৈতিহাসিক-শাখি-হস্ত-সদসমিন্দুপ্রভঃ।
বৃত্তং পূর্ব্বতনং বদন্ জনগণৈরালক্ষ্যতে হর্ষতঃ
কোঽয়ং কোঽয়মিতি স্বয়ং কিমু গতো ব্যাসঃ পুনর্ভূতলে॥
নানাদর্শনদর্শনাল্লয়নয়োরস্মাকমুচ্চৈস্তরম্
আহ্লাদং জনয়ন্নয়ং হি পরিষৎ-সংদৃশ্য সন্দর্শনঃ॥
মিত্রাণাং কুলভূষণো গুণি-গণৈর্জ্ঞানীতি সংজ্ঞান্বিতঃ।
শ্রীল শ্রীপ্রবিরাজতে রবি-সমো নাথঃ খগেন্দ্রঃ স্বয়ম্॥
অজ্ঞানাং জ্ঞানগম্যং নহি নহি খলু যদ্ বিজ্ঞ-বিজ্ঞেয়-শাস্ত্রম্
তচ্ছংসন্ মুগ্ধবুদ্ধেরয়মতিনিপুণশ্চৌধুরী লালপূর্ব্বঃ॥
শ্রীযুক্তো বনওয়ারী কবিকুলতিলকৈঃ প্রাজ্ঞবর্য্যৈঃ প্রশংস্যো
বিজ্ঞানামজ্ঞতাদঃ সদসি বিজয়তে পৌর্ণমাস্যাং শশীব॥

দ্রৌপদীব সভা চেয়ং পতিভিঃ পঞ্চভির্যুতা ।
বদন্তী হিত-বাক্যানি শোভতেঽদ্বৈতকাননে ॥
গুপ্তা গুপ্তাবতংসেনি কশোরীমোহনেনচ ।
দুঃশাসনবিনির্ম্মুক্তা ধৃতরাষ্ট্রসুপোষিতা ॥
ধরণীমোহনশ্চাস্যাঃ শ্রীযুক্তো ভূভৃতাম্বরঃ ।
শ্রীবিকর্ণ ইবাভাতি সততং পৃষ্ঠপোষকঃ ॥

নানাদেশসমাগতান্ সহৃদয়ান্ সাহিত্যসম্পদ্‌যুতান্
বিজ্ঞান্ বঙ্গবসুন্ধরোজ্জ্বলমণীন্ সদ্‌বঙ্গভাষান্বিতান্ ।
সর্ব্বান্ বো হ্যভিবাদয়াম, মহতোঽস্মদ্ভাগ্যতোঽত্রস্থিতান্—
যূয়ং নঃ কুরুতাত্র দেশবিষয়ে সদ্‌দৃষ্টিপাতান্ বুধাঃ ॥
অস্মদ্দেশসমুদ্ভবা বুধবরাঃ সন্ত্যেব চাসংখ্যকাঃ
কিন্ত্বেনং পরিহায় তে হি ধনিনস্তিষ্ঠন্তি নেত্রান্তরে ।
দূরে চাস্তু কথা স্বদেশ-কুশলে নামাপি কুর্ব্বন্তি নো
হা হা ধিক্‌পদমাস্থিতানপি পরং তিষ্ঠন্তু তত্রৈব তে ॥

এতান্ সমাগতজনানধুনা সদঃস্থান্, সম্ভাবয়ামি সকলানমিতপ্রভাবান্ ।
সর্ব্বেঽত্র সন্তু সুখিনো ভগবৎপ্রসাদাদ্‌ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতু সদা পরলোকবন্ধুঃ

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ।

আশীর্ব্বচন

১ । গোপীনাথঃ পরাত্মা পরমকরুণয়া পাপতাপাদি হন্তুং
শ্রীমদ্দেশে ঘণ্টেশ্বরবিভুসহিতো যং সমাজং বিভর্ত্তি ।
ধ্যানাগম্যং যোগিনামতিপরমধনং যদ্দ্বয়ং সাধকানাম্
তৎপাদাম্ভোজরেণুঃ সমবতু সকলানাগতান্ ভিন্নবর্ণান্ ॥

২ । যো ধত্তে ধেনুবৃন্দং সুমধুরমুরলীং পার্শ্বতো গোপবালাং
যো ভূর্নাগাৎ স্বয়ম্ভুঃ কলিকলুষহরাং কালিকাং প্রাচি ভাগে
যাবাত্মানাবগম্যাধ্বনলয়কৃতৌ মূর্ত্তিমন্তৌ শুভার্থং
ভক্ত্যা সর্ব্বে নমামো ভবসলিলনিধৌ কর্ণধারৌ দয়ালুঃ ॥

৩ । শ্রীদামাত্মাভিরামঃ কলিযুগ উদিতে যং সখায়ং সমাপ্তং
বৃন্দারণ্যাৎ বরেণাৎ কৃতচরণগতিঃ দেবমূর্ত্তীঃ প্রণম্য ।

পশ্চাৎ কুঞ্জাখ্যমাপদ্‌বকুলতরুতলে কুঞ্জলীলাভিরামং
যং কৃষ্ণং কৃষ্ণমুখ্যো নগর ইহ বিভুর্যাপরাৎ তং নমামঃ ॥

৪। নারায়ণসমুদিতৌ চ তর্কালঙ্কারৌ
যত্র প্রভূ করুণয়া গুরুশিষ্যভুবৌ।
ন্যায়স্মৃতিপ্রভৃতিশাস্ত্রমহাব্ধিগর্ভাৎ
রত্নানি সংবিনিচিতানি বিশেষকীর্ত্ত্যৈ ॥

৫। প্রাদুর্বভুবুরতুলা কৃপয়াত্র দেশে
শ্রীবৈষ্ণবাঃ সুযমিনো বহুশাক্তশৈবাঃ।
চন্দ্রদ্যুতিঃ সমুদিতো দ্বিজকৃষ্ণচন্দ্রঃ
নানার্থবিৎ প্রথিতরায়কুলাবতংসঃ।

৬। সাহেবরাম ইতি রাজকুলপ্রতিষ্ঠঃ
সংস্থাপ্য রামনগরং তমহং নমামি।
শ্রীরামমোহন ইতঃ প্রথিতো দ্বিজোঽভূদ্-
ভাষাপটুঃ নিপুণবাক্ পরমাত্মসেবী।

৭। যন্নাম ভারতভুবং ন তু দূরদেশ
যাতং য়ুরোপধরণীং জলধীন্ বিলঙ্ঘ্য।
কায়স্থকুলগৌরবো যাদবেন্দুঃ
মান্দারনাদ্বুদিতবান্ নিজধর্ম্মরক্ষী ॥

৮। যত্র স্বয়ং চ সমিতো গুরুসাধুবর্গৈঃ
দেশস্য মঙ্গলকৃতৌ তমহং স্মরামি।
যত্র প্রসন্ন উদিয়ায় কলাবশেষো
বিদ্যার্থিনাং করুণয়া বিততার বিদ্যাম্ ॥

৯। যত্রাভবন্ গুরুধিয়ঃ সুধিয়ঃ সুধন্যাঃ
গোস্বামিনঃ সুকৃতিনো নদীয়াসমানাঃ।
তত্রাদ্য দেশকৃতয়ে সমিতৌ সমেতাঃ
কীটাণুকীটসদৃশো ভবতাং সমক্ষঃ ॥

১০। হে স্বর্গতাঃ সুপুরুষাঃ কৃপয়া স্বতেজঃ
কিঞ্চিদ্দিবো দিবিষদো ভুবি বর্ষয়ন্তু।

রাজা পাতা পিতা মিত্রং যত্রাস্ত্যেতচ্চতুষ্টয়ং।
ধরণীমোহনং বন্দে সমাজপিতরং প্রভুং ॥

শ্রীরমণীমোহন গোস্বামী।

প্রশস্তি

১। জাতো যত্র পুরঃসরঃ সুমনসাং ভূপেন্দ্রনাথো বসু-
র্যত্রাভূৎ কিল রামমোহনসুধীস্তত্ত্বপ্রচারব্রতী।
খ্যাতং যত্র সুমেধসাং বরকুলং সর্ব্বাধিকারিনৃর্ণাং,
শ্রীরাধানগরং তদস্য জয়তাদ্‌বিদ্বৎসমাজাগমাৎ ॥

২। যত্রাদ্যাপ্যনবদ্যকীর্ত্তিবপুষাং বিদ্যাবিশুদ্ধাত্মনাম্‌,
কীর্ত্তিঃ কুন্দকরীন্দ্রচন্দ্রধবলা সন্দীপয়ন্তী দিশঃ।
লোকেঽস্মিন্‌ জগদুত্তরং ঘটয়তে নানাবিধং গৌরবং,
শ্রীরাধানগরং তদদ্য জয়তাদ্‌বিদ্বৎসমাজাগমাৎ ॥

৩। প্রালেয়াদ্রিতটাদ্‌যথা সুরধুনী লব্ধোদয়া পাবনী,
পাবিত্র্যং বিদধে সমস্তজগতামচ্ছিন্নধারা সতী।
বিদ্যা যৎপ্রভবা তথা বসুমতীমাপ্লাবয়ন্তী স্থিতা,
শ্রীরাধানগরং তদদ্য জয়তাদ্‌বিদ্বৎসমাজাগমাৎ ॥

৪। যৎপ্রান্তীয়বুধাবলী খলু পুরা ধর্ম্মে বিধৌ শর্ম্মণে,
স্বাধীনং মতমাশ্রিতা স্মৃতিগতং দেশান্তরেভ্যঃ পৃথক্‌।
যৎপাণ্ডিত্যযশঃ সুধাংশুকিরণৈঃ শুভ্রং সমগ্রং জগৎ,
শ্রীরাধানগরং তদদ্য জয়তাদ্‌বিদ্বৎসমাজাগমাৎ ॥

৫। নীতৌ যস্য মহোন্নতিঃ সুবিদিতা নীতিস্পৃশাং জন্মনা,
ধর্ম্মে চাপি তথা স্মৃতৌ সুবিদুষাং লোকোত্তরং গৌরবম্‌
তত্ত্বে দার্শনিকে তথৈব মহিমা তর্কৈকবিদ্যাজুষাম্‌,
শ্রীরাধানগরং তদদ্য জয়তাদ্‌বিদ্বৎসমাজাগমাৎ ॥

৬। হে ধীরা ! জগদুত্তরস্থিতিভৃতাং যুষ্মাকমদ্যোৎসবে,
পুণ্যৈরেব সমাগমঃ সুকৃতিনাং গম্যা ভবন্তো যতঃ।
মার্গশ্রান্তিবিনোদনায় ভবতাং কিং বাস্তি নঃ সম্বলং,
দীনানামপরাধকোটিরধুনা কারুণ্যতঃ ক্ষম্যতাম্ ॥

৭। দীনা বঙ্গসরস্বতী প্রতিপদং যুষ্মৎপ্রিয়া ব্যাকুলা,
যুষ্মাকং করুণাকণাম্ মৃগয়তে সৌভাগ্যসম্পত্তয়ে।
তস্যাঃ পুণ্যমনোরথং সফলতাং নেতুং স্বকর্ম্মান্তরে,
তদ্বার্ত্তাং স্মরতাং ভবেন্নু ভবতাং কর্ত্তব্যনিষ্পাদনম্ ॥

৮। ধীরা ধ্যেয়হরপ্রসাদমনঘং বিদ্যৈকলীলাপরা,
মন্যন্তে কিল বান্ধবং সুবিমলজ্ঞানোপলম্ভে চিরম্।
সোঽয়ং মূর্ত্তিমুপেত্য দৃগ্‌বিষয়তাযোগ্যামিহোপস্থিতঃ;
তন্নূনং পরিষৎ ফলং গতবতী জ্ঞানপ্রচারব্রতে ॥

৯। যস্যাসীমমতিপ্রকর্ষবশতো লোকে পরা বিশ্রুতিঃ,
যোঽদ্যাপি ক্ষিতিপালসংস্কৃতমহাবিদ্যালয়ে কীর্ত্যতে।
যৎস্বাম্যাদিহ ভারতে প্রচরিতা গ্রন্থাঃ পরং দুর্ল্লভাঃ,
সোঽয়ং কোঽপি হরপ্রসাদপদভাগ্‌জীয়াৎ সহস্রং সমাঃ

১০। সাহিত্যে নিপুণং বিনা জলধরং জ্ঞানার্জনং দুষ্করং,
লোকে কালবশাৎ প্রচারকৃতয়ে নূনং স চাপেক্ষ্যতে।
তত্তস্যাপি সমাগমেন বিদুষামাশা সমুদ্ভাভবৎ,
বঙ্গীয়া পরিষন্মনোরথফলং প্রাপ্তুশ্চিরং স্যাদিতি ॥

১১। রমাপ্রসাদেন সমং সমাগতঃ,
খগেন্দ্রনাথঃ প্রিয়দর্শনঃ প্রিয়া।
ন তত্র চিত্রং প্রণয়প্রভাবতঃ,
তথাভবল্লোকগতিঃ কিলেদৃশী ॥

১২। বনোয়ারীলালো জয়তি ভুবি বিজ্ঞানবিভয়া,
মনীষা যস্যাস্তে বিবিধবুধচিত্তোৎসবকরী।
বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং জগতি হিতসিদ্ধাবনুগুণং,
গুণোৎকর্ষস্তস্মিন্ ক ইহ খলু ন পূজাং বিতনুতে ॥

১৩। বিদ্যাকীর্ত্তিকলাপদীপিতদিশো হিত্বা বিধানান্তরং,
দীর্ঘং মার্গমতীত্য কষ্টবহুলং প্রাপ্তা যদস্মিন্ পদে।
তদ্বঙ্গীয়সরস্বতীপদরসে রাগস্ত বঃ সূচকম্,
স্যাদেষা সুরসা রসাতলজুষাং ভূয়ঃ সমুজ্জীবিতা॥

১৪। জাতানামিহ ভূতলে জনিমতাং মৃত্যুঃ কদাচিদ্ধ্রুবম্,
যেষাং কীর্ত্তিসুধা দিশাং তটগতা তজ্জন্মসার্থং ভবে।
স্বার্থং দূরপথে বিসৃজ্য সুচিরং লব্ধা পরার্থস্পৃহাং,
কৃত্যানামনুরূপযুক্তিমভিতঃ সম্পাদয়ধ্বং বুধাঃ॥

১৫। যুষ্মানুৎকতয়া সদা স্মরতি সা বাণী প্রিয়ান্ বান্ধবান্,
যূয়ঞ্চাপি তয়া বিবৃদ্ধযশসঃ স্মৃত্বা কুরুধ্বং স্তুতাম্।
ভূয়াদেব পরস্পরস্মৃতিবশাৎ সম্যকৃতমা দ্যোতনা,
যা দেশান্তরতো বিলক্ষণপদং সম্প্রাপয়েদ্ভারতম্॥

১৬। জয়তি বিবুধগোষ্ঠী সাধুবাদোপচারা,
জয়তি হৃদয়শুদ্ধির্নিত্যমচ্ছিন্নধারা।
জয়তি কিল মুনীনাং ধর্ম্ম্যকর্ম্মোপদেশঃ,
জয়তি চ পরমেশস্যার্চ্চয়া পূতদেশঃ॥

শ্রীকালিপদ তর্কাচার্য্য।

সাদর-সম্ভাষণ।

আমার অশেষ ভক্তিভাজন ও পূজ্যপাদ প্রপিতামহ বিশ্ববিশ্রুত ৺ রাজা রাম-মোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগর পল্লীতে মহাশয়গণ অদ্য সমবেত হইয়া যে বঙ্গসাহিত্য-গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, আমি অসুস্থতাহেতু অদ্য তথায় আপনাদিগের সহিত সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যে যোগদান করিতে না পারায় বড়ই ক্ষুণ্ণ ও দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু জানিবেন, আমার অন্তঃকরণ আপনাদিগের ও অভ্যাগত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্যে যোগদান করিতেছে। যাহা হউক, মহাশয়গণ আমার সাদর-সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। সহর হইতে সুদূর অথচ ক্ষিপ্র যানাদির অগম্য পল্লীতে আপনাদিগের যত্নের ও স্বচ্ছন্দতার বিশেষ ত্রুটি হইবে, তজ্জন্য নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। ভগবানের নিকট আমার একান্ত আন্তরিক প্রার্থনা যে, সভার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হউক। ইতি

আপনাদিগের
শ্রীধরণীমোহন রায়।

উদ্বোধন-সঙ্গীত

আজি পুণ্য লগন পূর্ণ ভবন শুনিয়ে মোহন বাঁশরী
সংসদে শত শাশ্বত-সুর মিশিছে মুরছি আমরি!
আলস-অলস আবেশ-অবশ হরষ-সরস-পরশে
মধুর মলয় মুগ্ধ প্রকৃতি মঙ্গল-গীতি বরষে;—
ঊর্দ্ধে অযুত অভয় বাণী, নাশিল নিখিল দৈন্য গ্লানি,
স্বস্তি, শান্তি, সিদ্ধি, ঋদ্ধি ধ্বনিছে দশ দিশি ভরি।
নন্দন হ'তে ঘেরিছে মরতে কাহার কোমল দিঠিটি
বিলায়ে সুধা, মিটায়ে ক্ষুধা, ফুটায়ে আশার ভাতিটি;—
উচ্ছ্বসি আজি উঠিছে যন্ত্র, কহিছে জাগিবে মন্ত্র তন্ত্র
কাব্য, কাহিনী, বিজ্ঞান, জ্ঞান, উদিবে আঁধার পাসরি।

এই সে নগর

এই সেই রাধানগর শোভন !
এই সেই পূত ভূমি !
যার নাম শুনি বাঙালীর মন
হরষ-সাগরে হয় নিমগন,
শত ঝঙ্কারে হৃদয়ের তারে
তান উঠে প্রাণ চুমি,
কত শুভ সুখ-স্মৃতি-বিজড়িত
এই সেই পূত ভূমি !

গৌরবময় ভাবুকতা-ভরা
এই সে নগর খান !
যাহার নিভৃত কুঞ্জ-কাননে
একটী কুসুম কনক-বরণে
ফুটেছিল আহা অতি শুভখনে
বিথারি সুরভি-ঘ্রাণ !
যে ঘ্রাণে মজিল সুধী-জন-হিয়া
এই সে নগর খান !

এখনো সে ঘ্রাণ শান্তি-নিদান
সতত পবন ভরে
উছসি' উঠিয়া দিগে দিগে ধায়,
মুগধ মধুপ লুটি পড়ি তায়
তুলিছে সুতান মাতাইয়া প্রাণ,
মধুর মোহন স্বরে।
এস এস চুমি ধন্য এ ভূমি
বঙ্গ-বসুধা 'পরে।

যে মহারতন খনিতে ইহার
দয়াল বিভুর বরে,
অমল ধবল উজ্জল জ্যোতিতে
উঠেছিল ঘোর তিমির নাশিতে,
কে তার সম এ বঙ্গ ভূমিতে
পুণ্য-প্রতিভা ধরে !
এস এস চুমি এ যে পূত ভূমি
বঙ্গ বসুধা 'পরে !

ওগো ও যাত্রি কোন্ দিকে যাও
দিয়া হাত দু'টী নাড়া,
তৃষিত নেত্রে কোন্ দিকে চাও,
হেথা হোথা ফিরি কি খুঁজে বেড়াও,
এই অঙ্গনে সঙ্কোচ-সনে
দাঁড়া রে সকলে দাঁড়া,
পবিত্র এ ঠাঁই পদতলে ভাই
যায়নাক যেন মাড়া।

জান না কি তুমি এ যে পূত ভূমি,
সাধনার এ যে ক্ষেত্র !
রামমোহনের চরণ-কমল
পরশিয়াছিল এই ভূমিতল,
এর ধূলি-কণা, ধূলি নহে সোনা,
হের থাকে যদি নেত্র !
সাবধানে কর চরণ-ক্ষেপণ
এ যে সাধনার ক্ষেত্র !

পবিত্র কোরাণ হাদিস্ পড়িয়া
জ্ঞানের নয়ন-দ্বার,
খুলেছিল সেই ভক্ত জনের
কৃপা-গুণে বিধাতার,
নুয়ে গিয়াছিল হিয়া খানি ভ'রে,
নিহারিয়াছিল সারা চরাচরে—
—গিরি নদী বনে গগনে পবনে
সত্তা সে আল্লার !

তাই বুঝেছিল মরমে মরমে
খোদা এক নিরাকার !
মৃৎশিলা ধাতু দারুর গঠিত
প্রতিমা পূজিলে অহো কদাচিত
হয় কি ধরম ? ভ্রম মহাভ্রম !
সংশয় নাহি তার !
সুধার বদলে তীব্র গরল
ফল সেই সাধনার ।

তাই সুধীবর করিলা প্রচার
একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।
চমক লাগিল পরাণে সবার
শুনিয়া কথার ক্রম ।
গুরু কশাঘাত ক্রোধী সমাজের
অমনি পড়িল শিরসে বীরের,
পিতাও দয়াল, হায় রে কপাল,
হইলেন নিরমম !

কিন্তু যে হিয়া সাধিতে স্ব-ব্রত
হইয়াছে আগুসার,
করিতে কি পারে ক্ষুণ্ণ তাহারে
শত বাধা দুনিয়ার ?

নদীর প্রবল প্রবাহ ভীষণ
বলে কি ফিরাতে পারে কোন জন ?
ছুটেছে যে তীর তারে করে থির,
এ হেন সাধ্য কার ?
জনম-ভূমির স্বগণ সবার
স্নেহ-প্রীতি পরিহরি,
বাহিরিলা সুধী একতান মনে
বিশ্ব-বিভুরে স্মরি !

দীন নিরাশ্রয় হীনসম্বল,
শুধু মহাবল ছিল হিয়া-বল !
ছিল ঈশ-প্রীতি অটল ভকতি,
কামনা শুভঙ্করী ।
গভীর সাধনা কত গবেষণা
করিয়া করম-বীর,
রোপিলেন শেষে তরুবর এক
শুভ তরে বাঙালীর ।

আজি বসি তার শীতল ছায়ায়,
কত শোকী তাপী জীবন জুড়ায়,
সুধাময় ফল খেয়ে অবিরল
বরষে হরষ-নীর !
নরের হিতাশী পুণ্য-প্রয়াসী
বঙ্গে কে সম তাঁর ?
মহত্ত্ব-মহিমা প্রতিভা তেমন
শোভিত হৃদয় কার ?

পতির মরণে ভীষণ চিতায়
জীয়ন্ত সঁপিতে অবলা বালায়,
হেরিয়া তিনিই মরম-ব্যথায়
ফেলেছেন আঁখি-ধার ।

তিনিই শ্রীহীনা মলিনা সুদীনা
বঙ্গ-বাণীর অঙ্গে,
মনের মতন রঙ্গিল বসন
পরা'ল যতন সঙ্গে।
বসি নিরজনে কত সাধে আর
তিনিই নিপুণ করে আপনার,
মণি-মতি কত হীরা মরকত
সাজাইয়া দিল রঙ্গে।
তাই গো যাঁহারা বঙ্গের সুধী
সুকৃতী মনীষি-রাশি,
সুধাময় তাঁর নাম স্মরি চিতে
ভকতি-প্রীতির অর্ঘ্য দানিতে
আবেগের ভরে আজি এ নগরে
সমাগত সবে আসি
হৃদয়ে সবার ঝরে আনন্দ,
বদনে ক্ষরিছে হাসি।
আহা কিবা শোভা উথলিয়া ধায়
আজি এ নগর মাঝে,
যেন শত শত কমল-কহলার
ফুটেছে সুখের সরসী মাঝার,
অথবা গগনে সুচারু শোভনে
লাখে লাখে তারা রাজে।

নন্দন আজি মলিন শ্রীহীন
ক্রন্দন করে লাজে!
তাই বলি আজি বিশাল বঙ্গে
ধন্য নগর ভূমি,
ধন্য তোমার সেই সুধী সুত.
ধন্য তোমার ভূমি!
যে দিকে তোমার ফিরাই নয়ন,
সেই দিক্ কিবা সুখ-দরশন,
কি যেন অমিয়া পড়ে গো ঝরিয়া
তোমার ভূতল চুমি!
তোমার কমল বক্ষ-শোভিত,
আহা তরু-লতা সারা,
ফুটায় কুসুম মধুর-গন্ধ,
ছুটায় পবন ললিত ছন্দ;
আকাশে তোমার ভাসে আনন্দ;
তোমার চন্দ্র তারা—
বরষে শীতল সুখ-পরশন
কম কিরণের ধারা!
ওগো তব নাম রবে চির হৃদে,
হবেনাক স্মৃতি-হারা!

মোজাম্মেল হক্।
শান্তিপুর, ৫ই বৈশাখ, ১৩৩১।

মহাত্মা রামমোহন

যাত্রী আজিকে আসিয়াছি মোরা
দুর্গম অতি সরণী বাহি,
তীর্থ সলিলে মঙ্গল ঘট
নূতন করিয়া ভরিতে চাহি।

স্মৃতির সুরভি ফুল্ল কুসুমে
রচিব মায়ের অর্ঘ্য নব,
গড়িয়া তুলিব নূতন জীবন
আশীষ সবার মাগিয়া লব।

রাজার পুণ্য অঙ্গন তলে
কি ধন হেথায় রাখিয়া গেছে,
খুঁজিয়া দেখিব আছে কি না কিছু
বিশ্বেরে যাহা বিলায়ে দেছে।

*　　*　　*

ভুলে যাওয়া কত দিনের কাহিনী
ভিড় ক'রে আজি আসিছে বুকে,
করুণ স্মৃতিটি নূতন করিয়া
গুমরি উঠিছে গভীর দুখে।

কতদিন আজি ফাঁকি দিয়ে গেছ
কোথায় সুদূর জলধি পারে,
অসীমের তীরে বুঝিবা সেথায়
খুঁজিয়া পেয়েছ অসীম তাঁরে।

শতেক বরষ হইতে চলিল
দেশবাসী তবু কাঁদিয়া মরে,
বাঙ্গলার মাটি গড়েছিল তোমা
পরাণ দিয়াছ তাহারি তরে।

এই ছায়াঘন পল্লী কুটীরে
নীরবে হেথায় গৃহের কোণে,
ফুটেছিলে যেন একটি কুসুম
আঁখির আড়ালে বিজন বনে।

তারপর তব মধু সৌরভ
ছড়ায়ে পড়িল সকল দেশে,
গরবে বঙ্গবাসীর হৃদয়
পুলকে অমনি উঠিল হেসে।

বিকাশি উঠিলে শত মহিমায়
উজলি মায়ের শূন্য গেহ,
ধন্য হইল দেশবাসী সবে
লভিয়া তোমার অগাধ স্নেহ।

কর্ম্মে ও জ্ঞানে, ধর্ম্ম-প্রচারে;
স্বদেশ প্রেমেতে মাতালে ধরা;
রাখিলে জগতে নূতন কীর্ত্তি
ভুলিবার সে যে নহেক ত্বরা।

অদ্ভুত তব জ্ঞানের কাহিনী
এমন বিজয়ী প্রতিভা কা'র?
রামায়ণ পাঠ একদিনে কেবা
সমাপন কোথা করেছে আর।

একদিনে কেবা তন্ত্র পড়িয়া
বিচার এমন করিতে পারে,
দশটী ভাষার বিদ্যাতে তোমা
কোন দিন কেহ জিনিতে নারে।

ষোড়শ বছরে সিংহের মত
দৃপ্ত আপন হৃদয় বলে,

আপনার মত করেছ প্রচার
শত বাধা গেছ চরণে দলে।

তুষার ধবল হিমালয় বাহি
তিব্বতে গেছ জ্ঞানের লাগি,
গ্রন্থ লিখেছ ক্ষুদ্র বালক
কত না দীর্ঘ রজনী জাগি।

কর্ম্ম জীবনে ছিলে গো তেমনি
অজেয় মহান্ সাহসী বীর,
কেরাণীরও কাজে কর নাই ঘৃণা
সদাই অচল অটল ধীর।

সহিয়াছ কত লাঞ্ছনা চির
শান্তি কখনো পাওনি ঘরে,
বিষাদের ছায়া পড়েনি তবুও
শান্ত তোমার ললাট পরে।

বেজেছিল প্রাণে সহমরণের
কৃত্রিম যত নিঠুর প্রথা,
আইন করিয়া নিবারণ করি
বিধাতার মত হরিলে ব্যথা।

হিন্দু নারীর অধিকার লাগি
করেছ কত না ভীষণ রণ,
প্রাণপাত তুমি করেছ রোধিতে
সর্ব্বগ্রাসী এ কন্যা পণ।

গদ্য ভাষার জনক তুমি গো
নূতন করিয়া গড়েছ তারে,
সরস করেছ ভাব সম্পদে
ভাষার নবীন অমৃত ধারে।

দেশের লাগিয়া রাজার দুয়ারে
অধিকার কত নিয়াছ কিনি,
স্বাধীন করেছ মুদ্রা যন্ত্রে
লাওয়াজ তুমি লয়েছ চিনি।

রাজ দরবারে লভেছ কত না
মহান্ উচ্চ যশের ঠাঁই,
সম্মান সদা রেখেছ বজায়
তাই সে তোমার মহিমা গাই।

সবার উপরে ধর্ম্মের লাগি
অকাতরে দেছ সঁপিয়া প্রাণ,
একের মহিমা পেয়েছ জগতে
তুলেছ তাঁহার মোহন তান।

কথোপকথনে সঙ্গীতে নব
হৃদয়ের সব দুয়ার খুলি,
দুয়ারে দুয়ারে গাহিয়াছ ফিরি
আপনার যাহা সকলি ভুলি।

সর্ব্বজাতিরে উদার বক্ষে
সমভাবে দেছ যতনে ঠাঁই।
দেখায়েছ সবে এক ভগবান্
বিরাট বিশ্বে দ্বিতীয় নাই।

তাঁহারি ধেয়ানে সাগর বেলায়
খুঁজিয়া তাঁহারে ফিরেছ শেষে,
কল্লোলে শুনি তাঁহারি আহ্বান
বুঝিবা মিশিয়া গিয়াছ হেসে।

* * *

এই সেই তাঁর বাঙ্গলার গেহ
সাধ্যের পুণ্য জন্মভূমি,
ধন্য যাহার প্রতি ধূলিকণা
অভয় তাঁহার চরণ চুমি।

এক হয়ে যাও বাণীর চরণে
আজিকার এই মিলন সুখে,
জাগিয়া উঠুক মহামানবের
মিলন-ভূমি এ দেশের বুকে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মেদিনীপুর।

ওগো জাগ রাধানগরী

সাড়া দে গো, সাড়া দে গো, গা নাড়া দে ওঠ্ ।
রামমোহনের, মা বলে তোর, হচ্ছে নামের খোঁট ॥
পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বোলে, সহর ঘ্যাঁসা লোক ।
তোমায় পানে, এদ্দিন ধ'রে, চাইনি মেলে চোখ্ ॥
তোমার ধানের মরাই, দুধোলো গাই, পুকুর ভরা মাছ ।
তাল তেঁতুল, কুল পেয়ারা, আম কাঁটালের গাছ ॥
আর দূর্ব্বাগুচ্ছ, তুচ্ছ কোরে, পল্লীবাসীজন ।
পাথরপাতা ক'লকেতাতে পেতেছে আসন ॥
সেথা, গ্যাসের আলো বিজলী বাতি কলের পাখার হাওয়া ।
বালাম খেতে, গোলামগিরি আর ভাগাড় ভরা গাওয়া ॥
মজিয়ে মন, ঝাঁঝিয়ে ওজন, চড়ায় মোটর ট্রাম ।
নব্য মনে, সভ্য ভব্য, লাগেনা আর গ্রাম ॥
তাই, সুখের সাগর, রাধানগর, রামমোহনের আঁতুড় ।
গয়না গাঁটী খুলে আজ, গা করেছে আদুড় ॥
এখন, চালার তলায়, জ্বরের জ্বালায়, ছটফটায় যে চাষী ।
খাওয়ায় খাবি; ওলাবিবি,—যমরাজার সে মাসী ॥
গোষ্ঠহারা গরু, এখন কষ্টে টানে হা'ল ।
চেষ্টা কোরে মেলে না গাঁয় তেষ্টা-ভাঙ্গা জল ॥
খুদ খেতে পায় না বুঝি, দুধ দেবে সে কিসে ?
খাব্‌লে খায়, কাবলে-ওলা—সুদে পিষে পিষে ॥
তবু, তোমার ধুলোর কোলে শুয়ে, আর দড়ির দোলায় দুলে ।
কত কবি সাজিয়ে গেছেন বঙ্গ অঙ্গ ফুলে ॥
তুমি, রাম বোলে, রায়েদের ছেলে, পেয়েছিলে কোলে ।
ওগো, আজও তাই গরব তোমার রাধানগর বোলে ॥
আপনি এসে কণ্ঠে রাজার, বস্‌লেন বীণাপাণি ।
এই, ধর্ম্মভ্রষ্ট বঙ্গে দিতে, শ্রেষ্ঠ আশার বাণী ॥
বেদহীন, দীন দ্বিজ, গেছ্‌লো হোয়ে বঙ্গে ।
হ'ল, তন্ত্র শুধু, মন্ত্রগত, পঞ্চ ম'কার-রঙ্গে ॥
আবার, ভাড়া করা, পাদরী পাড়া কল্লে দাড়ী নাড়া সুরু ।

হ'লেন, ইংলিসে সাঁতলান ছেলের তাঁরাই ধর্ম্ম গুরু ॥
কেষ্ট নষ্ট, কালী মাতাল, চোল্লো গালাগালির পালা।
হিঁদুর সিঁতের সিঁদুর, কুসংস্কার মায়ের নোয়ার বালা ॥
তাই চাঁদের মতন, ছেলে কত ছেড়ে মায়ের কোল।
খ্রীষ্ট ভজে, মজলো খেতে মিষ্ট ফাউল ঝোল ॥
মেরী শিশু মুখে নাম, সুখে শেরী পান।
শ্রদ্ধার আদ্যশ্রাদ্ধ, খাদ্যে শুচি বলিদান ॥
আর্কফলা তর্কজাল পুরোহিতের পুঁজি।
ছুঁতমার্গে যাবে স্বর্গে, তাই নে যোঝাযুঝি ॥
এই অসময়, রামমোহন রায়, না এলে হায় বঙ্গে।
সারা দেশটা শেষে, যেত ভেসে, খ্রীষ্টানি তরঙ্গে ॥
বুঝে আর্য্যধর্ম্ম, বেদ মর্ম্ম. কোরে ব্রহ্ম বোধ সার।
একমেব অদ্বিতীয়ম্, শুদ্ধমন্ত্র করেন সুপ্রচার ॥
এই নতুন শিক্ষা, নতুন দীক্ষা, নয় পরের ভিক্ষা করা ধন।
শুধু ঘরের আলো, জ্বললো ভাল, রামমোহনের একা আয়োজন ॥
এই যে অদ্য-বাংলা-গদ্য-পদ্য-পদ্ম মধুকর।
কল্লেন, সভার শোভায় মনোলোভা এ রাধানগর ॥
সেই রামমোহনই, মোহন বেণু ধরে আপন অধরে।
গাইলে তত্ত্বগীতি, ধর্ম্মনীতি, মাতিয়ে ক্ষিতি সুস্বরে ॥
না পোহাতে রাতি, দিব্য মালা গাঁথি, জ্বালি পূতবাতি, রাজা মহামতি।
পদ্মসরধারে, গদ্য উপচারে, সরস্বতী মারে করেন আরতি ॥
তাই বাণীপুত্র সব, করিতে উৎসব, জয় জয় রব, এসেছে তোমার ধামে।
করেছিলে পুণ্য, ছেলে ছিল ধন্য, তাই কত গণ্যমান্য এসেছে
অরণ্যে পূজিতে সে রামে ॥
আজ, দুঃখ ভুলে যা, রামমোহনের মা, পূজতে তোমার পা, দাঁড়িয়ে দেশের ছেলে।
মেরে গুড়িগুড়ি উঠে এসে বুড়ি,দেখ, কুঁড়েয় কুঁড়েয় ঢুঁড়ে কে খেলে কি না খেলে ॥
তোর শেষ বয়সের আশা,দেশের ভালবাসা,ভূপেন বোসের আসা,হয়নি দেহের দায়।
তাই ভাইপো দেছে পাঠিয়ে কুঁয়োফুয়ো কাটিয়ে সবার সাধ মিটিয়ে পূজতে ঠাকুরমায়।

শ্রীঅমৃতলাল বসু

রাধানগর

(১)

মহাতীর্থ সম আজি এই পুণ্য-দেশ,
লয়ে বহু-কীর্ত্তি-স্মৃতি বঙ্গের মাঝারে ;
সৌন্দর্য্য-হিল্লোলে শত সুখের আবেগ,
যেতেছে ভাসিয়ে আজি হৃদয় আগারে।

(২)

এ দেশে জনম লভি জগতে অমর,
(সাধনা প্রতিভা বিদ্যা মহাশক্তি বলে)
কত সাধু মহাজন জ্ঞানের আকর,
ধর্ম্মের মহিমা-জ্যোতিঃ প্রচারি ভূতলে।

(৩)

আগমবাগীশ সেই কৃষ্ণানন্দ নামে,
তন্ত্রের মাহাত্ম্য বঙ্গে করিলা প্রকাশ ;
আছিল নিবাস তাঁর এই যে শ্রীধামে,
স্মরিয়ে জাগে এ প্রাণে অতুল উল্লাস।

(৪)

হেথা জনমিলা রাজা রামমোহন রায়,
বহু-ভাষাবিদ্ জ্ঞান-বিদ্যার সাগর ;
সৃজিলেন নব-ধর্ম্ম মহা প্রতিভায়,
লয়ে উপনিষদের মর্ম্ম গূঢ়তর !

(৫)

নিবারিলা সতীদাহ কুপ্রথা ভীষণ,
প্রতিষ্ঠিলা বিদ্যালয় বিদ্যাদান তরে,
রাজার কীর্ত্তির গাথা গীত অনুক্ষণ !
নিত্য নব-নব তানে বঙ্গের ভিতরে !

(৬)

এই দেশে অভিরাম স্বামীর শ্রীপাট,
বৈষ্ণবের শান্তিময় ধর্ম্মের মন্দির ;
চিরপ্রেমে বিলুণ্ঠিত ভক্তের ললাট,
চুমিবে শ্রীপীঠ রেণু অধর অধীর !

(৭)

এ দেশের যদুনাথ সর্ব্ব-অধিকারী,
ভারতের বহুতীর্থে করিলা ভ্রমণ ,
বিরচিলা ভ্রমণের গ্রন্থ মনোহারী,
প্রচুর আনন্দ পাঠে জুড়ায় জীবন।

(৮)

দূর অতীতের কথা পড়ে সদা মনে,
নানা-স্মৃতি বিজড়িত শ্রীরাধানগর ;
ইহার ধ্বংসের স্তূপে জলে স্থলে বনে,
চিত্রিত কি সেকালের চিত্র মনোহর ;

(৯)

আজি বঙ্গ-সাহিত্যের মহা সম্মিলন,
বিপুল গৌরবে আজি হতেছে হেথায় ,
প্রকৃত সাহিত্য-সেবী মহা সুধীগণ,
সম্মিলিত আজি সবে অপূর্ব্ব প্রভায়।

(১০)

মহাপুণ্যপীঠে আজি মহা-আরাধনা,
করিছেন একনিষ্ঠ বাণীপুত্রগণ ;
দেশ-মাতৃকার এই প্রকৃত সাধনা
এ ব্রত-সাধনে চির সফল জীবন।

(১১)

হোক নিত্য মধুময় এই অনুষ্ঠান,
থাকুক জাগ্রত এই স্মৃতি মনোহর ;
বর্ষে বর্ষে সারদার মহা-অধিষ্ঠান,
করুক মন্দির তাঁর উজ্জ্বল, সুন্দর

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ক

রামমোহন সপ্তক

১। নমো নমো হে ব্রাহ্মণ, হে রামমোহন,
ধন্যতপা মহানামা ; তোমার সাধন—
আনন্দ-দেউল-মাঝে আজি মোরা সবে,
এই রাধানগরের নব মহোৎসবে,
এনেছি পূজার চাঁপা-চন্দনের-ঝারি,
ভরেছি মঙ্গল-ঘটে গঙ্গোত্রীর বারি।

২। উপনিষদের প্রান্তে সাবিত্রী ছটায়
ভর্গ যাঁর,—প্রণমিয়া সেই দেবতায়,
হে কিশোর পার হয়ে গেলে হিমালয়;
তিব্বতের স্বর্ণ-মঠে, হে অকুতোভয়,
পড়িলে 'জাতক'-কথা ভূর্জ্জপাতে লেখা,—
দিগ্বিজয়-লগ্নে বীর বাহিরিলে একা।

৩। পান্থবেশে আরব্য-সাগর পরপারে,
ভ্রমি মুসাফির সনে মরুর পাহাড়ে,
মক্কা-মদিনার বেদী প্রদক্ষিণ করে'
অর্ঘ্য দিলে একেশ্বরে একান্ত-অন্তরে।
জয়ন্তী তোমার বাণী, বাহিনীর মত,
পদে পদে তার্কিকের শির করে নত।

৪। হে গায়ত্রী মন্ত্রবিৎ, উপবীতধারী,
দিয়াছ ছান্দসী দীক্ষা হে সিদ্ধ পূজারি,
করে গেছ স্বস্ত্যয়ন বিঘ্ন করি' দূর—
তোমার যজ্ঞের চরু পীযূষ-মধুর।
উদয়াস্ত চক্রবালে ঢালি শান্তিজল
ধুয়ে দিয়ে গেছ শেষ সতী-চিতানল।

৫। হে যুগের অধিনেতা, সত্য-ব্রত-ঋষি,
বিদারিলে ভারতের মহাকাল-নিশি
আরতি-অরুণ-শিখা জ্বালি' পঞ্চদীপে,
ললাট-উজল-করা হোম-ভস্ম-টীপে
দিলে বিশ্বজিৎ টীকা জাতির জীবনে.
বাজালে বোধন-শঙ্খ মাহেন্দ্র-লগনে।

৬। তব অভ্যুদয়-পল্লী—এই চতুষ্পথে—
মুক্তিকামী বহু যাত্রী বহু তীর্থ হ'তে
আগত সে যুগে যুগে জগন্নাথ ধ্যানে,
সর্ব্ব-জ্ঞান-সিদ্ধি-করা-একের-বিজ্ঞানে,
গেছে শ্রীক্ষেত্রের পানে,—মহার্ণব-ওম্

৭। শুনেছে বিরাট ছন্দে ব্যাপ্ত মহী ব্যোম্।
দূর 'শ্বেত-দ্বীপ-কূলে তোমার সমাধি,—
পেয়েছ গো বরমাল্য অমর প্রসাদী,—
মিশে গেছ চিরন্তন অভয়—অশোকে,
পশিয়াছ মধু-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান-লোকে।
তোমার তুষার-রুচি যশের মূরতি
আরাধিছে সারা দেশ, তুমি ছত্রপতি।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিবেদন

সভাপতি মহাশয় ও সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ !

আপনাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে জমীদার শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় মহাশয় আপনাদের সহিত এই শুভ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীতে শারীরিক অসুস্থা-বশতঃ উপস্থিত হইতে এবং স্বয়ং আপনাদের আদর আহ্বায়ন করিতে পারেন নাই। এজন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছেন ও আমাকে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ এখানে উপস্থিত থাকিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু আমি আপনাদের ন্যায় মহান্ ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনা, সেবা ও আদর আপ্যায়ন যথোপযুক্তরূপে করিতে পারিতেছি না ও পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বিনয় ও ক্ষমা মহাশয়গণকে সর্ব্বতোভাবে ভূষিত করিয়া রাখায় আমি আপনাদের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম হইলেও আমার সকল ত্রুটি ও অপরাধ মার্জ্জনা হইবার আশা খুবই করিয়া থাকি। স্থানীয় পারঘাটের অসুবিধা জনিত পথশ্রান্তি ও এই সুদূরপল্লী সহর হইতে দূরে অথচ রেল রাস্তা না থাকায় আহার ও পানীয়াদির ক্লেশ আপনাদিগকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। আপনারা দেশের শিক্ষাদি বিষয়ক যে সাধু ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে এই সকল দুঃখ ক্লেশ সহ্য করাও আপনাদের এই ব্রতের অঙ্গ বিধায় আমরা আপনাদিগকে এখানে আনয়ন করিতে সাহসী হইয়াছি। মহাত্মা রাজা রামমোহনের স্মৃতি-মন্দির রাধানগরে আপনারা শুভাগমন করিয়া মহাত্মার সম্মান ও আপনাদের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, এজন্য আমাদের যে মহা আনন্দ সেই আনন্দামৃত আপনাদের এই সকল ক্লেশের শান্তিদায়ক হউক—আর আপনাদের নিকট আমার যে সকল বিষয়ের ত্রুটি তাহা উপেক্ষিত হইয়া, আপনাদের গুণাধিক্যের পরিচয় প্রকাশিত হউক, ইহাই আপনাদের নিকট এই দীনজনের প্রার্থনা। এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে আপনারা সহস্র ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে আগমন করিয়াছেন তজ্জন্য শুধু আজ নয়, চিরদিনই আপনারা আমাদের ধন্যবাদার্হ হইলেন। শ্রীভগবান্ এই সম্মিলনীর কল্যাণ বিধান করুন ইহাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

আপনাদের অনুগত
শ্রীসরসীমোহন রায়
গোপীনাথপুর

[illegible]

সার্দ্ধ শত বরষ পূর্ব্বের হে প্রধান পুরুষপ্রবর
ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে যে ভূমির পর
সেই তব জন্ম-তীর্থে আজি দাঁড়াইয়া
জাতির গৌরব-গর্ব্বে ভরিয়া উঠিছে মোর হিয়া।
হে মহামানব কবি
তোমার জীবনছবি
অতুলন চরিত্র মহিমা
ব্যাপ্ত করি শতাব্দীর সংখ্যাতিগী মহা কালসীমা
আজিও রয়েছে সমুজ্জ্বল
অভ্রভেদী অচল অটল !
রাজোচিত রজগুণে রাজা তুমি নহ রাজ্যেশ্বর
শুধু দণ্ডধর
হ'য়ে দু'দিনের
যাহারা দীনের
উপসত্ত্ব করিয়া হরণ
আমরণ
বিলাসে জীবন ক'রে ক্ষয়
সে তো নয়
তোমার চরিত্র ইতিহাস !
তোমাতে যে শক্তির বিকাশ
সে যে চির অনন্তের লীলা
শুদ্ধ তব্ধ মুক্ত অনাবিলা
বিচিত্র ভাস্বর
মহাজ্যোতিধর
তোমার ললাটে রাজটীকা
জানি রাজা হয় নাই লিখা
ত্যক্ত পূর্ব্বপুরুষের উচ্ছিষ্ট উত্তর অধিকার।
ধরণীর তোরণ দুয়ারে
একদা যেদিন

সবার বর্জ্জিত মিত্র হীন
ল'য়ে শুধু আপন প্রতিভা-শীর্ষ রথ
উতরি দুর্গম দীর্ঘপথ
দুর্জ্জয় সাহসে একা দাঁড়াইলে আসি।
নিয়তি প্রসন্ন মনে হাসি
আপনি আঁকিয়াদিল ভালে
বিজয় তিলক চিহ্ন; দেয় সে যেমনি কালেকালে
জগতের শ্রেষ্ঠ যুগবীরে!
অভয়ার অভিষেক নীরে
দীক্ষা তব হ'ল সমাপন
জ্ঞানরত্নে বিরচিত তব
অভিনব
রাজসিংহাসন
প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল ধীরে
এ প্রাচীর প্রাচীন মন্দিরে!
হে নায়ক! সুধীজন প্রভু
বিস্তৃত হয়নি কভু
তব রাজ্যপাট;
সুসমৃদ্ধ স্বয়ম্ভু বিরাট
ধুলিধূসরিত ধরামাঝে,
ভূমালোকে রাজে
তোমার মহিমা জ্যোতিশিখা
আনন্দের আনিন্দ্য দিপীকা!
তব রাজ-চন্দ্রাতপ তলে
আজও তাই মহাতেজে জ্বলে
যে আলোক, জ্যোতিষ্ক প্রধান!
দ্যুতি তার চিরদিন রবে হেন দিব্য দীপ্যমান।
নূতন ঊষার অভ্যুদয়ে
ধ্বংসের প্রলয়ে
হবেনা সে প্রতিভার অক্ষয় প্রদীপ এতটুকু ম্লান,

সর্ব্বগ্রাসী কালের ফুৎকারে কোনও কালে হবেনা নির্ব্বাণ
হে রাজা অমর
যে কীর্ত্তি রাখিয়া গেছ অবনীর পর
সত্য-সন্ধী শাণিত ফলকে
আজি সে ঝলকে
দিকে দিকে বজ্রাগ্নি শিখায়
যুগান্তরে প্রলয় লিখায়
লুপ্ত করি দিয়াছে সে ক্রমে
অসত্য যা উঠেছিল জমে
পুঁথিপত্র পুরাণের সনে
সঙ্গোপনে
ধর্ম্মের পরিয়া ছদ্মবেশ,
আজি তার হয়ে গেছে শেষ !
তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমাচল পারে
তিব্বতের অবরুদ্ধদ্বারে
দাঁড়াইয়াছিলে একদিন
হে নির্ভীক অতিথি নবীন
ল'য়ে তব কিশোর করুণ মূর্ত্তিখানি ;
জানি ও জানি
সঙ্কট সেদিন এসেছিল ঘনাইয়া পাশে ,
তবু তুমি মরণের ত্রাসে
ভোল নাই আপনার কাজ
ওগো মহারাজ,
তব রাজছত্রতলে
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কল্লোলে
মিলেছিল আসি,
ধরণীর কাল স্রোতে ভাসি
সভ্যতার বিচিত্র ত্রিধারা !
সবার অজ্ঞাতে তারা
ধীরে

তোমার হৃদয় সিন্ধু তীরে
রচিয়া তুলিয়াছিল যে প্রয়াগ
মহাভাগ
সে যে আজ নিখিল মিলন অনুরাগে
তীর্থরূপে জাগে
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়
সে পথে সহজে সিদ্ধ হয়
সেই লক্ষ্য নির্দ্দেশের আজীবন ছিল তব সাধ
নিরাকার একেশ্বরবাদ
বিশ্বগ্রাহ্য যাহা চিরদিন
দ্বন্দ্বদ্বিধাহীন

সেই ধর্ম্ম করেছো প্রচার—
যুগ অবতার,
তব ব্রহ্মজ্ঞান
নহে শুধু যজ্ঞসূত্রধারী মিথ্যাচারী দ্বিজত্ব প্রধান,
বহু নিন্দা বহু ক্ষতি সহি অপমান
সত্যদ্রষ্টা হে সাধক মনীষী মহান্
সবার বিরুদ্ধে খাড়া হ'য়ে
উচ্চকণ্ঠে বলেছ নির্ভয়ে
বেদ-বিধি-তন্ত্র-মন্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রে আছে গো সবার
সর্ব্বকালে সম অধিকার!
ওগো মহারথ
দেখায়েছ' অনন্তের পথ
মুক্ত সদা সবাকার তরে
হৃদয়ের ধর্ম্মাধিকরণে বিবেকের নিকষ প্রস্তরে
জাতিভেদ মিথ্যা-প্রবঞ্চনা লজ্জায় লুটায় ধুলিপরে।
তব ভাবমন্দাকিনী-ধারা
ভাগীরথি পারা
ভারতের অভিশপ্ত অশিক্ষিতগণে
উদ্ধার করেছে জনে জনে!

পঞ্চদশ অধিবেশন

নিখিল উপাস্যনিধি যে অখণ্ড ব্রহ্ম সনাতন
তিনি শুধু নন
ক্ষুদ্র এক দলের অধীন,
সর্ব্বশাস্ত্র হে বিজ্ঞ প্রবীণ
প্রচার করেছো তব সুগভীর জ্ঞান
কেবল আচারে মাত্র নহে বদ্ধ মুক্তির সোপান
ধর্ম্ম নহে মাত্র ওই ধর্ম্মগত যত সংস্কার,
বর্ণাশ্রম জাতির বিচার
নহে বিধাতার
শাস্ত্র নহে অভ্রান্ত প্রমাণ
দিয়েছ' সন্ধান
অপৌরুষেয় নহে বেদ
যুক্তিহীন যত ভ্রান্তি, যত মত ভেদ
ঘুচাইয়া নানাগ্রন্থে বহুতর্কজালে
দেখায়েছো সত্য যাহা অজর অমর কালে কালে!
আসমুদ্র হিমাচলে সারা হিন্দুস্থানে
জ্বলন্ত চিতার পর শ্মশানে শ্মশানে।
সতীদাহ রচিতেছে যবে
ভ্রান্ত অনুভবে
অধর্ম্মের নৃসংশ নিষ্ঠুর ক্রূর বেদী
তারি ঘন কৃষ্ণধুম লেলিহান্ অগ্নিশিখাভেদি
অসহায়া নারীর ক্রন্দন
জানি রাজা, করেছিল তীব্র আকর্ষণ
সহৃদয় তোমার অন্তর
নিরন্তর!
এই হত্যা অত্যাচার ত্বরা নিবারণে
প্রাণপণে
ছিলে যত্নবান,
ওগো মহাপ্রাণ!
বাল-বিধবার অশ্রু মর্ম্মভেদী তার দীর্ঘশ্বাস
দূষিত করিছে হেরি এদেশের আকাশ বাতাস,

নারী অভিশাপে
মহাপাপে
চলেছে যে জাতি রসাতলে
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীরে দলি পদতলে
সে পাপের বিভীষিকা সে ব্যথার গভীর বেদনা
হে উদারমনা
বেজেছিল তব মর্ম্মস্থলে
তাই নিজ অন্তরের বলে
নির্ভয়ে দাঁড়ায়েছিলে রোধিতে সে অকল্যাণ প্রথা
নারীর স্বপক্ষে তব কথা
অক্ষয় হইয়া রবে চিরদিন অগ্নির অক্ষরে
হতভাগ্য এ জাতির কলঙ্কিত প্রতি ঘরে ঘরে।
মনে মানে সত্য রাজা তুমি রাজা হয়ে রবে চিরদিন
যুগধর্ম্মে সিংহাসনে সর্ব্বকালে হে চির নবীন
মানবের জ্ঞানরাজ্যে বিস্তৃত তোমার অধিকার
যুগে যুগে কল্পকালে করিবে স্বীকার
নতশিরে সবে,
যতদিন এই বিশ্ব রবে।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

শব-সাধনা

(১)

জরা মরণের অধীন শরীর
রয়েছে রাজা সাগর পারে।
আত্মা অবিনাশী মুক্ত স্বরূপেতে
সত্য সাধনা প্রচারে ধীরে।

(২)

জাগ্রত স্মৃতির এ মহা শ্মশানে
সাধনায় ত্রিশূল প্রোথিয়া।
অনুভূতি দিয়া দেখ হে সাধক
পাবে হেথা চেতনা খুঁজিয়া।

(৩)

মগ্ন যোগে মহাবীরাসনে বসি
সাহিত্যের শব-সাধনায়
বাহ্যজ্ঞান করিয়া নিরোধ
হৃদিপদ্মে ভাব বাণী মায়।

(৪)

বিঘ্ন সাধনার প্রেত পিশাচাদি
কত রূপে করিবে ভ্রমণ।
প্রক্ষেপি সাধন-বারি চারিধারে
রক্ষা করো পূজার আসন

(৫)

ভয় যাঁরে ভয় বাসে মনে
তাঁরি রূপ হৃদয়ে স্থাপিয়া।
প্রাণময় পঞ্চ-তত্ত্ব দিয়ে
পূজা করো মানস ভরিয়া।

(৬)

জ্ঞান আঁখি খুলিবে আপনি
সিদ্ধি আসি বরিবে সাধনা।
বুঝিবে সে স্মৃতিময় শবাসন তব,
থেকে থেকে উঠিছে নাচিয়া।

(৭)

স্থির লক্ষ্যে রাজা রামমোহনের প্রায়
আশু হও বীরের মতন।
হেরিবে হৃদয়ে শ্বেত শতদলোপরে
যোগারূঢ়া বাণীর চরণ।

(৮)

হে গুণিন্ তোমাদের পুণ্য সঙ্গগুণে
কালি এই দেখিনু স্বপন।
তেঁই স্বপন-বাণী তদীয় সকাশে
নিবেদিল নলিনীরঞ্জন।

শ্রীনলিনীরঞ্জন দাস ঘোষ

অনাহারে একাদশী

কোন্ অসুরের অবিচার অনাহারে একাদশী,
রিক্ত সমাজের বুকে পিশাচের রুদ্র হাসি।
পুণ্যের গায়ে তপ্ত হাওয়া, দেশের জীবন পুড়ছে তাতে,
ধর্ম্মের শিরে অভিশাপ এ কালের বিষাণ বাজে যাতে।

শাহারার দারুণ তৃষায় যাচ্ছে ফেটে নারীর হিয়া,
নিদাঘের অগ্নি জ্বালা ঝল্‌সে দেয় গো কোমল কায়া।
নির্জ্জলা এই একাদশী করেছে যে প্রচলন,
হ'ক সে জ্ঞানী হ'ক ধার্ম্মিক নিঠুরের সে নিদর্শন।
এ নয় সত্য এ নয় ন্যায়, সাবধানের নয় এ বেড়া,
অবিশ্বাসের পতাকা এ, অপমানের রুদ্ধ কারা।
শুষ্ক কণ্ঠ শুষ্ক তালু, ওষ্ঠাগত নারীর প্রাণ,
পিপাসার জল দিয়ে মুখে রাখ মায়ের জাতির মান।
একাদশীতে বিধবায় খেতে দাও অন্তত ফল জল,
কোন পাপ আসবে নাকো, বাড়বে বরং ধর্ম্মবল।
সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে হয়েছে যারা অভাগিনী,
খুলে দাও গো তাদের তরে স্নেহ সুধা নির্ঝরিণী।
প্রেমময়ের রাজ্যে এই প্রভুত্বের অত্যাচার,
সইবে নাকো সইবে নাকো দূর কর এই অবিচার।

শ্রীসত্যেন্দ্রিয় চৌধুরী

বন্দনা-গীতি

রাধানগরের শ্মশান ভূমিতে
আজি কি আনন্দ মেলা,
মরাগাঙ্গে আজ একি চন্দ্রালোক
একি গো ভাবের খেলা।
ছিল একদিন অভিরাম হেথা
গড়েছিল ব্রজধাম,
ভেসেছিল দেশ প্রেমের বন্যায়
শুনিয়া সে হরিনাম।
সিদ্ধ সাধক আগমবাগীশ
জপিত হেথায় মন্ত্র,
বিস্মিত লোক দেখিত চাহিয়া
সে কি অভিনব তন্ত্র!

রামমোহনের জন্মভূমি এই
ধর্ম্ম যাহার বর্ম্ম,
শত নিগ্রহেও ভুলে নাই বীর
সাধিতে আপন কর্ম্ম।

ছিল গো আবার হেথা যদুনাথ
যাহার বিষ্ণু ভক্তি,
তীর্থ-ভ্রমণে ভগ্ন দেহেও
দানিত বিপুল শক্তি।

জন্মিয়াছিল প্রসন্নকুমার
দানিতে বিদ্যা দেশে,
ভিষগাচার্য্য সূর্য্যকুমার
আর্ত্তে সেবিত হেসে।

আনন্দ বিলা'ত আনন্দ বিমল
দ্বারে দ্বারে নিজে গিয়ে,
ছিল রাজনীতি রাজকুমারের
কান্ত ভাষাটি দিয়ে।

কেদারে এখনও ভুলে নাই লোকে
মনে আছে তার কথা,
রমাপ্রসাদের গরিমা কাহিনী
রয়েছে হৃদয়ে গাঁথা।

ত্রৈলোক্য গোকুল আরও কতজন
দেশের কল্যাণ তরে,
দেবতার বর যাচঞা করিত
সতত যুক্ত করে।

ছিল চৌধুরী কুলীন প্রতিষ্ঠা
যাদের স্বভাব ধর্ম্ম,
কুলীনের মান রক্ষা করাই
ছিল গো যাদের কর্ম্ম।

দত্ত ঘোষ বসু দাস ও মিত্র
চোঙ্গদার পাল, রায়,
রাধানগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে
সঁপেছিল প্রাণ-কায়।

মুখো বন্দ্যো ও ঘোষাল চট্টো
ঋষির সন্তান যাঁরা,
তাঁদেরই চেষ্টা তাঁদেরই যত্নে
চলিত সমাজ ধারা।

একদিন ছিল এ রাধানগর
নবদ্বীপেরই মত,
খানাকুলেরও প্রবল সমাজ
বিধান গড়িত যত।

নবশাখ যারা করিত তাহারা
সমাজ অঙ্গ পুষ্ট,
শ্যাম সর্দ্দারের লাঠির বহরে,
তফাতে থাকিত দুষ্ট।

আলি রহমানে সেখ মিয়াজানে,
হিন্দুরা ডাকিত "চাচা",
মুসলমানেরা সতত বলিত
হিঁদুর তরেই বাঁচা।

মধুর বাঁধন একটা কেমন
দেখা যেত পরস্পরে,
স্বার্থের তরে কেহ সহোদরে
দিত না তফাৎ ক'রে।

বাগানের ফল মাঠের ফসল
পুকুর ভরা মাছ,
ছিল যতদিন কেহ ততদিন,
লয়নি গোলামী ছাঁচ।

লাজ নিবারিতে তাঁতের কাপড়
ছিল গো উপায় মাত্র,
উত্তরীয়তে হইত লোকের
শোভিত নগ্ন গাত্র।

ঘরে ঘরে তবে চরকা ঘুরিত
চরকাই ছিল প্রাণ,
আনন্দ ব্যাপারে চরকার ছিল
চলিত একটা মান।

বিষয় সত্বেও বিলাস ভোগের
ছিল না কাহারও তৃষা,
তাইত সেকালে ছিল না লোকের
অকাল মরণ পেসা।

স্বাস্থ্যও ছিল লোকের তখন
মনটাও হত খাটি,
এ দুই থাকিলে ধর্ম্মও থাকে
চিনেও দেশের মাটি।

দেশ-মাতৃকার পূজার বিধান,
তাহাতেই লোক করে,
রাধানগরেতে এমন পূজারি
জন্মেছিল ঘরে ঘরে।

সে পূজার গুণে হয়েছিল গ্রাম
ধন ও ধান্যে ভরা,
তাহার বিহনে আজি গো হয়েছে
দৈন্য পীড়িত মরা।

দেবতা মন্দির পড়েছে ভাঙ্গিয়া
শ্রীছাদ গিয়াছে সব,
এ দিবা ভাগেও স্থানে স্থানে উঠে
শিবার উচ্চ রব।

গোপীনাথ আর রাধাবল্লভের
সে গরিমা গেছে চ'লে,
রাজরাজেশ্বর দোলমঞ্চ ওই
কবে পড়ে ভূমিতলে।

ঘণ্টেশ্বরের পুরাণ দেউল
কানা নদী কবে গ্রাসে,
দীন দেশবাসী সে কথা স্মরিয়া
কাঁপিছে সতত ত্রাসে।

যাঁদের পূজায় দেবতা তুষ্ট
আর ত তাঁহারা নাই,
আমরা "সভ্য" পূরণ করেছি
তাঁদেরই শূন্য ঠাঁই।

বিদেশী বিদ্যা শিখিয়া আমরা
সহরেই থাকি পড়ে,
দেশের ত্যক্ত পৈত্রিক ভিটায়
বনানী উঠেছে গড়ে।

সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে কি না জ্বলে,
সে তত্ত্ব রাখাও শক্ত,
দেবতার পূজা হয় কি না হয়
জানিনা আমরা "ভক্ত"।

তবুও দেবতা বাঁচায়ে রেখেছে
তবুও আছে যে বংশ,
এতেও লজ্জা নাই আমাদের
হবে বুঝি হলে ধ্বংস।

দেবতার স্থান হয়েছে শ্মশান
মোদের করম ফলে
ওই ঘন বন ওই মরা নদী
বিনায়ে বিনায়ে বলে।

গ্রাম প্রতিষ্ঠায় যাঁদের কীর্ত্তি
এখনও রয়েছে স্পষ্ট,
তাঁদের চক্ষে ঝরিছে অশ্রু
দেখিয়া এ গ্রাম নষ্ট।

এখনও রয়েছে সেই ঝাউ শ্রেণী
সে বৃহৎ দেবদারু,
শ্যামল মাঠের চিহ্ন এখনও
বলিছে ছিল তা চারু।

আছে অতীতের সাক্ষ্য
তাল-তমাল আম্র পনস
রয়েছে লক্ষ লক্ষ।

সর্ব্বাধিকারীর বিদ্যামন্দির
ডুবেছে দ্বারকেশ্বরে
এমনি অধম আমরা হয়েছি
ভাবিনা তাহার তরে।

প্রাচীন আকাশ চন্দ্র সূর্য্য
সবই আছে ত সেই;
নূতন "ভাবের ভাবুক" আমরা
মোদেরি সে প্রাণ নেই।

মহাতীর্থ স্থান হয়েছে শ্মশান
আজি গো তাহারি ফলে
রোগের বীজাণু পূর্ণ তাহাতে
আকাশ বাতাস জলে।

অতর্কতা হেতু বন্যা প্লাবন
প্লাবিত করেছে দেশ
কদন্ন ভক্ষণ কভু অনসন
দুঃখের নাহিক শেষ।

স্বাস্থ্য-নিবাস ছিল যেই দেশ
সে দেশ স্বাস্থ্য শূণ্য
গলিত পত্রে ম্যালেরিয়া জ্বরে
লোক হয় ম'রে ধন্য!

গ্রহ ফের বুঝি কাটিল আজিগো
তাই এ মহা শ্মশান—
মুখরিত আজি জন কোলাহলে
উঠিছে প্রীতির তান;

মন্ত্র যাঁদের করিল এমন
তাঁরাই জগতে ধন্য
সফল তাঁদের যত্ন চেষ্টা
অশেষ তাঁদের পুন্য।

শ্মশানেতে আজ সাহিত্য-মিলন
অতি অপরূপ বটে,
ভাঙ্গনেতে যাহা গিয়েছিল ভেসে
ফিরেছে তা পুনঃ তটে।

যাঁহার কৃপায় মূক কথা কয়
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি,
তাঁহারি অপার মহিমা স্মরিয়া
হৃদয় উঠিছে ভরি।

স্বাগত স্বাগত অতিথিসঙ্ঘ
শ্মশান সুন্দর বাসে,
সর্ব্বদেবময় অতিথি সেবায়
সকল বিপদ নাশে।

এ দেবতা পূজার কোনো উপচার
নাহিক এ ভাঙ্গা ঘরে
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির অর্ঘ্য
আছে তোমাদেরি তরে।

বিপিনবিহারী থাকিলে আজিকে
অতিথি সেবার ভার
বহিবার তরে ভাবিতে হ'ত না
এত জোরে কারো আর।

অধুনা তাঁহারি প্রাণপাত শ্রমে
পড়েছিল দেশে সাড়া
হ'ত না একটি দেশের কার্য্য
তাঁহার চেষ্টা ছাড়া।

দেশ-প্রাণ যে ছিল গো এমন
সেই ত দিয়াছে ফাঁকি,
কর্ম্মযোগী গো গিয়াছে চলিয়া
কর্ম্ম রাখিয়া বাকি।

তাইত সবার ভাবনা অপার
বাখিবে কেমনে মান
হেথা যে এসেছে সাহিত্য-যজ্ঞে
সাহিত্যের যারা প্রাণ।

সুদূর পথের অশেষ দুঃখ
সহিয়া এসেছে যারা
তাদের যোগ্য সেবার তরেতে
ভাবিয়া সকলে সারা।

ধরণী যতীন ললিত কিশোরী
আছে বটে বহু জন
কিন্তু তারা যে গুরুর শোকেতে
ভাঙ্গা বুক ভাঙ্গা মন।

অতিথি সেবার শত অপরাধ
হইতেছে বারে বারে
সে সবের তরে সমাগত সুধী
ক্ষমা চাই জোড় করে।

হে বাণীসেবক তোমাদের কাছে
দিলাম হৃদয় খুলি
ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি যা কিছু আমাদের
ভুলিও সকলগুলি।

তোমাদেরি তরে এ মহা শ্মশান
হয়েছে নন্দন আজ
মধুর মিলন হউক ধন্য
বিশ্ব জগত মাঝ।

এ মরা-নদীতে বহিছে আজিকে
আবার উজান ধারা
শুষ্ক তরু আজ মুঞ্জরি উঠেছে
পাইয়া প্রাণের সারা।

দেশ ও দশেরে এইটী বুঝাও
আর না ঘুমায় তারা।
দেশ-মাতৃকার ঘুচাক দুঃখ
হইয়া আপন হারা॥

দেশাত্ম-বোধেতে দেশের কার্য্য
করুক সকলে মিলে
নতুবা বিফল প্রবন্ধ কবিতা
—কি হবে বক্তৃতা দিলে।

প্রাচীনের স্মৃতি উঠুক জাগিয়া
অনুরাগ ভরা বুকে
বন্দনা-গীতি হউক ধন্য
মধু মিলনের সুখে।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদির সারাংশ

(ক) সাহিত্য-শাখা।

১। রাজর্ষি রামমোহনের রচনা-রীতি।

লেখক—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র।

সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে অলঙ্কার ও রচনা-রীতি (style) এই দুই জিনিষের আবশ্যক। রচনা-রীতিতে শব্দ ও অর্থ এই দুইয়ের মিল আছে। রচনা-রীতির গঠন ক্রমে ক্রমে হয়। রচনা-রীতি লেখকের প্রকৃতির প্রতিবিম্ব। লেখকের মানসিক প্রকৃতি ও তাঁহার রচনা-রীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃতির আলোচনা আবশ্যক। তিনি হিন্দুর শাস্ত্রসমূহ স্বীকার করিয়া বিরোধী বচন সমূহের মীমাংসা করিতেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ও মীমাংসা-সামর্থ্য ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজী ও বাঙ্গালা গদ্য রচনার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল। তাঁহার বাঙ্গালা রচনার গতি সরল নহে। তাঁহার রচনার গতি সাধারণতঃ সরল ও স্বচ্ছন্দ নয়। তাঁহার ভাষা অতি জটিল। "সংবাদ-কৌমুদী" পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসকল তিনি বেশ সরল ও স্বচ্ছ ভাষায় লিখিতেন। তিনি ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার লেখায় মানসিক উষ্ণতার পরিচয় বড় পাওয়া যায় না। তর্কবিতর্কের সময় প্রতিপক্ষকে অশোভন কথা বড় তিনি বলিতেন না। নিজ মত স্থাপন করিবার জন্য তিনি বড় বেশী ব্যগ্র ছিলেন না বলিয়া এরূপ যাঁহারা করিবার প্রয়াসী, তাঁহাদের ভাষার গতির ন্যায় তাঁহার ভাষার গতি সরল স্বচ্ছন্দ ছিল না।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমদেশের চিন্তা-প্রণালীর প্রথম সংঘর্ষ রাজা রামমোহন রায়ের মানসিক জীবনে ক্রিয়া করিয়াছিল এবং তিনি তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার বলে, ইহাদের সমন্বয় সাধন করিয়া, তাহার ভিত্তির উপর এতদুভয়ের অপেক্ষা এক বৃহত্তর ও মহত্তর সাধনার সুবর্ণ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

২। সাহিত্য ও জাতি গঠন। লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এম এল সি।

ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য আদর্শস্বরূপ। অন্যান্য দেশের অর্থবল ও পণ্যবল যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, বঙ্গদেশের কেবল সাহিত্যই বিস্তৃত হইতেছে। সকল জাতির আদর্শ-সাহিত্য ধর্ম্মমূলক। সাহিত্য জাতীয় জীবন ব্যক্ত করে। জাতির অবস্থা বিপর্য্যয়ের সহিত সাহিত্যেরও রূপান্তর ঘটে। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে জাতীয় জীবন নূতন প্রাণে উদ্দীপিত হয়। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের ফলে বঙ্গসাহিত্যে নূতন যুগ উপস্থিত হয়। গ্রীক, ইংরাজ প্রভৃতি জাতি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য কিরূপ উদ্যম, ত্যাগ-স্বীকার ও যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা পড়িয়া এদেশে নূতন জাতীয় ভাবের সঞ্চার হয়।

বাইরণ ও স্কটের উদ্দীপনাময়ী ভাষায় নূতন ভাবের উন্মেষ হয়। গানে, উপন্যাসে, ইতিহাসে, সাময়িক সাহিত্যে স্বদেশকে জাগাইয়া তুলে। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের লেখনী-বিন্যাসে দেশে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বঙ্গের গ্রামে কৃষক ও শ্রমজীবিগণের মধ্যে শিক্ষার অভাবে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। দেশবাসীর আশা যে, সাহিত্যিকগণ দেশসেবাকে সাহিত্য-সেবার অঙ্গীভূত করিয়া অতীত ও বর্ত্তমানের এই সন্ধিস্থলে দেশের ভবিষ্যৎ গঠন-কার্য্যে যেন অমনোযোগী না হন।

৩। সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা।

লেখক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্।

সমালোচনা বলিতে কি বুঝায়? সুকুমার কলার বিষয়ীভূত যাহা কিছু প্রচারিত হয় তাহার দোষগুণ বিচার করিবার চেষ্টার নাম সমালোচনা। রসানুভূতি (appreciation) ও সমালোচনায় এই পার্থক্য যে, শেষোক্ত পদ্ধতি দোষ-গুণ বিচার করে এবং রসানুভূতি-গুণ ব্যাখ্যা করে। সমালোচনা দ্বারা নিরপেক্ষভাবে সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। প্রকৃত সমালোচনার ফলে শিক্ষার বিস্তার হয়। চিত্র শিল্প কাব্যাদির বর্ণিতব্য বিষয় মানব জীবনের অনুভূতি ও ভাবের অভিব্যক্তি। সমালোচনা করিতে হইলে মনোবিজ্ঞানের নির্দ্ধারিত সত্যগুলির সহিত সমালোচকের পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক। বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ না হইলে সমালোচনা করা কঠিন। সাহিত্যক্ষেত্রে ভাল মন্দ বিচার করিবার ভার সমালোচকেরা স্বেচ্ছায় লইয়া থাকেন। সমালোচকের প্রধান কর্ত্তব্য সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আলোচ্য পুস্তক একাধিকবার পাঠ করা। নূতন প্রকাশিত পুস্তকগুলি সমালোচক সর্ব্বাগ্রে পাঠ করিয়া তাহার বক্তব্য বিষয় কি, তাহা পাঠকগণকে জানাইবার তিনি সহায়তা করেন। লেখকের ভাবের

সহিত পরিচিত হওয়া পাঠকের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে পারা যায় এবং যে সমালোচক বিশ্লেষণ কার্য্যে সাহায্য করেন, তিনি ধন্যবাদার্হ। শিষ্ট সমালোচনার উদ্দেশ্য লেখকের অনুজ্জ্বল ধারণাকে নূতন তথ্য দ্বারা ও জ্ঞানগত প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা উজ্জ্বল করা। প্রকৃত সমালোচক সাধারণ রুচির পরিবর্ত্তক। সাহিত্যে সমালোচনা উঠিয়া গেলে একটি অপূরণীয় ক্ষতি হইবে।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের মুকুর—জাতীয় জীবনের চিত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতির সভ্যতা ও অনুশীলনের ধারা সহজে বুঝিতে পারা যায়। আজ কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও সংযমের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। অধুনা যে সকল চিত্র ও সমস্যা কথা-সাহিত্যে প্রকাশ হইতেছে তাহাদের অধিকাংশ বিদেশীর অনুকরণে চিত্রিত ও লিখিত। উহাদের ভিতর অনেকগুলি যে কাল্পনিক বা বঙ্গদেশের উপযোগী নয় তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে, ইহা চিন্তাশীল পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না এবং এই সকল অনাগত সমস্যা বঙ্গ দেশের ধাতসহ কি না তাহাও বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। নিরপেক্ষ সমালোচকেরা এই সকল মত বিচার করিয়া সাহিত্যের আবর্জ্জনা দূর করিতে পারেন, গুণের আদর করিতে পারেন ও প্রকৃত মনীষার পূজায় মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া অসুন্দরকে পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরের উপাসনা করিতে পারেন। আপাত মনোরম লালসাবর্দ্ধক চিত্রের স্থানে বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্যদ্যোতক ভাবোদ্রেককারী চিত্র অঙ্কিত হইলে সৎসাহিত্যের প্রচার এবং সমাজ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

৪। চণ্ডীদাস। লেখক—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন।

চণ্ডীদাস বীরভূমের অমর কবি, অমৃত সঙ্গীতের রচয়িতা। চণ্ডীদাসের নিবাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন"কে অবলম্বন করিয়া কেহ বলেন চণ্ডীদাস দুই জন। কাহারও মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবিই আসল। কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কবির বাল্যবয়সের ও পদাবলী তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা। চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কয়েকটী প্রাচীন পদাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের গান লইয়া তেমন আলোচনা হয় নাই।

৫। আরামবাগ সাব-ডিভিশনের অভাব অভিযোগ ও প্রতিকার প্রার্থনা। লেখক- শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ শেঠ।

সমগ্র বাংলা ভূমি, বাংলা ভাষা, বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার, চরিত্র ও গুণ ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া সমগ্র বাংলার সৌন্দর্য্যের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে, বাংলার গ্রাম ও নগরগুলির অবস্থা, স্বাস্থ্য, ধন-সৌন্দর্য্য ইত্যাদি নির্ণয় করিতে হইবে। লেখক পল্লীগ্রামবাসী। পল্লীগ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। আজীবন পল্লীগ্রামে থাকিয়া তাঁহার অবস্থা, নাগরিকগণের তাঁহার প্রতি অনাস্থা ও উদাসীনতা দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা রোগে সুচিকিৎসক হইতে বঞ্চিত, সর্ব্বদা ম্যালেরিয়া, কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগে জর্জ্জরীভূত ও বন্যাপ্রপীড়িত। সদ্‌জ্ঞান ও বিদ্যা অভাবে তাঁহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাঁহাদের অভাব ও অভিযোগ জানাইবার নিমিত্ত এই রাধানগর গ্রামে সমবেত বিখ্যাত সুধীমণ্ডলীর কাছে উপস্থিত হইয়াছেন।

আরামবাগ মহকুমায় আসিবার রেলওয়ে নাই, ভাল রাস্তা নাই, যাতায়াতের কোনও প্রকার যান নাই। আরামবাগবাসিগণ স্বাস্থ্যহীন, জ্ঞানহীন, বিদ্যাহীন, উৎসাহহীন। এই স্থানে শিক্ষিত বিদ্বান্‌ব্যক্তির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত খুব অল্প। এখানে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা অপ্রচুর। এই দেশের সাধারণ লোক দরিদ্র। ইহা কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের অভাব হয়। পানীয় জলের অভাবে সাধারণে অপরিষ্কৃত জল পান করিতে বাধ্য হয়। এই সাব-ডিভিশনের রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায় ও কামারপুকুরে ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহাদের জ্ঞান, বিদ্যা ও শক্তির অভাব এবং তজ্জন্য তাঁহারা পরাধীন। ইহা দূর করিতে হইলে উপযুক্ত গুরুর আবশ্যক। দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশকে শিক্ষিত করা প্রয়োজন।

৬। মাতৃভাষা। লেখক—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট হইতে মুসলমানের পক্ষে বেদাদি হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ তৎকালে আদৌ সম্ভব ছিল না। ভারতে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হইলে ফার্সি ও আরবী ভাষা রাজভাষা হইয়া উঠে। বঙ্গীয় ভাষা রাজভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া বঙ্গদেশীয় বৈষয়িক কার্য্য সকল সম্পাদনে সাহায্য করিত। হিন্দুদিগের সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ের লিখন-পঠনে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব

পরিদৃষ্ট হইত। ইউরোপীয়গণের মধ্যে পর্ত্তুগীজ ডোম্যানিক সোসা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর অবসান সময়ে বঙ্গভাষায় কথামালা রচনা করেন। খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গীগণ বঙ্গীয় ভাষার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আর্ম্মানীয়ানরাও অনেকে ভালরূপ বাংলা ভাষা জানিতেন।

তৎপরে লেখক মহাশয় ইংরাজ আমলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভাষার যেরূপ প্রচলন ছিল, তাহার নিদর্শন দেন। ইহা হইতে ভাষার বিকাশের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

৭। (সাহিত্যে লৌকিক ধারা) বানর ও বাবুইর গল্প। লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে "বানর ও পিয়াবার কেস্সা (কেচ্চা)" নামে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এই কেচ্চার উপদেশ এই যে, মূর্খকে উপদেশ দিলে নিজের অনিষ্ট হয়। এই কেচ্চার অনুরূপ একটি গল্প হিতোপদেশে ও অপর একটী উপাখ্যান পালি জাতকে দেখিতে পাওয়া যায়। হিতোপদেশের গল্প সংস্কৃতে এবং জাতকের গল্প পালি ভাষায় রচিত।

তিনটী গল্প তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেকটীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, তিনটী গল্প যেন একই গল্পেরই তিনটী বিভিন্ন সংস্করণ। তন্মধ্যে সংস্কৃত গল্পে ব্রাহ্মণ নীতিকার ও পালি উপাখ্যানে বৌদ্ধ ধর্ম্মোপদেষ্টার শুষ্ক ও অযথা পাণ্ডিত্য আছে। তাঁহাদিগের হস্তে গল্পটী সজীবতা ও সরলতা হারাইয়াছে। লৌকিক কেচ্চার মধ্যে সজীবতা ও সরলতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত আছে।

৮। মেঘনাদবধে লক্ষ্মণ। লেখক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আয়কত এম এ, বি এল।

মাইকেল বাল্মীকির রামায়ণ হইতে মেঘনাদবধের প্রতিপাদ্য বিষয়টি গ্রহণ করিলেও Aristotle-এর নিয়মে রচনা করিয়াছেন। তিনি সীতার উদ্ধারের জন্যই মেঘনাদবধের অবতারণা করিয়াছেন, ও ইহাকে আট সর্গে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি মেঘনাদকে নায়ক এবং প্রমীলাকে নায়িকা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে এক আপত্তি উঠিয়াছিল যে, মেঘনাদ নায়ক হইবার উপযুক্ত পাত্র নহে, কারণ, মেঘনাদ রাক্ষস। কিন্তু পাশ্চাত্য কাব্যকলার রীতি এই যে, নায়ক বা নায়িকা মুখ্যভাবে বীরত্বসূচক কোন কার্য্য করিলে তাহার যদি গৌণভাবে কতিপয় দোষ থাকে তাহাতে ক্ষতি নাই। মেঘনাদ লঙ্কার মধ্যে

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। ইনি স্বর্গ জয় করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আনিয়াছিলেন, সুতরাং মেঘনাদকে নায়ক করা অসঙ্গত হয় নাই। মেঘনাদকে hero করাই মাইকেলের উদ্দেশ্য, সেইজন্য নিরস্ত্র অবস্থায় লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তাহাকে নিহত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অনেকের নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ অন্যায়রূপে সংঘটিত হয় নাই; কারণ ইহার এক পক্ষে অধার্ম্মিক রাক্ষস আর অপর পক্ষে নররূপধারী ভগবানের অংশ রাম, লক্ষ্মণ। ইহারা নিজের পরাক্রম দেখাইতে আসেন নাই, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে আসিয়াছিলেন।

মাইকেল পাশ্চাত্য কাব্যকারগণের পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। নৈতিক হিসাবে লক্ষ্মণের কার্য্য সমর্থন করা যায়। পাশ্চাত্য কাব্য ও নাটকের প্রথানুসারে কবি ভবিষ্যতের আশা বা অপেক্ষাকেই (expectation) মূলমন্ত্র করিয়া বৃত্তান্তটাকে পল্লবিত করিয়াছেন। নানা দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মেঘনাদকে নায়করূপে পরিচয় দিবার উৎকৃষ্ট সুযোগ কবিবর পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিভা বিকাশের ইহা সহায়ক হইয়াছিল। কিন্তু তিনি লক্ষ্মণকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বড় রাখিয়াছেন। লক্ষ্মণের চরিত্র আপাত দৃষ্টিতে অসঙ্গত মনে হইলেও কবিবর অলৌকিক নৈপুণ্যসহকারে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার অকলঙ্কিত চরিত্রে কুত্রাপি দোষ স্পর্শ করে নাই।

৯। সাহিত্যে সমালোচনার স্থান। লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্ এ।

এই প্রবন্ধে লেখক সাহিত্যের স্বরূপ ও তাহার সহিত নিরপেক্ষ সমালোচনার সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে। সমালোচনার অভাবে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সম্ভব কি না, সমালোচনা সৎ ও সতেজ সাহিত্য সৃষ্টির পথরোধ করে কি না, উভয়ের স্ব স্ব ক্ষেত্রের উপকারিতা, ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের সমালোচনার স্বরূপ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মধুসূদন প্রভৃতি সাহিত্যমহারথগণের কোন্ কোন্ বিষয় আজ পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে সমালোচিত হয় নাই তাহাও প্রসঙ্গত আলোচিত হইয়াছে। বিশ্ব-সাহিত্যে সমালোচনার ইতিহাস, বঙ্গসাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনার অভাব, ও এই শ্রেণীর সমালোচনার বিপদ্‌সত্ত্বেও তাহার উপকারিতা আলোচিত হইয়াছে। পরিশেষে সাহিত্য ও কাব্যের সংজ্ঞা সম্বন্ধে সাহিত্যমহারথগণের মতামত, সংজ্ঞা লইয়া বিবাদের অসারতা ও লিটারেচার ও জর্ণালিজ্‌ম্-এর

প্রকৃত সম্বন্ধ বোঝান হইয়াছে। তৎপরে লেখক নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন,—কবি কি বলিতেছেন, কেন এবং কিরূপভাবে বলিতেছেন এবং কতদূর মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন তাহা সমালোচককে বুঝাইয়া দিতে হইবে। রচনার বিষয় লইয়া সর্ব্বাগ্রে সমালোচনা করা উচিত, এ বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, লেখক মহাশয় তাঁহাদের দ্বারা কতদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাহা দেখাইতে হইবে। তৎপরে, প্রবন্ধটি মৌলিক কি না সে বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে ও সাহিত্যজগতে ও মানবসমাজে ইহার ফলশ্রুতি কিরূপ হইবে তাহার আলোচনা করিতে হইবে। ভাষা বা ছন্দের বৈশিষ্ট্য, ভাবের সৌন্দর্য্য ও মৌলিকত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে কি না, নিরপেক্ষভাবে তাহা সমালোচক দেখাইয়া দিবেন। মনের ভাব ও ভাষার উপর কতকটা দখল থাকিলে কতকটা কবি হওয়া যায়। কিন্তু সমালোচক হইতে গেলে সাধারণ জ্ঞান প্রখর ও সমদৃষ্টি থাকা চাই। সমালোচকের কর্ত্তব্য, প্রথমে যে ভাষায় পুস্তক রচিত হইয়াছে তাহার সহিত সম্যক্ পরিচয় থাকা ও তাহার সাহিত্যের উপর কতকটা দখল থাকা। লেখকের যুগ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা থাকা চাই আর লেখক যদি বিদেশীয় সাহিত্য হইতে উপকরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই সাহিত্যের সহিত, অন্ততঃ সেই ভাষার অনুবাদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় থাকা চাই। সর্ব্বোপরি সমালোচককে নিরপেক্ষ হইতে হইবে ও স্বাধীন মতপ্রকাশ করিবার তাঁহার সাহস থাকা চাই। সাহিত্যরসপিপাসু না হইলে সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র।

৯০। সোমরস। লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ভাগবতশাস্ত্রী সাংখ্য-পুরাণ-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বেদের সোমরস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বেদের সোম সর্ব্বত্র চন্দ্র নহেন। সোম কোথাও সোমরস, কোথাও সোমলতা, কোথাও বা চন্দ্রমা। বেদের স্থানে স্থানে সোমলতা ও চন্দ্র, উভয়কেই ওষধিপতিরূপে বর্ণিত দেখা যায়। ইহা ছাড়া রূপক অর্থে ধারাধর অর্থাৎ মেঘকেও সোম নামে কোন কোন স্থলে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণ কিরূপ নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সোমরস প্রস্তুত করিতেন, কি উপায়ে সোমরস শোধন করিতেন এবং কিরূপ পাত্রে উহা রক্ষিত হইত, লেখক মহাশয় তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ঋক্ ও

সামবেদের সোমরস সম্বন্ধীয় কতিপয় মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া, সোমরসের গুণাবলী স্তুতি ও প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে।

১১। হরফের মামলা। লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী।

সংস্কৃতের ছায়া কায়া লইয়া বাংলা ভাষার অনেকগুলি হরফ বা অক্ষর। হসন্ত এবং ফলা এই অক্ষরগুলিকে সংযত রাখিয়াছে। হরফগুলি অপেক্ষা তাহাদের উপকরণগুলি নিতান্তই স্বাধীন ও উচ্ছৃঙ্খল। ফলাগুলির ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়। সর্ব্বদাই তাহারা হরফগুলিকে নির্য্যাতিত করিবার চেষ্টায় আছে। কতকগুলা হরফ দ্বীপান্তরিত, নির্ব্বাসন-দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া একেবারে সাহিত্যের আসর হইতে বাতিল হইয়াছে। বাংলা হরফের মুসলমান রাজত্বের সময় বাংলা ভাষার সঙ্গে মুসলমানী ভাষা কিছু আসিয়া পড়িয়াছে। অসভ্য জাতিদের মধ্যে অনেকেরই হরফ নাই। তাহাদের লেখাপড়ার জঞ্জাল নাই।

১২। বিস্যুদের দোষ। লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী।

বারবেলাগুলি সবই বর্জ্জনীয়। রাত্রিকালের বারবেলাকে কালবেলা বলে। প্রত্যেকদিনেই একাধিকবার বারবেলা আছে, তন্মধ্যে বৃহস্পতি ও শনির শেষ বিশেষভাবে বর্জ্জনীয়। ইহারা বিশেষভাবে মন্দ ফলদায়ক। তাই সকলে ইহাদিগের সহিত অসহযোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেক দিনেই সময় বাছিয়া বারবেলা ও কালবেলা আছে। জ্যোতিষের মতে এই সময় দূষ্য ও শুভকার্য্যে পরিবর্জ্জনীয়। সুতরাং সকল হিন্দুই এই বারবেলাগুলিকে মানিয়া চলেন।

১৩। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতার সার-মর্ম্ম।

বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার এখন প্রয়োজন খুব বেশী হইয়াছে। উপনিষদ্ বলেন, আত্মানং বিজানিহি'—আপনাকে জানিতে হইবে। আমরা কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম—এসব কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা নিজেরা কিছু ভাবি না। ইংরাজেরা যাহা বলিয়া দেন, তাহাই তোতাপাখীর মত আমরা বলিয়া থাকি। আমরা এখন কর্ত্তাভজা হইয়া পড়িয়াছি। কর্ত্তাভজাদের মতে গুরু সত্য। তিনি যাহা বলান তাহাই বলি, যাহা খাওয়ান তাহাই খাই। আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব বুঝিবার জন্যই বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করা উচিত। এখন সাহিত্যের গতি ইংরাজীর গতির অনুকূলে চলিতেছে। ইংরাজেরা যেমন

কুকী, গারো প্রভৃতি জাতিদের ভাষাকে রোমান অক্ষরে লিখিয়া সাহিত্যের ভাষা তৈয়ারী করিতেছেন, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তিনি ইতিহাসের মূল অনুসন্ধান করেন নাই। বাঙ্গালা দেশে চন্দ্রদ্বীপে খ্রীষ্টের সপ্তম ও অষ্টম শতকে একটা প্রচণ্ড ধর্ম্মমতের প্রচার হইয়াছিল—সে ধর্ম্মের নাম কৌলধর্ম্ম। আমি সংস্কৃতে লেখা ঐ ধর্ম্মের একখানা মূল পুঁথি পাইয়াছি। তাহা কথিত ভাষার সংস্কৃত অনুবাদ। বইখানির নাম "মহাকৌল-জ্ঞান-বিনির্ণয়।"

পূর্ব্বে 'কৌল'শব্দের অর্থ জানিতাম না। ইহা শৈব ধর্ম্মের অংশ। চন্দ্রদ্বীপে এক সময়ে হর-পার্ব্বতী মৎস্যেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ ধীবর—কৈবর্ত্ত বা কেবট জাতির লোক ছিল। তাহার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভোলানাথ তাহাকে জ্ঞান দান করেন ও তাহা সযত্নে রক্ষা করিতে বলেন। বেচারা উহাকে সিন্ধুকের ভিতর রাখিয়া দেয়। ইতিমধ্যে কার্ত্তিক ইঁদুরকে দিয়া বাক্সটী কাটিয়া উহা সমুদ্রে ফেলিয়া দেন। তখন মহাদেব বলেন, মাছে উহা নিশ্চয় খাইয়া ফেলিয়াছে—জাল ফেল। একটা মাছের ভিতর উহা পাওয়া গেল। মৎস্যেন্দ্রনাথ আবার উহা সযত্নে রাখিয়া দিলেন। আবার কার্ত্তিক আসিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন। এবার একটা বৃহৎ তিমি মাছে উহা গিলিয়া ফেলিল। মৎস্যেন্দ্রনাথ অন্যান্য ধীবরের সাহায্যে মাছটা ধরিয়া জ্ঞানকে উদ্ধার করিল। ইহাদের গুরুগণের নাম—নবাই, সবাই, বিন্দাই। নামের শেষে 'আই' থাকাতে বুঝা যাইতেছে ইহারা বাঙ্গালী। কৌলধর্ম্মের প্রচার বেশ চলিতে লাগিল। চন্দ্রদ্বীপ, নোয়াখালী, কুমিল্লা ইহার প্রধান আড্ডা হইল। মৎস্যেন্দ্রনাথ যোগী হইলেন। যোগীরা শিব পূজা করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাদের আচার ব্যবহার হিন্দুর মত ছিল না। এই ধর্ম্মের শিষ্যেরা ভারতবর্ষের সমুদয় স্থানে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে লাগিল। কালবশে এই ধর্ম্মের যজমানেরা অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। নাথেরা তাঁত বুনিতে লাগিল, ভাতের মাড় দিয়া কাপড় বুনিতে লাগিল। হিন্দুরা এই ব্যবহারের জন্য ইহাদিগকে ছোট জাত বলিয়া প্রচার করিলেন। ইহাদের ভিতর যাহারা যজমানী করিত (Priestly class), তাহাদের একখানি মূল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভাষা বাঙ্গালা ছাড়া কিছুই হইতে পারে না। দেখুন—"তথাচ পর দর্শনে মীননাথ বহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।" নাথেদের দ্বারা বাঙ্গালার যথেষ্ট পুষ্টি হইয়াছে। উড়িষ্যার প্রান্তরভাগে 'বজ্রযান' নামে একটা জাতি আছে। তাহারা বৌদ্ধ। তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ তিব্বতদেশে অনেক আছে।

সেগুলি বাঙ্গালা বইএর তিব্বতীয় তর্জ্জমা। এসবগুলির যথোচিত আলোচনা না হইলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস কখনও বাহির হইবে না।

ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে সহজ জ্ঞানের প্রচারক লুইপাদ রাঢ়ে এক নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাকে আদিসিদ্ধাচার্য্য বলে। তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক সকলেই সিদ্ধ বলিয়া ব্যক্ত। এসব কথা আমি বৌদ্ধগান ও দোঁহায় বলিয়াছি। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরে 'লুই'এর নামে পাঁঠা মানসিক দেয়। এগুলি ঠিক আমাদের ধর্ম্মের ষাঁড়ের মত। যথা ইচ্ছা বেড়াইতে পারিত, কেহ এগুলিকে ধরিতে বা মারিতে পারিত না। ধর্ম্ম ঠাকরের পূজার দিন ঐ সকল পাঁঠা কাটা হইত। লুইএর অপর একটী নাম মৎস্যান্ত্রপাদ অর্থাৎ যিনি মাছের আতড়ি খান। তাঁহার গুরু মচ্ছন্দরনাথ নেপালে পূজিত হন। বর্ষার পূর্ব্বে তাঁহার রথযাত্রা হয়। একবার নেপালে এরূপ রথযাত্রা দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। তাহাদের ৫০টী গান বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। প্রায় ২০০ দোহার ও নেওয়ারিদেব ১০০০ গান আছে। আমি নেওয়ারী পোষাক পরিচ্ছদ টুপী ইত্যাদি পরিয়া তাহাদের বৈঠকে বসিয়া ২১৫টী গান লিখিয়া আনিতে পারিয়াছি। তাহাও ছাপাইয়া দিয়াছি। তাহাদের মুদ্রায় জয়দেবের রাগ-রাগিণীর মুদ্রার অনুরূপ রাগাদি আছে। তাহারা নিজেরা গানগুলির ভাষা সংস্কৃত বলে। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ গানের ভাষাই পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা। দুই চারিটী অন্য ভাষার গানও আছে। ৮০০ বছর আগে কতকগুলি বাঙ্গালী নেপালে যান। ১৫০ বছর পরে আরও কয়েকজন বজ্র উপাধিধারী বাঙ্গালী 'বজ্র-যোগিনী' গান লইয়া নেপালে যান। এই গানগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন জেলার রচনা-নীতি (idiom) আছে। কুক্করীপাদ উড়িষ্যাবাসী ছিলেন। তাঁহার গানে উড়িয়া ভাষার অনেক শব্দ আছে। চাটিলপাদের গানগুলিতে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী গানের একটী চরণ দেখুন :—

"ভবনদী গহন গভীর বেগে বাহিল।" ইহাকে বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা বলা চলেই না। এখন এই সকল প্রাচীন বাঙ্গালার অনুসন্ধান না লইলে বাঙ্গালা ভাষার গতি বুঝিতে পারা যাইবে না। এখানে আর একটা কথা— যে কথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও তাহার বলিতে চাই। বড়ু চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস একব্যক্তি নন। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ও পদাবলীর ভাষা এক নহে।

বড়ু চণ্ডীদাসের চাটিলপাদের ও বিদ্যাপতির কীর্ত্তিলতার ভাষা একরূপ। কীর্ত্তিলতা ইতিহাস গ্রন্থ।

তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া পাঠ করিতে হইবে। উপনিষদের সেই কথা 'আত্মানং-বিজানিহি' মনে রাখিতে হইবে। জাতি-তত্ত্বের মূলসূত্র ধরিতে না পারিলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘৃণা অসূয়া থাকিয়া যাইবে।

জাতির কথাটা যখন উঠিল তখন একটা কথা বলি। জাতি তিন প্রকারে গঠিত হয়। (১) Occupational ব্যবসায়গত জাতি। (২) Ethnic জাতি—সাঁওতাল, ওরাং প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের দৈহিক ও মানসিক গুণের তারতম্যানুসারে শ্রেণী বিভাগ। (৩) Priestly caste পুরোহিত জাতি—যেমন য়িহুদীদিগের ভিতর লিভাইট জাতি। পারস্য দেশে মুসলমানদের আক্রমণে পারসী পুরোহিতজাতি ধ্বংস হইয়া যায়। মগেদের সংমিশ্রণে তাহারা বোম্বাই প্রদেশে আসিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। বাঙ্গালার যোগী জাতিরাও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত আলোচনা না হইলে বাঙ্গালার জাতি-তত্ত্বের প্রকৃত ইতিহাস কোন দিনই বাহির হইবে না। কালস্রোতে ও ইংরাজী ভাষার স্রোতে গা ভাসান দিলে চলিবে না। আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালাভাষার দিকে অবহিত না হইলে সত্যের সন্ধান পাইব না।

(খ) দর্শন-শাখা

১। যোগদর্শনের চিত্ত। লেখক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, বেদান্ত-রত্ন।

এই প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, সাংখ্য ও যোগ এক পর্য্যায়ের দর্শন। সাংখ্যাচার্য্যেরা এই বৈচিত্র্যময় বিবিধ বিশ্বের বিশ্লেষণ ও সমূহন করিয়া এক চরম দ্বৈতে উপনীত হইয়াছেন। সে মহাদ্বৈত—পুরুষ ও প্রকৃতি। যোগদর্শনের দ্রষ্টা=পুরুষ এবং দৃশ্য=প্রকৃতি। দ্রষ্টা—Subject=বিষয়ী, দৃশ্য—Object =বিষয়। সত্ত্ব প্রকাশশীল, রজঃ ক্রিয়াশীল এবং তমঃ স্থিতিশীল। কাজেই পাতঞ্জলের 'দৃশ্য', সাংখ্যের প্রধানশব্দবাচ্য ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। লেখক যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই দৃশ্য বা প্রকৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক। এই পুরুষ ও প্রকৃতি—দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপ মহাদ্বৈতের মধ্যে চিত্ত কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত? সাংখ্যাচার্য্যেরা পুরুষকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বরূপ বলিয়াছেন। পতঞ্জলিও বলেন, দ্রষ্টা

বা পুরুষ চিন্মাত্র এবং শুদ্ধ বা কেবল বা নির্গুণ। চিত্ত কিন্তু নির্গুণ। সুতরাং চিত্ত প্রকৃতির পর্য্যায়ভুক্ত। প্রকৃতির উপাদানে গঠিত বলিয়া চিত্ত জড় বা অচেতন। কিন্তু যখন ইহার সহিত চিন্ময় পুরুষের অনাদিসংযোগসিদ্ধ সম্বন্ধ, তখন জড় হইলেও চিত্তকে সর্ব্বদা সচেতন মনে হয়। যেমন অগ্নির সংস্পর্শে লৌহের উষ্ণত্ব, সেইরূপ চিৎ-সংস্পর্শে চিত্ত বা অন্তঃকরণের চেতনত্ব। লেখক বহু যুক্তি দিয়া চিত্তের Psychology ও Pathologyর আলোচনা করিয়াছেন।

চিত্তের বৃত্তি বা প্রত্যয় হয় শান্ত (সুখাত্মক), নয় ঘোর (দুঃখাত্মক), না হয় মূঢ় (মোহাত্মক) হইবেই হইবে। চিত্তের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, চিত্তের পাঁচটী অবস্থা বা ভূমি আছে,—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।

ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্তের পক্ষে যোগ অসম্ভব। কিন্তু—বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিতে পারিলে যোগের সম্ভাবনা হয়। যথোচিত উপায়দ্বারা বিক্ষেপের নিরাস করিয়া একতত্ত্বের অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে। পরে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার অনুশীলন করিয়া চিত্তের প্রসাদন করিতে হইবে। অতঃপর ক্রিয়াযোগদ্বারা চিত্তের পরিকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। সাধক যখন শাস্ত্রোক্ত প্রণালী ও প্রক্রিয়াদ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্তকে একাগ্রভূমিতে উপনীত করিতে পারেন, তখন ধারণায় তাঁহার চিত্তের যোগ্যতা হয়। ক্রমশঃ চিত্ত ক্ষীণবৃত্তি হইলে তাহার স্বচ্ছতা সাধিত হইয়া বস্তুর যথাযথ প্রতিকৃতি গ্রহণের সামর্থ্য উপজাত হয়—ইহাকে সমাপত্তি বলে। অতঃপর চিত্তের একাগ্রভূমির ঊর্দ্ধে নিরুদ্ধভূমিতে আরোহণ করিবার যোগ্যতা হয়। ক্রমশঃ অন্যান্য প্রক্রিয়াদ্বারা যোগীর জ্ঞান সমস্ত আবরণমল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অনন্ত ও অপরিণাম হয় এবং আকাশে খদ্যোতের ন্যায় তাঁহার পক্ষে জ্ঞেয় স্বল্পমাত্র থাকে। এইরূপে চিত্তের প্রয়োজন অবসিত হয় ও তাহার পরিণাম ক্রমে পরিসমাপ্ত হয় এবং চিত্ত স্বয়ং যে প্রকৃতির বিকার তাহাতে বিলীন হইয়া যায়। তখন পুরুষ চিত্তের সহিত অনাদিসিদ্ধ সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অমল, কেবল শুদ্ধবুদ্ধ অবস্থায় সপ্রতিষ্ঠ হয়। ইহাই কৈবল্য।

২। ভক্তিবাদ। লেখক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

ভক্তিবাদ সম্বন্ধে লেখক দার্শনিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দার্শনিকভাবে ভক্তিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে বাদ শব্দের অন্য কোন প্রকার অর্থ না করিয়া গৌতমসূত্রের বাদ-নিরূপণের রীতি প্রধানতম

অবলম্বনীয়। পরম-তত্ত্ব লাভের যে সকল উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ভক্তিকে যাঁহারা তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন তাঁহারাই ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাতা। এই শ্রেষ্ঠতমত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া তাঁহারা অন্যান্য প্রচলিত বাদ সমূহের নিরসন করিয়াছেন এবং ভক্তির উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। "অন্যাভিলষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" লেখক ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু নামক গ্রন্থ হইতে এই ভক্তির সংজ্ঞা দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই ভক্তি। সেই অনুশীলন কিরূপ তাহা বুঝাইতে তাহার তিনটি বিশেষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একটি অন্যাভিলষিতা শূন্য আর একটি জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত ও অপরটি অনুকূল। প্রতিকূলভাবেও শ্রীকৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ভক্তি থাকে না। আনুকূল্য শব্দের অর্থ রোচ-মানা প্রবৃত্তি। যেখানে এই প্রবৃত্তি নাই, সেখানে আনুকূল্য নাই। অতঃপর লেখক মহাশয় ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণের পূর্ব্ব পর্যন্ত গ্রন্থ হইতে ভক্তির তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

৩। শূন্যতা নাগার্জ্জুনের বজ্রচ্ছেদিকা।

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্।

এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয়, মাধ্যমিক দর্শনকার শূন্যবাদী নাগার্জ্জুনের দার্শনিক মত সংক্ষেপতঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লেখক বলেন, দার্শনিক ও শাস্ত্রকার-গণের পদার্থচিন্তা খণ্ডিত করিয়া নাগার্জ্জুন যে ধর্ম্মতা বা ধর্ম্মের স্বরূপ প্রতিভাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধদর্শনের মূল-তত্ত্ব এবং অভিসম্বোধির অধিগম্য বিষয়। নাগার্জ্জুন তাঁহার মাধ্যমিক কারিকায় ও অকুতোভয় টীকায় সর্ব্বত্র চিত্ত বা বিজ্ঞানবহির্ভূত ধর্ম্মকায়ার সহিত চিত্তে অধিগত ধর্ম্মতার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মকায়া ও নির্ম্মাণকায়ার মধ্যে তথা ধর্ম্মকায়া ও সম্ভোগকায়ার মধ্যে অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক মহাশয়, হীনযান, মহাযান, বুদ্ধোৎপাদধর্ম্মতা, ত্রিকায়বাদ, মাধ্যমিক যোগাচার, সর্ব্বাস্তিবাদ ও বৈভাষিকবাদ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, তাঁহার আলোচনা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৪। বৈষ্ণব দর্শন।

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এম এ, পিএচ্ ডি।

বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই মনে রাখা উচিত যে, বেদান্তদর্শনই বৈষ্ণব দর্শন। প্রত্যক্ষ অনুমান ও বিচার, বৈদান্তিকেরা

ইহার কোনটাকেই বাদ না দিলেও শ্রুতিকেই মূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং উপনিষদের ব্রহ্মই বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়, এই বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র আচার্য্য রামানুজ, আচার্য্য বল্লভ, শ্রীনিবাস আচার্য্য স্ব স্ব মত অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের স্বরূপভূত প্রজ্ঞাই সত্যসিদ্ধান্তে পৌঁছিবার শ্রেষ্ঠ পথ। শ্রুতি এই স্বরূপভূত প্রজ্ঞার সমষ্টি। আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতির অনাদিত্ব স্বীকার করেন—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানানন্তর ইহার উপযোগিতা স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অনাদিত্ব এবং অনন্তত্ব দুইই স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রুতি এক হইলেও শ্রুতিকে অপেক্ষা করিয়া দুইটি বিজ্ঞানের ধারা প্রচলিত হইয়াছে—একটি আচার্য্য শঙ্করের নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবাদ, আর একটি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সবিশেষ জ্ঞানবাদ। আলোচ্য প্রবন্ধে শঙ্কর মতের সহিত তুলনায় সবিশেষ জ্ঞানবাদ আলোচিত হইয়াছে। শঙ্করের জ্ঞান প্রকাশ মাত্র। ইহাকে প্রকাশক বলিলে ঠিক হইবে না। কারণ, প্রকাশক প্রকাশ-ধর্ম্মকে জ্ঞাপিত করে। প্রকাশ কখনও প্রকাশের বিষয় হয় না। যাহা প্রকাশের বিষয় তাহা প্রকাশ নয়। চিৎসুখাচার্য্য বলেন,—জ্ঞান, বিষয় মাত্রকেই প্রকাশ করিলেও নিজে কখনও বিষয় হয় না। জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব ঔপাধিক। আচার্য্য রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ, প্রভৃতি এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—অনুভূতি অনুভূত হইতে পারে। অনুভূত হইলে অনুভূতির অনুভূতিত্ব নষ্ট হয় না। শ্রীজীব গোস্বামী আবার সবিকল্প নির্ব্বিকল্পভেদে প্রজ্ঞার দ্বৈবিধ্য স্বীকার করেন। তাঁহার মতে সবিকল্পক বোধের পূর্ব্বভূমি হইতেছে নির্ব্বিকল্পক বোধ; কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণস্বরূপ সবিকল্পক ভূমিতেই প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে তিনি রামানুজের সহিত একমত। বেদান্তের মতে জ্ঞানই ব্রহ্ম। অতএব বিচারে আমরা পাইতেছি—শঙ্করের ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, এবং রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, জীব গোস্বামী প্রভৃতির ব্রহ্ম সবিশেষ জ্ঞান। এইরূপ সবিশেষ জ্ঞানকে বৈষ্ণবেরা ভগবৎসংজ্ঞা দিয়া থাকেন। প্রবন্ধলেখক মহাশয় এইরূপে বৈষ্ণব-দর্শনের মূল-তত্ত্বের অবতারণা করিয়া এতৎসম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিভিন্ন মত-বাদের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

৫। জৈন-কথা। লেখক—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য বি-এ।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক মহাশয় জৈন ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব এবং গৌরবময় ইতি-হাসের আভাস প্রদান করিয়া, জৈন দর্শন ও বিজ্ঞানের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। জৈন মতে জীব ও অজীব, এই দুইটী তত্ত্বের সমষ্টিজগৎ।

জীব—আত্মা; অজীব জীবাতিরিক্ত তত্ত্ব। এ অজীব পদার্থ লইয়া বিজ্ঞান অর্থাৎ জড়-বিজ্ঞান। অজীব-তত্ত্ব জীবাতিরিক্ত বটে, কিন্তু ইহা বেদান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি, ন্যায় বৈশেষিকের অণু পরমাণু বা বৌদ্ধের শূন্য নহে। জৈন মতে অজীব-তত্ত্ব পাঁচটি—পুদ্গল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ ও কাল। ইংরাজীতে Matter বলিলে যাহা বুঝায়, জৈন-দর্শনের পুদ্গল সাধারণতঃ সেই অর্থ জ্ঞাপন করে। জৈন-দর্শনে ধর্ম্ম পুণ্য কর্ম্ম নহে। যে অজীব-তত্ত্ব পুদ্গল ও জীবকে গতি বিষয়ে সাহায্য করে, কিন্তু চালিত করে না, তাহাই ধর্ম্ম। এইরূপ জীব ও পুদ্গলের স্থিতি বিষয়ে সহায়তাকারী অজীব-তত্ত্ব অধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। যে অজীব-তত্ত্বের মধ্যে জীবাদি পদার্থ প্রকাশ পায়, তাহার নাম আকাশ। পদার্থের পরিবর্ত্তন বিষয়ে যে অজীব-তত্ত্ব সহায়তা করে তাহাই কাল। কাল নিত্য, অমূল্য, অনাদি ও অনন্ত। এইরূপে অজীব-পদার্থের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া লেখক মহাশয় জীব-তত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এ বিষয়ে জীব, চেতনা, উপযোগ, দর্শন, জ্ঞান, মতি, অবগ্রহ, ইচ্ছা, প্রভৃতি জৈন দর্শনোক্ত জীবতত্ত্বান্তর্গত বিষয়গুলির পরিচয় প্রদান করিয়া মোক্ষ লাভ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবের কি কি অবস্থার মধ্য দিয়া গমন করিতে হয় এবং সেই সকল অবস্থা কি উপায়ে কোন্ প্রণালীতে লাভ করা যাইতে পারে, এবিষয়ে জৈন-দর্শনের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রবন্ধের শেষে জৈন ন্যায় বিষয়েও কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।

৬। গীতার উপাস্য দেবতা। লেখক—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বিদ্যারত্ন।

লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরাণ ও গীতা প্রভৃতিতে যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কেহ নহেন এবং সেইজন্য উপনিষৎকথিত পরব্রহ্মই গীতার উপাস্য দেবতা। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধ মধ্যে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলিরও আলোচনা করিয়াছেন,—ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও ভগবান্—ত্রিবিধ তত্ত্বের বর্ণনা। গীতা—শ্রীভগবানের উক্তি। এই ভগবান্ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপী। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ ইহাদের পার্থক্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ণবগণের পার্থক্য। মহাভারতের অনুগীতা-পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্তএবং বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুমূর্ত্তির ব্যাখ্যা।

৭। বঙ্গদেশে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা। লেখক—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম এ,।

এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় যুক্তি প্রমাণ সহকারে দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বাঙ্গালী মনীষিগণ গভীরভাবে দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়াছেন ও সময়ে সময়ে নব নব মত উদ্ভাবন করিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দামোদরপুর লিপি হইতে জানা যায় যে, এখানে দর্শন শাস্ত্রের বিশেষতঃ মীমাংসা দর্শনের আলোচনা হইত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে শীলভদ্রের প্রতিভা হইতে বাঙ্গালার দার্শনিক আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। পালরাজগণের সময়ে যেমন বৌদ্ধ দর্শন আলোচিত হইত, তেমনি হিন্দু দর্শনেরও আদর ছিল। কমৌলি লিপি এ বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য দিতেছে। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা তিব্বতে গিয়া ধর্ম্ম ও দর্শন শিক্ষা দিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে শ্রীজ্ঞানদীপঙ্কর বাঙ্গালার দার্শনিক আলোচনার শ্রেষ্ঠ ফল। বৌদ্ধগান ও দোঁহা এবং শূন্যপুরাণ হইতে বৌদ্ধ দর্শনের কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণের কথা পরে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কথাও তৎপরে আলোচিত হইয়াছে। লেখক দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী তখন সাংখ্য মীমাংসা ও যোগদর্শনও আলোচনা করিত। কোটালীপাড়ার পণ্ডিতগণের বিশেষতঃ বৈজয়ন্তী ও সরস্বতী দেবী নাম্নী দুই অপূর্ব্ব প্রতিভাশালিনী মহিলার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তৎপরে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন স্থানের কয়েকজন দার্শনিক পণ্ডিতের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

৮। ভারতীয় দর্শনের অব্যক্ত ইতিহাস। লেখক—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় উপনিষৎ হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের পরস্পর সম্বন্ধ এবং তাহাদের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লেখক বলেন যে, উপনিষৎগুলি কেবল ধর্ম্মতত্ত্ব নহে, উহা পূরাভাবের দর্শন বলিলেও দোষের হয় না। সার-তত্ত্বকেই যদি দর্শন বলা যায়, তবে ঋগ্বেদের স্তুতি-গাথার মধ্যেও সুস্পষ্ট দার্শনিক মত ও বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে দেখা যায় যে, বৈদিক মত কোন কোন সম্প্রদায় একেবারেই ত্যাগ করিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে পার্শ্বনাথ এবং খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে একদিকে তীর্থঙ্কর মহাবীর ও অপরদিকে বুদ্ধ আরও নূতন ভাব, ধর্ম্ম ও দর্শন চিন্তায় আনিয়াছিলেন। ইঁহারা কেহই

বেদের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিলেন না ; তবে ধ্যান, সন্ন্যাস ও কর্ম্মবাদ,—যাহা উপনিষদের মূল-তত্ত্ব, তাহা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। জৈন ধর্ম্মে আত্মা ও পরমাত্মা রহিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাও রাখিলেন না। এইরূপে সেই সুপ্রাচীন যুগে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সুনিপুণ দার্শনিক মত লোকসমাজের দর্শননিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করে। এই সময়ে বেদপন্থীদের মত-সমর্থক দর্শনেরও আবশ্যক হইয়াছিল। কপিলের সাংখ্য কোন্ সময়ের, তাহার প্রমাণ নাই। এই মত হিন্দুর উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহার পর পূর্ব্ব ও উত্তর-মীমাংসা, যোগদর্শন, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের বিষয় প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য ও সময় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লেখক প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

৯। মায়া। লেখক—শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি এ।

মায়াবাদ বৈদান্তিক মত। আচার্য্য শঙ্কর ইহার প্রধান ব্যাখ্যাতা। তিনি ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে ব্রহ্ম জগতের পরিণামী কারণ নহেন। মৃত্তিকা ঘটে পরিণত হয়, ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, মৃত্তিকারই অবস্থাবিশেষ ঘট ; ব্রহ্ম জগতের সেরূপ কারণ নহেন। জগৎ তাঁহার বিবর্ত্ত, তিনি জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি যদি জগদ্রূপে পরিণত হইতেন, তবে তাঁহাকে জগতের পরিণামী কারণ বলা যাইত। কিন্তু তিনি জগদ্রূপে প্রতিভাত হন, বাস্তবিক জগদ্রূপে পরিণত হন না। জগৎ একটা বিরাট্ ইন্দ্রজাল, মায়া ; ইহার বাস্তব সত্তা নাই, কেবল ইহা প্রতিভাত হয় মাত্র। কিন্তু এই ইন্দ্রজাল কাহার নিকট প্রতিভাত হয় ? ব্রহ্ম ভিন্ন যখন জগতে আর কাহারও সত্তা নাই, তখন জীবাত্মা ও জড়শক্তি সমন্বিত জগৎরূপ ইন্দ্রজাল যদি কাহারও নিকট প্রকটিত হইয়া থাকে ত ব্রহ্মের নিকটই প্রকটিত হইয়াছে বলিতে হইবে। জীবাত্মা এই ইন্দ্রজালেরই একটা অংশ। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় জগদিন্দ্রজালের অংশস্বরূপ জীবাত্মাও আবার সেই ইন্দ্রজাল দর্শন করিতেছে, জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছে। জগৎ যেমন ইন্দ্রজাল, জীবাত্মাও তেমনি ইন্দ্রজাল ; তাহার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বুদ্ধি, জগদনুভূতি, সমস্তই ইন্দ্রজালের মত মিথ্যা। কিন্তু ইন্দ্রজাল মিথ্যা হইলেও ঐন্দ্রজালিক ও ইন্দ্রজালের দ্রষ্টা যেমন মিথ্যা নহে, তদ্রূপ যিনি এই জগদিন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছেন ও দর্শন করিতেছেন, তিনি মিথ্যা নন, লেখক এইরূপে মায়াবাদের অবতারণা করিয়া আলোচ্য প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

১০। কর্ম্মবাদ ও একেশ্বরবাদ। লেখক—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম্ এ।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞ ও বহু দেবতার উপাসনা-প্রণালী দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের নিকট একেশ্বরবাদ সুপরিজ্ঞাত ছিল না। সূর্য্য, পর্জ্জন্য, উষা প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়কেই তাঁহারা দেবতা জ্ঞান করিতেন। ক্রমশঃ মানব-সমাজের সভ্যতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একেশ্বরবাদ প্রভৃতি কতকগুলি উচ্চ সিদ্ধান্তে মানবগণ উপনীত হইয়াছে। সুতরাং যাগযজ্ঞ-জড়িত উপাসনা ও একেশ্বরবাদ পরস্পর বিরুদ্ধ। একের সত্তায় অপরের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক মহাশয় বেদের সংহিতা ও উপনিষৎ হইতে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই একেশ্বরবাদের সহিত কর্ম্মবাদের সামঞ্জস্য সম্ভবপর হইয়াছে এবং সেই স্মরণাতীত সুদূর অতীত যুগেও ঋষিগণ বিভিন্ন দেবতার মধ্য দিয়া একমাত্র পরমেশ্বরের সত্তা দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

১১। পুরুষতত্ত্ব। লেখক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ গুপ্ত।

চরক-সংহিতায় ত্রিবিধ পুরুষ অঙ্গীকৃত হইয়াছে,—একধাতুক, ষড়্‌ধাতুক ও চতুর্ব্বিংশতি ধাতুক। তন্মধ্যে একধাতুক পুরুষ পরমাত্মা, ষড়্‌ধাতুক পুরুষ সূক্ষ্ম এবং চতুর্ব্বিংশতি ধাতুক পুরুষকে স্থূল পুরুষ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক মহাশয় এই ত্রিবিধ পুরুষের সহিত বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত পুরুষত্রয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, পুরুষতত্ত্ব কি, সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে পুরুষ ত্রিবিধ—"একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥" লেখকের মতে চরক-সংহিতোক্ত পুরুষত্রয়ের সহিত বিষ্ণুপুরাণের এই পুরুষত্রয় অভিন্ন এবং এই পুরুষত্রয়ই বৈষ্ণবশাস্ত্রে কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

১২। সংক্ষিপ্ত দর্শন সমালোচনা। লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কতীর্থ।

ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৈশেষিক, এই ছয়খানি প্রধান দর্শন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক মহাশয় উক্ত ষড়্‌দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়, পরস্পর মতবিভিন্নতা ও সামঞ্জস্য, জগদুৎপত্তির কারণ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছেন।

১৩। স্মৃতি ও ন্যায়মতে ধর্ম্মের রহস্য। লেখক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় ধর্ম্মের লক্ষণ, তাহার উপকারিতা, ধর্ম্মসাধন, ইষ্ট ও মুক্তি লাভের উপায়, মুক্তির ব্যাখ্যা, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, ন্যায়মতে মুক্তির স্বরূপ, সামান্য ও বিশেষ ভেদে ধর্ম্মের বিভাগ, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ প্রভৃতির ব্যাখ্যা, চতুর্ব্বর্ণের বিশেষ ধর্ম্মের বিবরণ, দৈব ও পৈত্র কর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা এবং ন্যায়দর্শনমতে ধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

১৪। জন্মান্তর-বাদ। লেখক—শ্রীযুক্ত মণীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল।

জন্মান্তর-বাদ অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। মানুষের জীবন, আহার, বিহার যেমন প্রত্যক্ষ সত্য, জন্মান্তর-বাদও সেইরূপ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। কেবল এক শ্রেণীর দার্শনিক জন্মান্তর স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা চার্ব্বাক নামে অভিহিত। যাহা হউক, আস্তিক হিন্দু দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্যে জন্মান্তর-বাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক মহাশয়, সেই ত্রিবিধ প্রমাণের অবতারণা করিয়া জন্মান্তর-বাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত ত্রিবিধ প্রমাণ এই,—(১) প্রত্যক্ষ—অনেক লোককে জাতিস্মর অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বলিতে দেখা যায়। (২) অনুমান—পতঞ্জলি, কণাদ, গৌতম, ব্যাস, প্রভৃতি দার্শনিক এবং বৌদ্ধ, জৈন ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের যুক্তিতর্কমূলক অনুকূল সিদ্ধান্ত। (৩) শব্দ— শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণ শব্দপ্রমাণ নামে অভিহিত।

১৫। দর্শনকথা। লেখক—শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রথমে ভারতবর্ষ ও ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া, দর্শন শব্দের অর্থ, বিভিন্ন দর্শনের নাম ও তাহাদের মতভেদের উল্লেখপূর্ব্বক মোক্ষলাভই যে সমস্ত দর্শনের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য, তাহা বিবৃত করিয়াছেন এবং পরিশেষে নব্য-ন্যায়ের একটি বিচার-প্রণালী প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

(গ) ইতিহাস-শাখা

১। খানাকুলকৃষ্ণনগর সমাজ। লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

মূল সভাপতি মহোদয় স্থানীয় যে ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা অধিক কোন সংবাদ এই প্রবন্ধে নাই। লেখকের মতে ১৩১৫ শকাব্দে খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবন্ধের শেষে যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী ও বিশ্বম্ভর পাইন মহাশয়ের রচিত তিনটী সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে।

২। আর্য্যজাতির পুরাবৃত্ত। লেখক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি।

এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে আগমন, অধিকার বিস্তার, আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে সংঘর্ষ, আর্য্যদিগের ধর্ম্মনীতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান-কৌশল, ধনুর্ব্বেদ, সমাজনীতি, রাজনীতি, প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন।

৩। হিন্দুর প্রাচীনত্ব। লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় হিন্দু শব্দটী কত দিনের প্রাচীন তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাণিনি, বার্ত্তিক, মহাভাষ্য, এমন কি পঞ্চম শতাব্দীর অমর-কোষ বা দ্বাদশ শতকের হেমচন্দ্রেও হিন্দু শব্দটী পাওয়া যায় না। তিনি বলেন "নদীবাচক সিন্ধু শব্দই—আর্য্য বংশধর হিন্দু-গণের বীজী পুরুষ"।

৪। হিন্দুর রাজনীতি-শাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান। লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল্, পিএচ, ডি।

এই প্রবন্ধে প্রথমে মণ্ডল কল্পনার উদ্দেশ্য ও গুরুত্বের কথা নির্দ্দেশ করিয়া উহার স্বরূপ বর্ণনাকালে "মধ্যম" ও "উদাসীন" সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর সংক্ষেপে সন্ধি-বিগ্রহাদি ষড়্‌গুণের পরিচয় দিয়া মণ্ডল সম্বন্ধে কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার নিরাস করা হইয়াছে। প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, মণ্ডলের কল্পনা হইতে সিদ্ধান্ত করা

করা যায় না যে, 'অর্থশাস্ত্র' রচনার সময়ে ভারতবর্ষ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং কৌটিল্যের উক্তি হইতে প্রমাণ হয় না যে, প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাজ্যগুলি সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত।

৫। প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদ।

লেখক—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ।

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যগুলিতে অধীন জনপদসমূহকে এক ভাবে ও এক ছাঁচে ঢালিয়া, তাহাদের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। আর প্রাচীন ভারতে অধীন জনপদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইত। তথায় জাতীয়তার সহিত সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু ইহার ফলে সাম্রাজ্যগুলি ভারতে সুদৃঢ় হইতে পারে নাই।

৬। জৈন মূর্ত্তিতত্ত্ব। লেখক—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ, বি এল।

এই প্রবন্ধে জৈন দেবদেবীগণের মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। জৈন-গণ তাঁহাদের উপাস্য দেব দেবী ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা করেন। দেবগণের মধ্যে আবার নানাবিধ বিভাগ আছে। ঊর্দ্ধলোক, অধো-লোক ও তির্য্যক্‌লোক-ভেদে এই সকল দেবগণ ১৯৮ প্রকার বিভাগে বিভক্ত। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রথমেই এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। পরে মূর্ত্তি প্রস্তুতের উপাদান, মূর্ত্তির স্থাপন-প্রণালী, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়-ভেদে মূর্ত্তির আভরণ-পার্থক্য, দেশভেদে মূর্ত্তি ও তাহার অর্চ্চনা প্রণালীর পার্থক্য, সম্প্রদায়-ভেদে মূর্ত্তি-স্থাপনের পার্থক্য, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়া "প্রবচনসারোদ্ধার" নামক গ্রন্থ হইতে তীর্থঙ্করগণের শাসন-যক্ষযক্ষিনীর বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বিবরণে চতুর্ব্বিংশতি যক্ষ ও চতুর্ব্বিংশতি যক্ষিনীর নাম, আকার, প্রকার, বর্ণ, বাহন, আয়ুধ প্রভৃতির বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

৭। মূর্ত্তিতত্ত্বে অগ্নি। লেখক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

এই প্রবন্ধে অগ্নির যে কয়েকটী মূর্ত্তি ভারতবর্ষে আছে, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লেখক মহাশয় অগ্নির স্ত্রী ও বাহক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। "বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর," "বিশ্বকর্ম্ম-শিল্প", "প্রপঞ্চসার', "অগ্নি-পুরাণ" "তন্ত্র-সমুচ্চয়" প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ হইতে লেখক মহাশয় অগ্নিমূর্ত্তির বিবিধ পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এতৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ

যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহারও যথাযথ আলোচনা করিয়া ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

৮। বঙ্গে শিল্প-বিকাশ। লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ।

হিন্দুর শিল্প ধর্ম্মমূলক। পালযুগে কিরূপে বঙ্গদেশ শিল্পবিস্তার ভারতবর্ষের গুরুস্থানীয় হইয়াছিল তাহা লেখক মহাশয় সম্যক্‌রূপে দেখাইয়াছেন। সেনযুগে যতগুলি মূর্ত্তি ও মন্দির পাওয়া গিয়াছে তাহারও একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠানদিগের আমলে হিন্দু-শিল্পীদের দ্বারা যে সকল মস্‌জিদ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারও আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হইয়াছে।

৯। সিপাহীবিদ্রোহে কলিকাতা। লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কলিকাতায় যে ঘটনাসমূহ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

১০। মহাবীর ও বুদ্ধের কালনির্ণয়। লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, পিএচ ডি।

লেখক মহাশয় বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছেন যে, মহাবীরের নির্ব্বাণ ৪৯৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ও বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ ৪৮৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হইয়াছিল।

১১। বঙ্গে রাজপুত। শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ।

স্থানীয় ও বংশগত প্রবাদাদির উপর নির্ভর করিয়া লেখক মহাশয় বালিগড়ি সমাজের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। বাঙ্গালী রাজপুতদিগের কয়েকটী আচার ব্যবহারও প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে।

১২। হরকোয়াদের গোষ্ঠীপ্রথা। লেখক—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ।

এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় আদিম আমেরিকাবাসিগণের মধ্যে একটী শাখা জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক আচার-ব্যবহার ও প্রথা বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রগঠনের পূর্ব্বযুগের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। হরকোয়ারা গোষ্ঠীর মত না লইয়া কোন কার্য্যই করে না। প্রবন্ধটী একজন জর্ম্মান পণ্ডিতের নবপ্রকাশিত গ্রন্থের এক অধ্যায়ের অনুবাদ।

১৩। নাথ যোগি-সমাজ, ধর্ম্ম ও আখ্যার উৎপত্তি। লেখক—ডাঃ শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, পিএচ, ডি।

নাথ-যোগি সমাজের আধুনিক অবস্থার বর্ণনা প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, "অঙ্গুত্তর নিকায়ে" বুদ্ধকথিত নাথকরণ ধর্ম্ম হইতে নাথশব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। পরে বৈশালীর নাথবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বর্ণিত হইয়াছে। নাথযোগীদের শব-সৎকার প্রথা প্রভৃতি হইতে লেখক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, নাথগণ অদ্যাপি হিন্দু-সমাজে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছেন।

১৪। ইউরোপযাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালী। লেখক—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত "শিগারফ নামা বিলায়ৎ" গ্রন্থ-রচয়িতা ইতিসামউদ্দিন সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালীদের মধ্যে ইউরোপ গমন করেন। রাজা রামমোহন উক্ত সম্মানের অধিকারী নহেন। ইতিসামউদ্দীন ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত পাচনর পরগণার কশরা গ্রামে তাঁহার নিবাস।

১৫। চণ্ডীদাস। লেখক—মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমা-নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

স্থানীয় প্রবাদ হইতে চণ্ডীদাসের জীবনী আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক মহাশয় বলেন যে, চণ্ডীদাস প্রথম জীবনে একাধিক নেশায় অভ্যস্ত ছিলেন। চণ্ডীদাস যে সহজিয়া ছিলেন তাহা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কীর্ণাহারেই চণ্ডীদাসের সমাধি-স্থান আছে, এই মত লেখক মহাশয় পোষণ করিয়াছেন।

১৬। বামড়া রাজ্যের রাজা রাজীব-লোচন রায় ও তদ্বংশীয়গণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। লেখক—শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সাহানা বি এল।

প্রবাদমূলক ইতিহাস।

১৭। দিল্লীর শেষ বাদশাহ ও তৎ-সাময়িক দিল্লী। লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী।

প্রবাদমূলক বিস্তৃত কাহিনী

১৮। বাঙ্গালার ইতিহাসের কয়েকটী সমস্যা। লেখক—শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী এম এ।

লেখক মহাশয় প্রথম মুসলমান আক্রমণযুগের কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ ঘটনার উপর সন্দেহের আলোকপাত করিয়া নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রবন্ধের শেষে একখানি ভূচিত্র অঙ্কন করিয়া লেখক মহাশয় তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন।

১৯। গড়বেতার ইতিহাস। লেখক—শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী।

প্রবাদমূলক ইতিহাস

২০। গৌড়ে ব্রাহ্মণ্যশক্তি। লেখক—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

লেখক মহাশয় বলেন যে, বৌদ্ধযুগ হইতে গৌড়ে ব্রাহ্মণ্যশক্তির অভ্যুদয় হয়। গুপ্ত ও পালসম্রাট্‌গণের সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যশক্তি বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন ছিল, শিলালিপি প্রভৃতি হইতে লেখক মহাশয় ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

১। পরমাণু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ স্নেহময় দত্ত ডি এস্‌সি (লণ্ডন), ডি আই সি,পি আর এস।

বস্তুতত্ত্বের প্রথম জ্ঞানে মুনি-ঋষিগণের নিকট 'পঞ্চভূতের'—অর্থাৎ পাঁচটি মৌলিকপদার্থের কথা শুনা গিয়াছিল। তাহার পর আঠারশ শতাব্দী কাটিয়া গেলে অর্থাৎ বিজ্ঞান যখন যন্ত্রে ধরা দিল তখন পাঁচটির বদলে গ্রীক্ পণ্ডিতগণের নির্ণীত অসংখ্য মৌলিক পদার্থ ক্রমে নব্বইটি মৌলিক পদার্থে সীমাবদ্ধ হইল। এই পদার্থগুলির যোগাযোগেই যাবতীয় বস্তুর বিকাশ হয়। তার পর এই মৌলিক পদার্থগুলিকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করিবার ফলে দেখা গেল যে, এমন অবস্থায় ঐ সকল পদার্থ পৌছিল, যখন আর তাহাদের ভাগ করা যায় না। এই অভাজনীয় ক্ষুদ্রতম অংশকে গ্রীক্ ভাষায় atom এটম্ বা পরমাণু বলে। এই পর-

মাণুতে মৌলিক পদার্থের যাবতীয় গুণই বিদ্যমান থাকে। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে প্রাউট্ বলিয়াছিলেন যে, এই পরমাণুগুলি অখণ্ডনীয় নহে। তাঁহার মতে হাইড্রোজেনের পরমাণুই অবিভাজ্য। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করিলেন যে, কি ভাবে পরমাণুর দ্বারা গঠিত পৃথিবীকে ইলেকট্রন-গঠিত পৃথিবীতে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ দুইটি মৌলিক জিনিষ—সংযোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক তড়িৎ (Positive and Negative charges) দিয়া এই পৃথিবী যে গঠিত, তাহা প্রমাণ করা যায়। বিয়োগাত্মক তড়িৎ যে-ভাবেই সৃষ্ট হউক না কেন, উহার ক্ষুদ্রতম অংশকে, যাহাকে electron বলা যায়—তাহা এক রকম গুণবিশিষ্ট, কিন্তু সংযোগাত্মক তড়িতের ক্ষুদ্রতম অংশকে, যাহাকে প্রাউটের নামানুসারে 'প্রোটন' বলা হয়, তাহা এখনও ভাগ করা যায় নাই। যে ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায়, তাহা মৌলিক পদার্থের সহিত জড়িত দেখা যায়। টম্‌সন্ বলিয়াছেন যে, বিয়োগাত্মক তড়িৎকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সংযোগাত্মক তড়িৎ অনেকটা বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে এবং উহাদের এই প্রকার যোগেই মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু রাদারফোর্ড (Rutherford) বলেন যে, সংযোগাত্মক তড়িৎই পরমাণুর কেন্দ্রে রহিয়াছে—বিয়োগাত্মক তড়িৎ তাহার চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে। এই মতই বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সমপ্রকৃতির অর্থাৎ সংযোগাত্মক তড়িতের স্থান পরমাণুর মধ্যে, বাহিরে নয়। কেন্দ্রস্থিত তড়িতের পরিমিতি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এক ইঞ্চ স্থান উহার বিস্তারের তুলনায় পঞ্চকোটী গুণ অধিক। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি বিভিন্ন প্রোটন দ্বারা গঠিত হওয়ায় তাহাদের ওজনও ভিন্ন ভিন্ন। পরমাণুর কেন্দ্র যে electron রহিয়াছে, তাহা যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে। যে B-রশ্মি উদ্ভাবনের কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা কেন্দ্রস্থিত electronএর বহির্গমন ব্যতীত আর কিছুই নয়। পরমাণুর ভিতরে ও বাহিরে উভয় স্থলেই ইলেক্‌ট্রন আছে, কিন্তু এক অবস্থায় নহে। বাহিরের ইলেক্‌ট্রনগুলি, যাহারা মণ্ডলাকারে কেন্দ্রস্থিত প্রোটন সমষ্টিকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহারা, অপেক্ষাকৃত আল্‌গাভাবে অবস্থিত। তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ ২।৪টী, উত্তাপ, তাড়িত ও রসায়ন-সংযুক্ত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে—হয় খসিয়া পড়ে, কিংবা আসিয়া জোটে। এইরূপ বিয়োগাত্মক তড়িতের সমবেত শক্তি কমিয়া যাইলে কিংবা বাড়িয়া পড়িলে পরমাণুগুলি নির্লিপ্তভাবে না থাকিয়া তাহারা তখন ভিন্ন প্রকৃতির শক্তিসম্পন্ন হওয়ায়

পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া যাইয়া পরমাণুসমষ্টি বা molecule গঠন করে। কেন্দ্রস্থিত ইলেক্‌ট্রনগুলি খুব দৃঢ়ভাবে অবস্থিত। সহজে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু কয়েকটী পদার্থসম্বন্ধে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক নিয়মে তাহারা আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আর বাহির হইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ সৃষ্ট হয়।

২। বহুমূত্র রোগ। লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ জ্যোতিঃ-প্রকাশ বসু এম বি, এফ সি এস।

ডায়াবিটিস্ মেলাইটাস্ রোগ বলিতে আজকাল সেই রোগ বোঝায়, যাহাতে রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা বেশী থাকে, অথচ মূত্রে শর্করা বাহির হইতে বা নাও হইতে পারে। বাঙ্গালীর সুস্থ অবস্থায় রক্তে ও প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ প্রায় একই মাত্রায় অর্থাৎ শতকরা ০·০৮ হইতে ০·১৫ ভাগ থাকে। ডায়াবিটিস্ অতি প্রাচীন রোগ। আয়ুর্ব্বেদে ইহার উল্লেখ আছে। ১৬৭৯ খৃঃ টমাস্ উইলিস্ সাহেব মূত্র আস্বাদন করিয়া উহার মিষ্টস্বাদ দ্বারা আবিষ্কার করেন যে, মনুষ্যের প্রস্রাবে শর্করা নির্গত হয়। পৃথিবীর মধ্যে ইহুদী জাতির মধ্যে বহুমূত্র রোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শর্করাজাতীয় জিনিষ খাইলেই যে এই রোগ হয়, তাহার কোন অর্থ নাই। ইহা একটি এই রোগোৎ-পত্তির গৌণ কারণ, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমে অবহেলা, মানসিক উদ্বেগ, অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনা না থাকিলে অনেক সময় এই রোগ হয় না। শিশু ও বালক অপেক্ষা মধ্যবয়স্ক লোকেরই এবং স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরই এই রোগ বেশী হয়। অনেকে বলেন, এই রোগ বংশগত। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, টাইফয়েড্ জ্বর, সেপ্টিসিমিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগ হইবার পর বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়। যকৃতের বিকৃতি ঘটাইতে পারে, এমন কোনও রোগ হইলে তাহা হইতে ডায়াবিটিস্ হইতে পারে। সম্প্রতি রেণশ (Rainshaw) ও ফেয়ারব্রাদার (Fairbrother) ডায়াবিটিস্ রোগীর মল হইতে একপ্রকার বীজাণু (Bacillus Amyloclasticus Intestinates) আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই বীজাণুই এই রোগের উৎপত্তির কারণ। কিন্তু এই বিষয় এখনও গবেষণাসাপেক্ষ। ডায়াবিটিস্ দুই প্রকার। তরুণ বা একিউট ডায়াবিটিস্ অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যে দেখা যায়, এবং শীঘ্র শীঘ্র রোগ বাড়িয়া রোগীর মৃত্যু ঘটায়। এ দেশে এ রোগ বেশী দেখা যায় না। পুরাতন বা ক্রনিক ডায়াবিটিস্ হইলে রোগীর ওজন ক্রমশঃ কমিয়া যায়, প্রস্রার বারে ও মাত্রায় বেশী হয় ও তৃষ্ণাও বেশী হয়। জ্বর হইলে অন্য কোন

উপসর্গ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিতে হইবে। প্রধান উপসর্গ সংজ্ঞালোপ (coma)। এতদ্ব্যতীত একজিমা (Exema), প্রুরাইটিশ (Pruritis) প্রভৃতি ,এবং কিছুদিন পরে প্রস্রাবের সহিত এল্‌বুমেন্ নির্গত হইতে দেখা যায়। কেবল প্রস্রাবে চিনি দেখা গেলেই উহাকে ডায়াবিটিস্ বলা সঙ্গত নয়। যদি রক্তে শর্করার ভাগ স্থায়িভাবে স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা বেশী থাকে, তাহা হইলে রোগীর ডায়াবিটিস্ হইয়াছে বলা সঙ্গত। এই পীড়ার গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করা হয় গ্লুকোজ টলারেন্স টেষ্ট (Glucose Tolrance Test)। আফিং ঘটিত ঔষধবিশেষে প্রস্রাবে চিনির মাত্রা কমাইবার ক্ষমতা কিছু কিছু আছে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। অহিফেন ও কেডিন ব্যতীত এই ঔষধগুলিতেও উক্ত ফল পাওয়া যাইতে পারে—স্যালিসিলেটাস্, পটাস্ ব্রোমাইড্, ইউরেনিয়াম্, নাইট্রেট্, বেলেডোনা, শ্যন্টোনিন্, আর্সেনিক, টিংচার জাম্বুল্ প্রভৃতি। আমেরিকার ডাক্তার এলেন্ (Allen) সাহেব কেবল মাত্র পথ্যের ব্যবস্থার দ্বারা এই পীড়ার চিকিৎসায় যুগান্তর আনিয়াছেন। তাঁহার মতে রোগীকে উপবাস করাইলে প্রস্রাবে ও রক্তে চিনির পরিমাণ কমিয়া যায়। ঐ ভাবে শর্করা কমিলে রোগীকে ক্রমশঃ এমন শাকসব্জি পরিমাণমত খাইতে দেওয়া উচিত যাহাতে শর্করা থাকে। ইংলণ্ডের জর্জ গ্রেহামের চিকিৎসাও প্রায় এইরূপ। তাঁহার মতে রোগীকে অধিকদিন উপবাস করিতে হয় না ও প্রথম হইতে শাকসব্জি জাতীয় ও ছানা জাতীয় খাদ্য (Proteins) দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইন্‌সুলিন্ Insulin নামক ঔষধ-প্রয়োগে এই রোগের চিকিৎসায় নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাণিগণের শরীরের অভ্যন্তরস্থ ক্লোম বা প্যানক্রিয়াস্ নামক যন্ত্র হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। রোগীর শরীরে ইন্‌সুলিন ইন্‌জেক্‌শনের প্রভাব আশ্চর্য্যজনক। বহুমূত্রের সহিত কার্ব্বঙ্কল (Carbuncle), সেলুলাইটিস্ (Cellulitis) প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে ইন্‌সুলিন প্রয়োগ দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধে মাত্রার উপর চিকিৎসার ফলাফল নির্ভর করে। [মূল প্রবন্ধ ১৩৩১ অগ্রহায়ণ মাসের 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হইয়াছে।]

৩। প্রাচীন ভারতে তাড়িত বার্ত্তা।

লেখক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

তাড়িত-প্রবাহ সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মনুষ্যজাতির জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের বিজ্ঞান কতকাল পূর্ব্বে লোপ হইয়াছে তাহা বলা

যায় না। তবে শুক্রনীতি-সার গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে—"অযুতক্রোশজাং বার্ত্তাং হরেদেক দিনেন বৈ" অর্থাৎ একদিনে দশ হাজার ক্রোশ দূরের সংবাদ গ্রহণের ব্যবস্থা করিবার কথা বলা হইয়াছে। লোক দ্বারা বা ডাক বসাইয়া এত দূরের সংবাদ গ্রহণ করা যায় না। এই জন্য লেখক অনুমান করেন যে, সেকালে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দূর দেশের সংবাদ গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। হয়ত তখন টেলিগ্রাম বা তারবিহীন তাড়িত ব্যবহার ছিল। প্রাচীন অন্য কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইলে হয়ত তাহাতে তারবিহীন যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতে পারে। ১৯২৪।৯ এপ্রেল্ তারিখের 'দি সার্ভেণ্ট' নামক দৈনিক পত্রিকায় "সায়ান্টিফিক্ আমেরিকান" নামক পত্র হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, হায়দ্রাবাদ নগরে পাথরগটির প্যাস্চার হলের মালিক জায়গীরদার ডাঃ সইদ মহম্মদ কাসিম সাহেবের একটি প্রাচীন পুস্তকালয় আছে, তাহাতে রক্ষিত বহু মূল্যবান্ গ্রন্থের মধ্যে একখানিতে Wireless Telegraphy'র কথা লেখা আছে! দুইখানি প্রস্তরের যন্ত্র তৈয়ারী করিয়া তাহার দ্বারা হাজার হাজার মাইলের সংবাদ আদান-প্রদানের কথা এই পুস্তকে রহিয়াছে। এই পুস্তকের আলোচনা কর্ত্তব্য।

৪। ম্যালেরিয়া নিবারণার্থে মৎস্যের চাষ। লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্‌সি, এফ জেড এস্, এফ আর এম এস।

ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ম্যালেরিয়া-বাহক মশক বিনাশ করা এক প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া মশক পতঙ্গাবস্থা অপেক্ষা কীটাবস্থায় নষ্ট করা অধিকতর সুগম। এই মশক-কীট আগাছাপূর্ণ পুষ্করিণী, ডোবা প্রভৃতির স্থির জলে এবং মৃদুবাহিনী নদীর কিনারার জলে বাস করে। মশক জলে ডিম পাড়িয়া যায়। ঐ ডিম ফুটিয়া মশক-কীট বাহির হয়। এই কীট জলে বাস করিলেও জলের ভিতর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে না। জলের উপরিভাগে আসিয়া বায়ু হইতে অম্লজান বায়ু গ্রহণ করে। জলের উপর কেরোসিন তৈল ঢালিয়া ঐ কীট নষ্ট করা হয়। আর একটি উপায়ে মশক-কীট নষ্ট করা যায়। অনেক মাছ আছে যাহারা মশক-কীট পাইলে অন্য কিছু খায় না। এই সকল মাছ ডোবা পুষ্করিণীতে বহুলপরিমাণে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ও মিঃ আর বি সাইমুর সিবেল সাহেব ভারতীয় মশক-কীট নাশক মৎস্য সকলের আলোচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে

যে সকল মাছ বঙ্গদেশের মশকখাদক তাহাদেরই নাম নিম্নে লিখিত হইল—(ক) তেচোকো বা পানচোক মাছ বা কালপোনা, (খ) চাই চুণো, (৩) দাঁড়িকা বা ডাড়িকা, (৪) ভেদো, (৫) খলিসা। এতদ্ব্যতীত ছোট চাঁদা, কয়েক শ্রেণীর পুঁটিমাছ, কইমাছও অল্পবিস্তর মশক-কীট খাইয়া থাকে। মাছ ধরিবার সময় এই সকল ছোট মাছ বাদ দিয়া বড় মাছ ধরা উচিত।

৫। শিশু-মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা। লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম এ, এম ডি।

ডাঃ বেণ্টলে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রত্যহ কতগুলি শিশুর মৃত্যু হয় তাহার যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া লেখক বলেন যে, নিম্নলিখিত কারণগুলিই শিশু-মৃত্যুর জন্য দায়ী—(ক) বংশগত দুর্ব্বলতা, (খ) দেহের সম্পূর্ণ বিকাশ হইবার পূর্ব্বে এবং সংসার পালনোপযোগী উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে বিবাহ, (গ) মাতাপিতার খাদ্যাভাব ও অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস, পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া ও উদরাময় রোগের আক্রমণ, (ঘ) সহরের জনতা ও দূষিত বায়ু এবং মহামারী প্রভৃতি কারণে সন্তানের স্বাস্থ্যহানি, (ঙ) বিশুদ্ধ গোদুগ্ধের অভাব, (চ) গর্ভাবস্থায় জননীর অসাবধানতা, ও ডাক্তারের সাহায্য লওয়ার অক্ষমতা, প্রসবকালীন উপযুক্ত যত্নের অভাব—অশিক্ষিত দাইয়ের পরিচর্য্যা, (জ) মাতার সূতিকাগৃহে বাস, (ঝ) মাতার মৃত্যু হেতু সন্তানের মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত হওয়া, (ঞ) প্রমেহ, উপদংশ প্রভৃতি রোগের বিস্তার হেতু গর্ভপাত অথবা অপূর্ণাবস্থায় দুর্ব্বল সন্তান প্রসব। পূর্ব্বে এদেশে বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকগণ শিশু-পরিচর্য্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। এক্ষণে নবীনারা যাহাতে তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করেন তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত জাতীয় সাহিত্যে শিশুর পালন সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা হয় না।

৬। বলবর্দ্ধিত-জমাটের কার্য্য। লেখক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

বলবর্দ্ধিত-জমাটের কাজ (Re-inforced Concerete Work) এদেশে অধুনা বহুল পরিমাণে চলিতেছে। গৃহ-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত যাবতীয় দ্রব্যের মধ্যে এই নব আবিষ্কৃত বলবর্দ্ধিত-জমাটের কাজের উপকারিতা ও স্থায়িত্ব বেশী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং ইহাতে ব্যয়-বাহুল্যও হয় না। ছাদ, মেজে, থাম বা খুঁটি, বেড়া প্রভৃতি এই উপদানে প্রস্তুত হইতেছে। বেশী শীতপ্রধান দেশে

বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহার কাজ করিলে ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইহার প্রধান উপকরণ সিমেণ্ট মাটী, বালি, পাথর কুচি বা ঝামা কুচি। এক ভাগ সিমেণ্ট, ২ ভাগ বালি ও ৪ ভাগ পাথর কুচি বা ঝামা কুচি দিয়া এই উপাদান প্রস্তুত হয়—কখন কখনও এই ভাগেরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। এই কাজের জন্য লোহার বা কাঠের ফ্রেম বা মাচা করিতে হয়।

৭। উদ্ভিদের আত্মকাহিনী। লেখক—শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী।

জীব সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষের মিলনে জীবসৃষ্টির যে গুপ্ত-রহস্য আছে গর্ভকেশরে পুংকেশরের পরাগরেণু পতনেও সেইরূপ উদ্ভিদ্ সৃষ্টি-রহস্য বর্ত্তমান। নায়ক নায়িকার ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া যেমন অভিসারক বেশে গমন করে, তদ্রূপ পাটাঝাও নামক একজাতীয় জলজ উদ্ভিদের পতন-সময় উপস্থিত হইলে, পুংপুষ্প ও স্ত্রী পুষ্প উভয়েই জলতল হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, বায়ু বিতাড়িত জল-হিল্লোলের প্রভাবে উভয়েরই পরাগ পতন শেষ হইলে, পুষ্প দুইটি পুনরায় স্বস্থানে গমন করে। মানবের ন্যায় উদ্ভিদের জল বায়ু ও আলোকের আবশ্যক। কৃষ্ণচূড়া, আমলকী, জবার সপুষ্প প্রশাখা রাত্রে দেখিলে বৃক্ষের "নিদ্রার" বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। চিত্তাকর্ষণের জন্য যেরূপ স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য, পরাগ গ্রহণের জন্যও উদ্ভিদের পুষ্পাবলীর বিভিন্ন বর্ণ। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের বদনকান্তির সহিত খাদ্য প্রাপ্ত নীরোগ বলবান্ লোকের মুখ-কান্তি সন্দর্শন করিলে, যেরূপ মানবের সুখদুঃখ অনুমিত হয়, তদ্রূপ সরস খাদ্যবহুল স্থানের বৃক্ষ পত্রের সহিত, নীরস এঁটেল মৃত্তিকাজাত বৃক্ষপত্রের তুলনা করিলে উদ্ভিদের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারা যায়। মানুষে যেরূপ মাংস ভক্ষণ করে, তদ্রূপ উদ্ভিদ-গাত্রেও একজাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মে উহাকে "পরাঙ্গ পুষ্ট" উদ্ভিদ বলে। গোমহিষের কোষ বিচ্যুতিতে যেমন উহাদের দেহের পুষ্টি দেখা যায়, তদ্রূপ তরমুজ ও কুমড়ার ভিতরের শস্য অতি সাবধানে ফেলিয়া দিলে জিনিষগুলি অধিক পুষ্ট হয়।

৮। দক্ষিণ-মেরু অভিযান-কাহিনী। লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

Capt. Cookএর অভিযান (১৭৭৩-৭৫), Belling Shasenএর অভিযান (১৮২০), Weddelএর অভিযান (১৮২৩), Biscoe'র অভিযান (১৮৩১), Ballingএর অভিযান (১৮৩৮), Dumont' d' urvilleএর

অভিযান (১৮৩৭), Wilkesএর অভিযান (১৮৪০), Rossএর অভিযান, Mt. Erebus এবং Mt. Terror দর্শন লাভ এবং নামকরণ, South Magnetic Pole যাইবার চেষ্টায় ব্যর্থকাম, Challenger, Antarctic, Belgica প্রভৃতির জাহাজের অভিযান, Charcot, Nordenskjold, Bruce, Borchgrevenle প্রভৃতি অভিযান।

Discovery জাহাজে Scottএর অভিযানের বিবরণ (১৯০১-০২), Barrierএর তীরে গমন এবং Cape Royds এর দক্ষিণে শীত-নিবাস স্থাপন, Slepe যাত্রায় ৮২.১৭ দঃ অঃ পর্য্যন্ত পৌছান— এ পর্য্যন্ত দক্ষিণ অভিযানের শেষ সীমা—এখানে হইতে দক্ষিণ-মেরুর দূরত্ব ৪৬৩ মাইল। শীত-নিবাসে দ্বিতীয়বার শীতঋতু যাপন এবং পরে প্রত্যাবর্ত্তন।

Schachleton এর অভিযানের বিবরণ (১৯০৮-০৯), অভিযানের জন্য এবং শীত-নিবাসের জন্ম বিস্তারিত আয়োজন, দক্ষিণ মেরু অভিমুখে ৮৮°২৩ দঃ অঃ পর্য্যন্ত গমন; উত্তর-মেরু বা দক্ষিণ-মেরু—কোন মেরু অভিমুখেই সেকাল পর্য্যন্ত এতদূর কেহ অগ্রসর হইতে পারেন নই। এস্থানের দূরত্ব দক্ষিণ-মেরু কেন্দ্র হইতে ১০০ মাইলের মধ্যে; South Magnetic Pole আবিষ্কার, ইহাদের পূর্ব্বে আর কেহ South Magneclic Pole পর্য্যন্ত পৌছিতে পারেন নাই।

Capt. Amundsenএর অভিযান এবং দক্ষিণমেরু-কেন্দ্র আবিষ্কার, Scottএর দ্বিতীয় অভিযান, দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ এবং প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মৃত্যু। Schachletonএর পরবর্ত্তী অভিযানসমূহ এবং পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু।

৯। আয়ুর্ব্বেদে সদৃশ-বিধান। লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্।

মহর্ষি হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ-বিধানের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইউরোপে যে সকল চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে রোগ ও ইহার পূর্ব্বলক্ষণের বিপরীত কার্য্যকারী ঔষধ, এবং আহার ও বিহারের সাহায্যে চিকিৎসা হইত। এদেশের আয়ুর্ব্বেদীয় পন্থাও উক্ত প্রাচীন পদ্ধতির অন্তর্গত। উক্ত ডাক্তারী চিকিৎসার ইন্‌জেক্‌শন ও আয়ুর্ব্বেদ-তন্ত্রে সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদ—এই দুইটী ভিন্নপথে হোমিওপ্যাথিক সদৃশ-বিধানের অনুযায়ী চিকিৎসা। হ্যানিম্যানের বহুপূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদে সদৃশ-বিধান একটী বিশিষ্ট চিকিৎসা-

প্রণালী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। "বিষে বিষম্," "বিষস্য বিষমৌষধম্" এই শাস্ত্রীয়-বচন ও "বিষে বিষ জারে" (হজম করে) এই লোক-প্রচলিত উক্তিকে বিপরীতার্থকারী চিকিৎসার মূল-সূত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে। হোমিওপ্যাথিক সদৃশ বিধানের মূলমূত্র—Similia Similibus Curentur। কেহ কেহ curantur-ভাবে মূল-সূত্রের শেষ শব্দটীকে গ্রহণ করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় বিপরীতার্থকারী চিকিৎসার মূল-সূত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ে শ্রীমদ্বিজয় রক্ষিত যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ—"যদিও হেতুব্যাধি বিপরীত ঔষধান্নবিহার দ্বারাই রোগের শান্তি হইয়া থাকে, তথাপি যে সকল ঔষধান্নবিহার হেত্বাদির সমানধর্ম্মী হইয়াও ব্যাধি নিবারণে সমর্থ হয়, তাহাদের মধ্যে অবশ্যই এমন কোন অবান্তর বৈধর্ম্ম্য আছে যদ্দ্বারা তাহারা হেতুব্যাধির বিপরীত না হইয়াও সেই অবান্তর বৈষম্য বশতঃই বিপরীতকার্য্যকারী অর্থৎ ব্যাধিনিবারণক্ষম হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক সদৃশ-বিধানের মূল-সূত্রের শেষ শব্দের বানানভেদে ইহার দ্বিবিধ তাৎপর্য্য। Curantur বানান গ্রহণ করিলে অর্থ হয়—Like cures like—সমধর্ম্মী ভেষজ সমধর্ম্মী রোগের ঔষধ। পক্ষান্তরে Curentur বানান গ্রহণ করিলে অর্থ হয়—Cure by treatment of like by like,i.e. under the law of similars, সুস্থ শরীরে প্রযুক্ত ভেষজের ক্রিয়া ও রোগলক্ষণের মধ্যে সমতা বিচারপূর্ব্বক চিকিৎসা। এই দ্বিতীয় বানানগত অর্থই হোমিওপ্যাথিক সদৃশ-বিধানের মূল-সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য। এই অর্থ করিলে ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় বিপরীতার্থকারী চিকিৎসার মূল-সূত্রের অসঙ্গতির পরিবর্ত্তে সঙ্গতিই পরিদৃষ্ট হয়। তথাপি উভয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট আছে। প্রথমতঃ সদৃশ-বিধান সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র ও চিকিৎসা প্রণীত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদ বিপরীতার্থকারী ভেষজ পথ্য ও ব্যায়ামাদি প্রয়োগ দ্বিবিধ চিকিৎসার অন্যতম, বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা-তন্ত্রে বিপরীত চিকিৎসার তুলনায় বিপরীতার্থকারী চিকিৎসার ব্যবহার অতি অল্প। দ্বিতীয়তঃ, সদৃশ-বিধান যে প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতি পরিহার করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে আয়ুর্ব্বেদীয় বিপরীতার্থকারী চিকিৎসা ঠিক সেইরূপ একটী চিকিৎসা-পদ্ধতিকে পরিহার করিয়া উদ্ভূত হয় নাই। তৃতীয়তঃ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার নিয়ম আয়ুর্ব্বেদীয় বিধান হইতে স্বতন্ত্র। চতুর্থতঃ, হোমিওপ্যাথিক সদৃশ-বিধানে পথ্যযুক্ত ভৈষজ্য প্রয়োগদ্বারা জীবনীশক্তি এবং দেহ উভয়কে শক্তিমান করিবার চেষ্টা নাই, আয়ুর্ব্বেদের প্রায় সকল ঔষধেই ভৈষজ্যগুলি প্রাণশক্তি ও দেহের বলবর্দ্ধক পথ্যের সহিত যুক্ত আছে।

ষোড়শ বর্ষের

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

পরিচালন-সমিতির সভ্যগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি—সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই সাধারণ সভাপতি

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-সিদ্ধান্তবারিধি

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও. এম্ বি,
এফ্ সি এস্

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্ মহ্তাব বাহাদুর জি সি এস্ আই,
কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্

মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন)

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, এম এল সি

মৌলবী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ

শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা বি এল্

শ্রীযুক্ত রামময় মণ্ডল

শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস

শ্রীযুক্ত কান্তিলাল এম পোদ্দার্কির্য়া

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি এ

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম এস্
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলা-সুধাকর
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ্ ডি, এফ সি এস্ (লণ্ডন)
ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম এস্সি, এফ জেড এস্
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ
শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ
বৈদ্য-মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন কাব্যতীর্থ বিদ্যানিধি
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এস্
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি এচ্ ডি পি আর এস,
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই
শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্সি
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্
শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
গ্রন্থাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ